বাংলাদেশের সংসদীয় সরকারের কার্যক্রম

(১৯৯১-১৯৯৬ ইং)

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. এম. নজরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গবেষক
সুলতানা কবীর
এমফিল গবেষক
রেজিঃ নং-১৬৩
শিক্ষা বর্ষ-১৯৯৬-৯৭

Dhaka University Library
400417

400417

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য এই অভিসন্দর্ভ দাখিল করা হল)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

M.Phil.

GIFT

400417

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সংসদীয় সরকারের কার্যক্রম

(১৯৯১-১৯৯৬ ইং)

400417

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক ড. এম. নজরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।
ফোন ঃ ৮৬১৬৭১৮

তারিখ ঃ ১২ ডিসেম্বর, ২০০১

প্রত্যায়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যায়ন করা যাচ্ছে যে, সুলতানা কবীর, (রেজিঃ নং-১৬৩, শিক্ষা বর্ষ-১৯৯৬-৯৭) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য আমার তত্ত্বাবধানে "বাংলাদেশে সংসদীয় সরকারের কার্যক্রম (১৯৯১-১৯৯৬ ইং)" শীর্ষ অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করেছেন।

এ অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেনি।

400417

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

অধ্যাপক ড. এম. নজরুল ইসলাম
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
চেয়ারম্যান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

(আমার শ্রদ্ধেয় মা ও আব্বাকে)

Dhaka University Institutional Repository

কোর্স বিন্যাস

গবেষণার শিরোনাম ঃ বাংলাদেশেরসংসদীয় সরকারের কার্যক্রম ১৯৯১-১৯৯৬ ইং

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	সূচনা	১-২
	১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব;	
দ্বিতীয় অধ্যায়	পটভূমি	৩-৮৮
	২.১ সাংবিধানিক অগ্রগতি (১৯৭১-১৯৯১)	
	২.১ ক) অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ	
	২.১ খ) সংবিধান প্রণয়ন; সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা	
	২.২ সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান;	
	২.২ ক) ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত সংশোধনী সমূহ; (১ম থেকে ৪র্থ সংশোধনী)	
	২.৩ সামরিক হস্তক্ষেপ ১৯৭৫-১৯৮২	
	২.৩ ক) জেনালেব জিয়ার ক্ষমতা গ্রহণ	
	২.৩ খ) সংশোধনী সমূহ (৫ম ও ৬ষ্ঠ সংশোধনী)	
	২.৩ গ) জেনালের জিয়ার হত্যাকান্ড ও বি,এন,পি সরকারের অবসান;	
	২.৪ দ্বিতীয় সামরিক শাসন ও জেনালের এরশাদ (১৯৮২-১৯৯০) (সংশোধনী ৭ম থেকে ১০ম)	
	২.৫ ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থান ও জেনারেল এরশাদের পতন;	
	২.৫ ক) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনভার গ্রহণ ও পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন; ফেব্রুয়ারী ১৯৯১;	
	২.৫ খ) একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী- ১৯৯১; সাংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন;	
তৃতীয় অধ্যায়	বেগম খালেদা জিয়া সরকার ও সংসদীয় গণতন্ত্র;	৮৯-১৪০
	৩.১ বেগম খালেদা জিয়া সরকারের সঙ্কট সমূহ;	
	৩.১ ক) অর্থনৈতিক	
	খ) রাজনৈতিক কমিটি ব্যবস্থার	
চতুর্থ অধ্যায়	বেগম খালেদা জিয়া সরকারের সংকট সমাধানের প্রচেষ্টা;	১৪১-২৪৩
	৪.১ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের নির্বাচন ও সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী;	
পঞ্চম অধ্যায়	সপ্তম জাতীয় সংসদের নির্বাচন ও তাঁর ফলাফল;	২৪৪-২৪৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	উপসংহার ও সুপারিশ সমূহ	২৪৯-২৫৭
	গ্রন্থপঞ্জি/তথ্য সূত্র	২৫৮-২৬৪

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১৯৭২ সালে বাংলাদেশে সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৭৫ সনের জানুয়ারী মাসে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারের অবসান ঘটানো হয়। একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হয়। ১৯৭৬ সনে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটানো হলেও রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা বহাল থাকে। পরবর্তীতে ১৯৯০ সনে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং ১৯৯১ সনে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে পুনরায় সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

ঘটনাবহুল ১৯৯১-১৯৯৬ সনের সংসদীয় সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে অনেকেরই কাছেই আমি ঋণী হয়ে পড়েছি। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই।

আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই পরম করুনাময় আল্লাহ্‌র কাছে যার ইচ্ছায় আমি এ গবেষণা কর্ম সম্পাদন করতে যাচ্ছি।

গবেষণার কথা আসলেই যার নাম সর্ব প্রথম উচ্চারিত হয় তিনি হলেন আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ড. এম. নজরুল ইসলাম স্যার। স্যারের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। যার সহযোগীতা পেয়েছি গবেষণা প্রস্তাবনা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত। তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে যতটুকু সময় ব্যয় করা প্রয়োজন তার চেয়েও অধিক সময় ব্যয় করেছেন তিনি আমার জন্য। যখন তখন সময় দিয়েছেন। তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের এ উদার সহযোগীতা না পেলে এ গবেষণা আমার পক্ষে সমাপ্ত করা সম্ভব ছিলনা। তার অমায়িক ব্যবহারে আমি শুধু বিস্মিত হইনি, অনেক কিছুই শিখেছি। এমনি একজন মহান হৃদয়ের অধিকারী তত্ত্বাবধায়কের অধীনে কাজ করতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত।

আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে চাই আমার মাকে। যার ইচ্ছাতেই আমার এ গবেষণা কর্মে যোগদান করা।

এছাড়া গবেষণার কাছে সাহায্য সহযোগীতার জন্য আমার ছোট ভাই জিয়াউল কবীর টুটুল, শরিফ, ছোট বোন লায়লা ও নিছার-এর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই।

গবেষণার কাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল, পিএইচডি, সেকশন ও একাউন্ট সেকশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ আমাকে সর্বোতভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সহযোগীতাও ছিল প্রসংশনীয়। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারীদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ছাড়াও আমি কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ লাইব্রেরীসহ প্রভৃতি স্থান তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ঐসকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের আকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি আমি তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

কম্পিউটার কম্পোজে সহযোগিতার জন্য আমি "কাসেম কম্পিউটারের" মি. গোলাম সারোয়ার ও কাসেম ভাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার বাবা একরামুল কবীর, বড় ভাই মাজহারুল কবীর, বড় বোন রুকসানা কবীর ও আদরের ভাতিজী তাশকীনাকে গবেষণা কর্মে উৎসাহ দান করার জন্য।

সুলতানা কবীর
তারিখ-২০ ডিসেম্বর, ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১. সূচনা ঃ

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ঃ

বাঙালী জাতীর ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস। অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা ও লক্ষ্য প্রাণের বিনিময়ে আজকের এ মহান স্বাধীন দেশ। যদিও সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথম প্রতিফলন হয় ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে কিন্তু এর সত্যিকার কার্যক্রম কিংবা ফলাফল কখনই দেশবাসী ভোগ করতে পারেনি। এর মধ্যে ১৯৫৮ সনে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপে ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বে ১৯৬২ সালে রাষ্ট্রপতি শাসন সম্বলিত দ্বিতীয় সংবিধান প্রবর্তিত করা হয়। ১৯৬৬ সনে ছয় দফার দাবীর প্রথম দাবীতে উল্লেখ করা হয় যে, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ও সংসদীয় সরকার প্রবর্তিত হবে। আইনসভার সার্বভৌমত্ব ও সকল নির্বাচন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে।

কিন্তু পাকিস্তান সরকারের অনিহার কারণে সেই দাবী আর বাস্তবে রূপ নেয়নি। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম লাভ করে। বাংলাদেশ নামের দেশটির কাছে প্রথম দাবীই থাকে সংসদীয় গণতন্ত্রের।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশে সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৭৫ সনের জানুয়ারী মাসে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারের অবসান ঘটানো হয়। একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হয়। ১৯৭৬ সনে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটানো হলেও রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা বহাল থাকে। পরবর্তীতে ১৯৯০ সনে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১ সনে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে পুনরায় সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

এ গবেণষা কর্মের মূল উদ্দেশ্য হল ১৯৯১ সন থেকে ১৯৯৫ সন পর্যন্ত বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনা করা। বাংলাদেশর সংসদীয় গণতন্ত্রের সমস্যা ও সম্ভাবনার উপরও এ গবেষণায় উল্লেখ থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

পটভূমি ঃ

দুটি পৃথক জনগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত পাকিস্তান ছিল এমন একটি রাষ্ট্র যার দুটি খন্ডের মধ্যে ছিল হাজার মাইলের ভৌগোলিক ব্যবধান। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ধর্মীয় সংহতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে এটিকেই দুই অংশের মধ্যে অন্যতম জাতিগত বন্ধন হিসেবে দেখা যায়[১]। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আচার, পোষাক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য ছিল প্রকট। হিন্দু আধিপত্যের ভীতি বাঙালি মুসলমানকে পাকিস্তানে যোগ দিতে বাধ্য করে। তবে বাঙালিরা তাদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে কিংবা বহিরাগত কোন গোষ্ঠীর আধিপত্য মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক দমন, অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক আধিপত্যের নীতি অনুসরণ করে। ফলে বাঙালিরা পাকিস্তান হতে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং কালক্রমে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

সাংস্কৃতিক নিপীড়ন ঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম সংঘাত ঘটে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলাকে মুসলমানদের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং একমাত্র উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দিতে চায়। কিন্তু বাঙালী ধর্ম নিরপেক্ষ ও শিক্ষিত মহল বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি প্রবলভাবে অনুরক্ত ছিল এবং তারা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য জোর দাবি জানায়। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি শুধু আবেগের প্রশ্নই ছিল না, এর সাথে বাঙালি শিক্ষিত শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থও জড়িত ছিল। উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করলে তাদেরকে একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষার বোঝা বহন করতে হবে, নতুবা তারা চাকুরী বা প্রশাসন ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারবেননা।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের জন্মের পর পরই বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন ছাত্র-বুদ্ধিজীবি মহলেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনে কিছু সংখ্যক ছাত্র পুলিশের গুলিতে নিহত হলে তা ব্যাপক গণবিস্ফোরণে রূপান্তরিত হয় এবং সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের পরেও শাসক মহল বাংলা ভাষা ও সাংস্কৃতিকে ইসলামীকরণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই সব পদক্ষেপের মধ্যে ছিল প্রথমে আরবী ও পরে রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব, বাংলা সাহিত্যে আরবী, উর্দু ও ফার্সী শব্দের ব্যাপক ব্যাবহার এবং রবীন্দ্র সংগীতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ। কিন্তু পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মহল এ সব পদক্ষেপকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র বলে গণ্য করে এবং তাদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। পাকিস্তানী শাসকদের সাংস্কৃতিক নীতি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে পার্থক্য ও অবিশ্বাসকে কেবল দৃঢ়তর করে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য ঃ ১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রায় একই স্তরে ছিল। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অনুসৃত নীতির ফলে দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়। পাকিস্তানের তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার (১৯৬৫-৭০) ঘোষিত লক্ষ্য ছিল দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস করা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেয়া যায় যে, ১৯৬৪-৬৫ সালে যেখানে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য ছিল ৪৬% ভাগ, সেখানে ১৯৬৯-৭০ সালে এই বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৬০% ভাগে[২]। পূর্ব পাকিস্তান হতে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচারই ছিল এই বৈষম্যের মূল কারণ। এক হিসাব অনুসারে ১৯৪৮-৬৯ সালের মধ্যে মোট ৪১৯ কোটি টাকার সম্পদ পূর্ব পাকিস্তান হতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। তাছাড়া বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানকে ন্যায্য অংশ দেয়া হয়নি। ১৯৫০-৬৯ সালের মধ্যে পাকিস্তান ৫৬৮৩ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্য লাভ করে। এর মাত্র ৩৪% ভাগ পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়া হয়।

এই ভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বিনিময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানে রক্ষিত বাজারে পরিণত হয়। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত শিল্পসম্পদের ৪৩% ভাগের মালিক ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী পুজিপতিগণ। সুতরাং বাঙালীদের চোখে পশ্চিম পাকিস্তানীরা শোষক হিসাবেই প্রতিভাত হয়।

রাজনৈতিক দমন নীতি ঃ পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে সংঘাতের অন্যতম কারণ ছিল রাজনীতি ও প্রশাসনে পশ্চিম পাকিস্তানীদের আধিপত্য। ১৯৪৭-৫৮ সালে পাকিস্তানে সংসদীয় পদ্ধতি চালু ছিল। পাকিস্তানের প্রথম আইন পরিষদে বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিংবা সংখ্যাসাম্য পশ্চিম পাকিস্তানীদের রাজনৈতিক প্রাধান্য ঠেকাতে পারেনি। তার কারণ ছিল এই যে, শাসকদের নেতৃত্ব ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে।

সংসদীয় ব্যবস্থার অধীনে বাঙালীদের যেটুকু সুযোগ ছিল, আইয়ুব খানের শাসন আমলে সেটুকু হতেও তারা বঞ্চিত হয়। ১৯৫৮ হতে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত প্রকৃত ক্ষমতা কেন্দ্রীয়ভূত ছিল আইয়ুব খানের হাতে এবং তার শীর্ষ স্থানীয় উপদেষ্টারা প্রায় সকলেই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী[৩]। সামরিক ও বেসামরিক আমলাবর্গ, যারা আইয়ুব আমলে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন, তাদের মধ্যে বাঙালীদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৬৪-৬৫ সালে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে ১৭ জন সচিবের মধ্যে মাত্র ২ জন এবং ১৭ জন সর্বোচ্চ সামরিক অফিসারের মধ্যে মাত্র ১ জন বাঙালী ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচী উপস্থাপন করেন। এর মূল লক্ষ্য ছিল পূর্ব বাংলাকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর করা। কিন্তু আইয়ুব সরকার এই স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ কঠোর দমনমূলক নীতি গ্রহণ করে। এর ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস প্রকটতর হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আওয়ামী লীগ তথা পূর্ন আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে দ্ব্যর্থহীন রায় প্রদান করে। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এই গণরায়কে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে অস্ত্রের জোরে তার আধিপত্য ও শোষণ বজায় রাখতে চায় এবং ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ বাঙালীদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ আরম্ভ করে।

পাকিস্তানী আক্রমনের মুখে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও বিপ্লবী সরকার গঠন করেন। সকল শ্রেণীর মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং ৯ মাসব্যাপী রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাজিত করে স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি করে।

---

1. Jahan Rounaq. Bangladesh : Promise & Performance Dhaka, UPL, P-3.
2. Rehman Sobhan : Bangladesh : Problems of Governance, Dhaka, UPL.
3. Jahan Rounaq. Pakistan: Failure in National Integration, Dhaka, UPL.

Dhaka University Institutional Repository

২.১ সাংবিধানিক অগ্রগতি (১৯৭১-১৯৯১)

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেখা যায় যে, বাংলাদেশের রাজনীতি অন্যান্য সব প্রভাবক উপাদানের চেয়ে ফলপ্রসূতা (Effectivity) ও বৈধতার প্রশ্ন থেকে সৃষ্ট এক ধরণের সংকটে নিপতিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনকে S.M. Lipset বৈধতা ও ফলপ্রসূতার প্রশ্ন থেকে উদগত এক ধরণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন। লিপসেট নিম্নোক্ত রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন-[১]

Effectivity

Legitimacy	+	—
+	A	B
—	C	D

যদি কোন সরকার উচ্চমানের বৈধতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে রেখা চিত্রে বক্স A- তে অবস্থান করে, সেক্ষেত্রে কখনও সংকট মোকাবেলায় কৌশল হিসেবে তার উচিৎ হবে ফলপ্রসূতার হ্রাস সাধনের মাধ্যমে বক্স-A থেকে B-তে অবস্থান পরিবর্তন করা।

কোন সরকার যদি অবৈধ ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে এবং উচ্চ মানের ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে বক্স C-তে অবস্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় সেটা সম্ভব।

তবে এ ধরণের সরকার ব্যবস্থায় ফলপ্রসূতার ঘাটতি তাকে বক্স C-থেকে বক্স D- তে অবস্থান গ্রহণে বাধ্য করে, যেখানে সমগ্র ব্যবস্থাটি ভেঙ্গে পড়ে।

S. M. Lipest এর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে কতগুলি সাধারণ সত্য প্রতিভাত হয়েছে-

---

1. Mattel Dogan : Conception of Legitimacy, Encyclopedia of Government and Politics, UK.

Dhaka University Institutional Repository

১। কোন সরকার ব্যবস্থায় ফলপ্রসূতার (Effectively) চেয়ে বৈধতার প্রশ্নটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

২। বৈধ সরকার ব্যবস্থায় ফলপ্রসূতা হ্রাসের মাধ্যমে নমনীয় অবস্থান গ্রহণ করাটা সমগ্র ব্যবস্থায় অস্তিত্ব বিপন্ন করেনা।

৩। অবৈধ সরকার ব্যবস্থার একমাত্র অবলম্বন ফলপ্রসূতায় ঘাটতি দেখা দিলে ব্যবস্থাটি ভেঙ্গে পড়ে।

S.M. Lipset এর ফলপ্রসূতা Almond-এর "out put" এর অনুরূপ তবে তা বৈধতার প্রশ্নের সাথে জড়িত হয়ে তাত্ত্বিকতার নতুন মাত্রা গ্রহণ করেছে যা বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রয়োগ করে আমরা নিম্নোক্ত ধারণার মুখোমুখি হই-

১। দেশটিতে গণতন্ত্রের উন্মেষের লগ্নেও এ যাবৎকাল পর্যন্ত খুব কম সরকারই বক্স A-তে অবস্থান করেছে যা পরবর্তীতে বক্স B-তে অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে স্বৈরাচারী প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটিয়েছে এবং ফলপ্রসূতার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

২। দেশের অধিকাংশ সরকার ব্যবস্থাই প্রথম পর্যায়ে অবৈধ উপায়ে ক্ষমতা গ্রহণ করে বক্স C-তে অবস্থাণ গ্রহণ করেছে। পরবর্তীতে কোন এক পর্যায়ে ফলপ্রসূতার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে অনিবার্য পতনের সম্মুখীন হয়েছে।

অর্থাৎ কখনও অবৈধ সরকারের এক ধরণের কৌশলমূলক ফলপ্রসূতা আর কখনও বৈধ সরকারের ফলপ্রসূতার ক্রমহ্রাসমানতা- এ দু'ধরণের সংকট থেকেই বৃহত্তর সংকটের বীজ রোপিত হয়েছে। এসবের অনিবার্য ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক দৃশ্যপটে একের পর এক অচলাবস্থা আন্তঃ কোন্দল ও উন্নয়নবিমুখী উপাদান সমূহ প্রাধান্য লাভ করেছে। আমাদের আলোচনায় বৈধ সরকার বলতে সধারণভাবে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে আগত সংসদীয় সরকার এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার এ দু'ধরণের সরকারকে বুঝিয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

২.১ ক. অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ ঃ

১৯৭১ সালে একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতার দশ মাসের মধ্যেই ১৯৭২ সালে রচিত হয় এর সংবিধান। এর বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন হয়েছে।

ক) অস্থায়ী সংবিধান আদেশ, ১৯৭২

পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্বপাকিস্তানের জনগণের সর্বাত্মক যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে দখলদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার পর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী 'মুজিবনগর' থেকে ১০ এপ্রিল (১৯৭১) ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (Proclamation of Independence) অনুযায়ী দেশের মুক্তাঞ্চল পরিচালিত হয়। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপ্রধান করে গঠিত সরকার মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়। ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য একটি সংবিধান তৈরি আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশে ফিরে আসেন। জাতির প্রতি তাঁর দীর্ঘ অঙ্গীকার ও জনগণের আকাঙ্খা অনুযায়ী কালবিলম্ব না করে পরের দিন ১১ জানুয়ারি তিনি বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থাসহ একটি অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন।

অস্থায়ী সংবিধান আদেশের মূল প্রতিপাদ্য ঃ

অস্থায়ী সংবিধান আদেশে অন্যান্যের মধ্যে বলা হয়[১]- (১) বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে একটি গণপরিষদ গঠিত হবে। (২) দেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার থাকবে। প্রধানমন্ত্রী হবেন এর প্রধান। রাষ্ট্রপতি হবেন নাম মাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। (৩) গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যের আস্থাভাজন অন্যান্য সদস্য প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। (৪) গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান রচিত ও তা প্রবর্তিত না

Dhaka University Institutional Repository

হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রীপরিষদ একজনকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করবেন। (৫) একজন প্রধান বিচারপতি এবং কয়েকজন বিচারপতি নিয়ে বাংলাদেশে একটি হাইকোর্ট থাকবে।

খ) গণপরিষদের গঠন, কার্যক্রম ও সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত ঃ

গণপরিষদ গঠন

'বাংলাদেশের জন্য একটি স্থায়ী সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ মার্চ রাষ্ট্রপতি 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' নামে একটি আদেশ জারি করেন[২]। আদেশ অনুসারে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে সাবেক পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে এ অঞ্চল থেকে নির্বাচিত সকল সদস্য (১৬৯+৩১০ = ৪৭৯ জন) নিয়ে এই গণপরিষদ গঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নিহত, স্বাভাবিক মৃত্যু এবং অন্য কারণে ৪৯ জন সদস্য বাদ পড়েন। বাকি ৪৩০ জন সদস্য নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। এদের মধ্যে মাত্র ৩ জন বাদে (২ জন স্বতন্ত্র ও ১ জন ন্যাপ-মোজাফফর) বাকি সবাই আওয়ামী লীগ দলীয়।

২.১ খ. সংবিধান প্রণয়ন ও সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা ঃ

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশণে শাহ আব্দুল হামিদ স্পিকার এবং মোহাম্মদ উল্লাহ ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় দিনে আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'খড়সা সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জুনের মধ্যে কমিটিকে এক রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়। ন্যাপ (মোজাফফর)- একজন সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (বর্তমানে আওয়ামী লীগ নেতা) ছাড়া কমিটির বাকি ৩৩ জন সদস্যই ছিলেন আওয়ামী লীগ দলভূক্ত।

খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি মোট ৭৪টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং ৩০০ ঘন্টা ব্যয় করে এর রিপোর্ট প্রণয়ন করে[৩]। রিপোর্ট প্রণয়ণের ক্ষেত্রে কমিটি জনগণের কাছে প্রস্তাব আহবান করে। কমিটির চেয়ারম্যান

Dhaka University Institutional Repository

ও সদস্যদের কেউ কেউ যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশ সফর করেন। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে ড. কামাল হোসেন খসড়া সংবিধান বিল আকারে উত্থাপন করেন। এরপর নিয়ম অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ও সর্বশেষ পাঠ শেষে ৪ নভেম্বর সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধান সংক্রান্ত বিলটি গণপরিষদে গৃহীত হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর 'বিজয় দিবস' থেকে এটি কার্যকর হয়। এভাবে, স্বাধীনতার মাত্র ১০ মাসের মধ্যে বাংলাদেশ লাভ করে একটি সংবিধান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মূল দিক সমূহ ঃ

ক. প্রস্তাবনা

১৯৭২ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনা ছিল নিম্নরূপ-

'আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি'।

আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তির জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গনতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।

আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।

আমার দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার

Dhaka University Institutional Repository

সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য... ।[৪]

খ. প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ঃ

এটি একটি লিখিত এবং অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত দলিল। সর্বমোট ৮৩ পৃষ্ঠায় এতে ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ, ১টি প্রস্তাবনা ও ৪টি তফসিল রয়েছে। এটি একটি দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। তবে এর পরিবর্তন পদ্ধতি খুব জটিল নয়। জাতীয় সংসদের সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সংশোধনী বিল গৃহীত এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি দানের মাধ্যমে তা কার্যকর হবে। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। এখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মতো কোন অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশের ব্যবস্থা নেই। সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হয়। এটা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা নামেও পরিচিত। এতে প্রধানমন্ত্রী ও তার নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভা হচ্ছে প্রকৃত শাসক। রাষ্ট্রপতি থাকেন নামসর্বস্ব। এ ব্যবস্থায় পার্লামেন্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মন্ত্রীসভার সদস্যগণ যৌথভাবে আইনসভা বা পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকেন। বাংলাদেশে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিধান করা হয়। এর নাম 'জাতীয় সংসদ'। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ৩০০ জন সদস্য ও এই সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত ১৫ জন মহিলা সদস্য মোট ৩১৫ জন সদস্য নিয়ে শুরুতে এটি গঠিত ছিল। পরবর্তীকালে সংরক্ষিত মহিলা সদস্যের সংখ্যা ৩০ জনে উন্নীত হলে বর্তমানে জাতীয় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যা ৩৩০। সদস্যরা ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য কিছু মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেখা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ (অনুচ্ছেদ ৭)। বাংলাদেশ সংবিধানে ১৮ বছর বয়স্ক প্রত্যেক নাগরিককে ভোটাধিকার দেয়া হয়েছে। সংবিধানের 'রাষ্ট্র পরিচালনা মূলনীতি' অংশে মানবাধিকার

Dhaka University Institutional Repository

সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা (অনুচ্ছেদ ১৭)। কোন সংসদ সদস্য নিজ দল ত্যাগ করলে বা দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিলে তিনি তাঁর সংসদ সদস্যপদ হারাবেন (বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০)। সরকারের স্থিতিশীলতার স্বার্থে এ বিধান করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি। সংসদ আইনের দ্বারা এ পদ সৃষ্টি করতে পারবে। ন্যায়পাল যে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারির বিরুদ্ধে প্রয়োজনে তদন্ত পরিচালনা করতে পারবেন। তিনি একমাত্র সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন (সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৭)। সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সংবিধানের আওতায় প্রধান বিচারপতি ও অন্য বিচারপতিগণ স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন। সংবিধানে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের সাধারণ বিচার ব্যবস্থার অতিরিক্ত সংসদ কর্তৃক আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার বিধান করা হয়েছে। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ, বদলি, বরখাস্ত, পদোন্নতি, দন্ড এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়াদি এর এখতিয়ারভূক্ত (সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৭)। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে জরুরি অবস্থা ঘোষণার কোন বিধান ছিল না। পরবর্তীকালে তা অন্তর্ভূক্ত হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার কতিপয় মূলনীতি লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই নীতিগুলো আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হলেও এ দ্বারা রাষ্ট্রের কার্যক্রম অনুপ্রাণিত ও প্রভাবান্বিত হয়। বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। এর সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা এর পরিপন্থী কোন আইন কার্যকরী হবে না, বরং তা বাতিল হয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

২.১ খ. সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা ঃ

মুজিব শাসনামল (১৯৭২-১৯৭৫)

ক. সরকার গঠন

মুক্তিযুদ্ধ চলাকলীন ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন) এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে বাংলাদেশের একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। এই সরকার মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। এই সরকারের নেতৃত্বে একটি সফল মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। পাকিস্তানি বন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরে আসেন। পরের দিন রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর এক আদেশ বলে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার স্থলে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং তিনি হন এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী। শীঘ্রই ২৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা ঘোষণা করা হয়, যাতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে শিল্প এবং তাজউদ্দিন আহমেদকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী হলেন দেশের রাষ্ট্রপতি। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় লাভের পর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ১৬ মার্চ পূর্বের মন্ত্রীসভায় সামান্য রদবদল করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ নামে একটি মাত্র বৈধ জাতীয় রাজনৈতিক দল সৃষ্টি এবং সংসদীয় ব্যবস্থার স্থলে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হলে, বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৫ আগষ্টের নির্মম হত্যাকান্ডের সময় তিনি সে পদেই বহাল ছিলেন।

খ. সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ সমূহ

বঙ্গবন্ধু সরকারকে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়, সেগুলো নিম্নরূপ-

Dhaka University Institutional Repository

১. **যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের পূর্ণগঠন ও পূনর্বাসন** ঃ ৯ মাসের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাংলাদেশে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দেশের প্রায় সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা, সমুদ্রবন্দর ধ্বংস বা ব্যবহারের অনুপযোগী করে দেয়। স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, ঘরবাড়ি, খাদ্য গুদাম, গ্রামের হাটবাজার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস বা বিনষ্ট করে। মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ লোক শহীদ হন, ১ কোটি বাঙালি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে, অনেক মুক্তিযোদ্ধা চিরতরের জন্য পঙ্গু হয়ে যান। দায়িত্বভার গ্রহণের পরপর বঙ্গবন্ধু সরকারকে এসব পুনর্গঠন পূনর্বাসন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া, মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর যেসব সেনা সদস্য বাংলাদেশের পক্ষে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল তাদের সে দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থ করতে হয়।

২. **বিধ্বস্ত অর্থনীতি** ঃ ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, খাদ্য মজুত বলতে কিছুই ছিল না। জাতিসংঘের এক হিসাব অনুযায়ী, মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ১.২ লক্ষ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। এর উপর ১৯৭২ সালের দীর্ঘ স্থায়ী খরা, ১৯৭৩ সালের প্রলংকারী সাইক্লোন এবং ১৯৭৪ সালের আরব ইসরাইল যুদ্ধের ফলে বিশ্ব বাজারে তেলের মুল্যের উর্ধ্বগতি এসবের বিরূপ প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর পড়ে।

৩. **আইন-শৃঙ্খলার অবনতি** ঃ মুক্তিযুদ্ধ শেষে অনেকে অস্ত্র জমা দেন। তারপরও বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র রয়ে যায়। ফলে সশস্ত্র ডাকাতি, লুটতরাজ, ছিনতাই ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। মুক্তি যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে মানুষের প্রত্যাশা যে আকাশচুম্বী হয়ে উঠে তা সহজে পূরণীয় ছিল না। দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতি মারাত্মক রূপ ধারণ করে। এর মোকাবেলায় পুলিশ বাহিনী ছিল অপর্যাপ্ত ও অদক্ষ।

৪. **সন্ত্রাসী তৎপরতা** ঃ স্বাধীনতার পর বাম নামধারী চীনপন্থী কিছু গোপন সংগঠন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে 'অসমাপ্ত বিপ্লব' এবং মুজিব সরকারকে রুশ ভারত কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া 'অবৈধ সরকার' বলে প্রচার করতে থাকে। এদের মধ্যে কেউ কেউ দেশ যে স্বাধীন হয়েছে তা-ই স্বীকার করে নেয়নি। এরা সংসদীয় রাজনীতিতে আদৌ বিশ্বাসী ছিল না। দেশের অভ্যন্তরে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টিসহ সশস্ত্র পন্থায় ক্ষমতা দখলের নামে এসব উগ্র সংগঠন গোপন তৎপরতা শুরু করে। ১৯৭৩ সালে ৫ মাসেই এদের হাতে ৬০টি থানা আক্রান্ত হয় এবং সকল অস্ত্র লুট হয়ে যায়। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারী দল আওয়ামী লীগের ৪ জন এমপিসহ ৩ হাজার নেতা-কর্মী সন্ত্রাসীদের হত্যায় শিকার হন[৪]। এক কথায় এর সরকারের বিরুদ্ধে এক ধরণের অঘোষিত যুদ্ধ শুড়ে দেয়।

৫. **জাসদের উত্থান** ঃ ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের একটি অংশের নেতৃত্বে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিষ্ঠা মুজিব সরকারের জন্য এক নাজুক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। জাসদের উদ্যোক্তারা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ধারা থেকে উঠে আসে এবং ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে দলটি দ্রুত ছাত্র-তরুণ সম্প্রদায়কে বিপুল সংখ্যায় আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের অনেকে সরকারের বিরুদ্ধে একটি জঙ্গি প্লাটফরম হিসেবে জাসদের ব্যানারে সমবেত হয়। শ্রীঘ্রই জাসদ সারাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত ও অস্থিতিশীল করে তুলে।

৬. **স্বাধীনতা বিরোধীদের ষড়যন্ত্র** ঃ মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী দেশী বিদেশী শক্তি ১৯৭১ এ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঠেকাতে ব্যর্থ হলেও

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার পর তারা নতুন এ রাষ্ট্র এবং মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ১৯৭৪ সালে তীব্র খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ অবস্থা দেখা দেয়া সত্ত্বেও চুক্তি মোতাবেক খাদ্য বোঝাই বিদেশী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের কাছাকাছি এসে আন্তর্জাতিক চক্রান্তে ফিরে যায়[৫]। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের সঙ্গে যে বিদেশী ষড়যন্ত্র যুক্ত ছিল তা এখন স্পষ্ট।

গ. সরকারের ভূমিকা ঃ

শেখ মজিবুর রহমানের সরকার মাত্র সাড়ে তিন বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এ সময়ে সরকার যেসব সাফল্য[৬] অর্জন করতে সক্ষম হয়, তা নিম্নরূপ-

১. **যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্গঠন ঃ** সরকার হার্ডিঞ্জ ও ভৈরব ব্রিজসহ ৫৬৭টি সেতু নির্মাণ ও মেরামত, ৭টি নতুন ফেরী, ১৮৫১টি রেলওয়ে ওয়াগণ ও যাত্রীবাহী বগী, ৪৬০টি বাস, ৬০৫টি নৌযান ক্রয় এবং চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর থেকে মাইন উদ্ধার করে স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করে।

২. **পুনর্বাসন ঃ** বঙ্গবন্ধু সরকার ভারতে আশ্রয় নেয়া ১ কোটি লোককে দক্ষতার সঙ্গে পুনর্বাসন করে। মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যদান, নির্যাতিত মা-বোনদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ এবং পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার্থে বিদেশে প্রেরণসহ অন্যান্য ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করে। সরকার পাকিস্তানে আটকাপড়া ১ লক্ষ ২২ হাজার বাঙালিকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করে।

৩. **ভারতীয় সৈন্যদের দেশে প্রত্যবর্তন ঃ** মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পর থেকে ৩ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সৈন্যদের দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করে বঙ্গবন্ধুর

Dhaka University Institutional Repository

সরকার বিশ্বে একটি নজির স্থাপন করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও ব্যক্তিত্বের কারণেই এতো অল্পসময়ে এটি করা সম্ভব হয়।

৪. **সংবিধান প্রণয়ন** ঃ দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ১০ মাসের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি সংবিধান প্রণয়ন বঙ্গবন্ধু সরকারের বিশেষ কৃতিত্ব। উল্লেখ্য, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ৯ বছরেও সে দেশে একটি সংবিধান প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি।

৫. **সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন** ঃ দেশে ফিরে এসে সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণের পর কালবিলম্ব না করে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার স্থলে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন ছিল একটি বাস্তবানুগ রাজনৈতিক পদক্ষেপ। এর ফলে সংসদীয় ব্যবস্থার পক্ষে এ দেশের জনগণের দীর্ঘ দিনের দাবির বাস্তবায়ন ঘটে।

৬. **জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান** ঃ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল পাকিস্তানি রাষ্ট্র কাঠামোয়, বাংলাদেশে নয়- বিরোধী মহলে এরকম গুঞ্জন ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সরকার গঠনের মাত্র ১৫ মাসের মধ্যে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩টি আসন পেয়ে জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট লাভ করে।

সারণী-২.১ ঃ ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদের নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	আসন লাভ	ভোট প্রাপ্তি (প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার)
আওয়ামী লীগ	৩০০	২৯২	৭৩.১৭
ন্যাপ (মোজাফফর)	২২৩	--	৮.৫৯
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	২৩৬	১	৬.৪৮

Dhaka University Institutional Repository

দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	আসন লাভ	ভোট প্রাপ্তি (প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার)
ন্যাপ (ভাসানী)	১৬৯	--	৫.৪২
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	১৫০	৬	৬.৩৪
মোট	১০৭৮	২৯৯*	১০০

উৎস ঃ Talukder Maniruzzaman, Bangladesh Revolution. P. 156

* একজন প্রার্থী মারা যাওয়ায় ঐ সিটে নির্বাচন স্থগিত থাকে। পরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়ী হন।

৭. **জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী পূণর্গঠন** ঃ বঙ্গবন্ধু সরকার জাতীয় সেনাবাহিনী, নৌ বাহিনী, বিমান বাহিনী সহ সদ্য স্বাধীন দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে জাতীয় মর্যাদায় পূণর্গঠিত করে। কুমিল্লায় দেশের সামরিক একাডেমি স্থাপন করা হয়। পুলিশ. বি.ডি.আর. আনসার ও বেসামরিক প্রশাসনের অবকাঠামোও গড়ে তোলা হয়।

৮. **সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ** ঃ স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষতা অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়। এ ছিল মুজিব সরকারের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। কিন্তু পরবর্তী শাসনামলে তা আর রক্ষা হয়নি।

৯. **দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা** ঃ যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে ২ কোটির মতো লোক মারা যাবে বলে আন্তর্জাতিক মহল থেকে আশঙ্কা করা হয়েছিল। নানা প্রতিকূল অবস্থার কারণে শেষ পর্যন্ত ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ অবস্থা দেখা দিলেও, ভয়াবহ রূপ নেয়ার পূর্বেই সরকার তা ঠেকাতে সক্ষম হয় (সরকারী মতে, এ দুর্ভিক্ষে ২৭,৫০০ লোক প্রাণ হারায়)।

Dhaka University Institutional Repository

১০. **শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি** ঃ বঙ্গবন্ধু সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানভিত্তিক গণমুখী ও যুগপোযোগী করে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ডঃ কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা (Working of Parliamentary Democracy)

১৯৭২ সালের সংবিধান অনুসারে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার (Parliamentary system of government)

সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা(Working of Parliamentary Democracy)

১৯৭২ সালের সংবিধান অনুসারে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার (Parliamentary system of government) প্রবর্তিত হয়। রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যাস্ত করা হয় এবং মন্ত্রীসভার সদস্যগণ একক ও যৌথভাবে জাতীয় সংসদ বা আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূলনীতি হল সংসদের প্রাধান্য। সংসদ শুধু আইন প্রণয়নই করবেনা, উহা সরকারের নির্বাহী কার্যক্রমকেও নিয়ন্ত্রণ করবে। এ জন্যই প্রয়োজন সংসদে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংসদ-সদস্যদের অংশগ্রহণের অবাধ সুযোগের ব্যবস্থা। সংসদীয় ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতার উপর। ১৯৭৩ সালের মার্চ হইতে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতি চালু ছিল। এই সময়কালে সংসদের কার্যক্রম ও রাজনৈতিক দলসমূহের ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করলে সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

১. **আইন প্রণয়ন ঃ** সংসদীয় আমলে জাতীয় সংসদ মোট ৭টি অধিবেশনে মিলিত হয় এবং ১১২ বিল পাস করে। উহাদের মধ্যে ৫৫টি (৪৯%) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পূর্বাহ্নে অধ্যাদেশ (Ordinance) হিসাবে জারি করা হয় এবং সংসদে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। উক্ত ১১২টি বিলের মধ্যে ৩৭টি (৩৩%) সংসদে সংশোধিত আকারে এবং অবশিষ্ট বিলগুলি (৬৭%) কোন সংশোধনী ছাড়াই গৃহীত হয়। অধিকাংশ সংশোধনী ছিল মামুলী ধরণের এবং সবগুলিই উত্থাপন করেন শাসক দলের সাংসদরা। বিরোধী দলের কোন সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। অর্থাৎ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগই প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে সংসদ প্রধানতঃ অনুমোদনকারীর ভূমিকা পালন করে। অনেক ক্ষেত্রে বিলগুলি দ্রুত গতিতে সংসদে পাস হয়ে যায়, সংসদ-সদস্যগণ সেগুলি সম্পর্কে আলোচনার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাননি।

২. **নির্বাহী বিভাগ ও সংসদ ঃ** সংসদ-সদস্যগণ নির্বাহী ও প্রশাসনিক নীতি সম্পর্কে আলোচনার সুযোগও খুব কম পান। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং অনাস্থা প্রস্তাব, মুলতবী প্রস্তাব, সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রস্তাব, মনোযোগ আকর্ষনী প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই পদ্ধতিসমূহ নির্বাহী বিভাগের উপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে পারেনি।

সংসদ সদস্যগণ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারতেন এবং তা পাস হতে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হত। ১৯৭৩-৭৫ সময়কালে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কোন অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। ঐ সময়কালে ১৬টি মূলতবী প্রস্তাবের নোটিশ দেয়া হয়, কিন্তু একটি প্রস্তাবও সংসদে আলোচিত হয়নি। সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য ১৯টি প্রস্তাবের নোটিশ পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে ৪টি প্রস্তাব সংসদে আলোচিত হয়। সদস্যদের নিকট হতে ২২৯টি মনোযোগ আকর্ষনী প্রস্তাবের নোটিশ পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলির মধ্যে ২৭টি প্রস্তাব সংসদের উত্থাপিত হয়। সংসদীয় আমলে সদস্যগণ ৩৪৩টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের নোটিশ দেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রস্তাবই ক্ষমতাসীন দলের সদস্যগণ কর্তৃক প্রত্যাহৃত হয়

Dhaka University Institutional Repository

অথবা সময় অভাবে বাতিল হয়ে যায়। বিরোধী দলীয় সদস্যগণ কর্তৃক উত্থাপিত মাত্র ৬টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সংসদে আলোচিত হয়, কিন্তু একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়নি। উক্ত সময়কালে সদস্যগণ মোট ৭৫৭৬টি প্রশ্নের নোটিশ দেন, কিন্তু মন্ত্রীগণ ৪৬৭৪ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তথ্য উদঘাটন এবং সরকারের নীতি ও কার্যক্রমের সমালোচিত করা। প্রশ্নকে কেন্দ্র করে অনেক ক্ষেত্রে সংসদে প্রাণবন্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং অনেক বিষয়ে সরকারকে জবাবদিহি করতে হয়। উপরের আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী সংসদ উহার দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে পারেনি। সংসদ নির্বাহী বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ না করে নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহার প্রধান কারণগুলি নিম্নরূপ ঃ

ক) বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্বের স্বল্পতা ঃ

৩১৫ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্যদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯ জন। এই স্বল্পতার কারণে তাঁর সরকারের কার্যক্রমের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারেনি। যেমন, সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য ৩০ জন সদস্যের সমর্থন দরকার। কিন্তু বিরোধী সদস্যদের সংখ্যাস্বল্পতার কারণে কোন অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি।

খ) প্রধানমন্ত্রীর সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব ঃ

জাতীর পিতা হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে আওয়ামী লীগ নেতা ও সরকার প্রধান। তাঁর কথাই ছিল চূড়ান্ত। ক্ষমতাসীন দলের অধিকাংশ সদস্যের নিজস্ব কোন সমর্থন ভিত্তি ছিল না, নেতার জনপ্রিয়তাই ছিল তাঁদের প্রধান সম্বল। ফলে সরকার দলীয় সদস্যরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হন। প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই ছিল মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত। ফলে মন্ত্রীদের মধ্যে যৌথ দায়িত্ববোধ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবকাশ ছিল খুব কম।

Dhaka University Institutional Repository

গ) সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা ঃ

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বিধান ছিল যে, কোন সংসদ-সদস্য নিজ দল ত্যাগ করলে কিংবা সংসদে দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। এই বিধান সংসদ সদস্যদেরকে দলের বংশবদে পরিণত করে এবং মন্ত্রিসভা তথা প্রধানমন্ত্রী দলের নেতা হিসাবে সাংসদদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পান।

৩. দলীয় রাজনীতি ঃ

১৯৭৩-৭৫ সময়কালে রাজনৈতিক দলসমূহের সৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপ সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য অনুকূল ছিল না। তৎকালীন বিরোধী দলগুলির মধ্যে ডানপন্থী জাতীয় লীগ এবং রুশপন্থী ন্যাপ (মোজাফফর) ও বাংলাদেশের কুম্যনিষ্ট পার্টি সংসদীয় পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিল। অন্যান্য বিরোধী দলগুলি সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করত না। তারা বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করে। তারা গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে উৎখাত করতে চায় এবং এই লক্ষ্যে জন সমাবেশ, গণবিক্ষোভ, হরতাল, ঘেরাও ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করে। আবার কিছু চরমপন্থী দল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটনের উদ্দেশ্যে থানা আক্রমন, অস্ত্রলুট ও রাজনৈতিক বিরোধীদের হত্যার মত সহিংস পন্থা অবলম্বন করে।

অপরপক্ষে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ উগ্রপন্থীদের সাধারণ ডাকাত ও খুনী হিসাবে চিহ্নিত করে এবং তাদের দমনের জন্য বল প্রয়োগের নীতি গ্রহণ করে। সরকার বিরোধীদলের সভা, সমাবেশ, মিছিল, বিক্ষোভ, ইত্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং বহু সংখ্যক বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীকে কারারুদ্ধ করে। বিরোধী দলগুলি সরকারের এই সব পদক্ষেপকে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পরিপন্থী বলে মনে করে এবং ক্রমশঃ অধিকতর সহিংস পন্থার দিকে ধাবিত হয়। ফলে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগীতার পরিবর্তে হিংসাত্মক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও জঙ্গী বিরোধী দল জাসদ 'অবিরাম বিপ্লব'- এর কৌশল গ্রহণ করে এবং কার্যতঃ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৭৪ সালের জুন মাসে জাসদ 'বিপ্লবী গণবাহিনী' নামে একটি সশস্ত্র অঙ্গ সংগঠন ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' নামে একটি সেল গঠন করে। ঐ বৎসর শেষের দিকে জাসদ ও ৬ দলীয় যুক্তফ্রন্ট আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করার লক্ষ্যে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। ফলে দেশে দারুন অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতিতে ১৯৭৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর সরকার দেশব্যাপী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে, মৌলিক অধিকার ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ স্থগিত করে এবং ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র বাতিল করে একদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৯৪৭ সন থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত এদেশের জনগণের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফসল হিসাবে যে গণতন্ত্র পেয়েছিল তা ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে অবসান ঘটানো হল।

---

১. দ্রষ্টব্য *'Provisional constituion of Bangladesh Order'*, বাংলাদেশের সংবিধান, পৃষ্ঠা- ৯৩

২. রহমান মোঃ শফিকুর, সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ, পৃ. ৪৪২-৪৩।

৩. হক আবুল ফজল, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা, পৃ. ১১৭।

৪. দ্রষ্টব্য *'Preamble', The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, 1972*

৫. *Talukder Maniruzzamn, Bangladesh Revolution, P. 165*

৬. *Rehman Sobhan, 'Politics, Food and Famine in Bangladesh, Economic and Political Weekly (Bombay), 1 December 1979.*

৭. *Huq Obaidul, Bangladesh, PP. 143-49 (Appendix-V).*

Dhaka University Institutional Repository

২.২ সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান ঃ

১৯৭৩ সালের নির্বাচনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার নুতনভাবে শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু দুই বৎসর যেতে না যেতেই ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা স্থলে একদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। প্রশ্ন হল, কি কারণে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি গ্রহণ করে সেই আওয়ামী লীগ কোন্ অবস্থায় একদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার প্রতি ঝুঁকে পড়ে?

বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির প্রতি রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব। সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সংবিধানের প্রতি অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন। কিন্তু তৎকালীন বিরোধী দলগুলির অধিকাংশই সংসদীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিল না। রুশপন্থী ন্যাপ (মোজাফফর) ও বাংলাদেশের কমিউনষ্ট পার্টি সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের নীতিতে বিশ্বাস করত। এই দল দুইটি আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে এবং সংবিধানে প্রতিশ্রুত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। কিন্তু জাসদ, ন্যাপ (ভাসানী), বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (লেনিনবাদী), বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি, শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল প্রভৃতি চীনপন্থী বলিয়া কথিত রাজনৈতিক গোষ্ঠিগুলি মনে করত যে, বিপ্লব ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। তারা ঘোষণা করে যে, নির্বাচন সাধারণ মানুষকে ঠকানোর একটা ফন্দি ছাড়া কিছুনা। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের অধিকার আদায় করা যায় না। তারা সমাতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য চূড়ান্ত সংগ্রামের অংশ হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্যাপক গণআন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে উৎখাত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা। এ সব দল সেই লক্ষ্যে অবিরাম বিক্ষোভ, মিছিল, হরতাল, ঘেরাও-এর কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ সরকারকে উৎখাতকল্পে সশস্ত্র কর্মকান্ডেও লিপ্ত হয়। তাছাড়া আর কয়েকটি বাম উগ্রপন্থী দল ছিল যারা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করেনি এবং সশস্ত্র বিপ্লবকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা হিসেবে মনে করত। এ সব দলের মধ্যে আব্দুল হক ও তোয়াহার নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির নাম বিশেষভাব উল্লেখযোগ্য। এই দলগুলি আত্মগোপন করিয়া সশস্ত্র লড়াই এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাতের প্রচেষ্টা চালায়। তারা পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ, অস্ত্র, ব্যাংক ও ধনী জোতদারদের খামার লুট এবং "শ্রেণীশত্রু খতম" তথা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের হত্যার মত সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনা করে।

অপরদিকে ক্ষমতাসীন এলিটগণও গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তারা নিজেদেরকে জাতির ভাগ্য নিয়ন্তা বলে মনে করতেন এবং বিরোধী দলগুলিকে রাষ্ট্র ও জাতির শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করেন। সুতরাং তারা বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিশোধমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলসমূহ শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার পরিবর্তে তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং দেশে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

স্বাধীনতার পর হতেই দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি দারুণ অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঐ বৎসর কেবল জুলাই-আগষ্ট এ দুই মাসেই উগ্রপন্থীরা ১৩টি পুলিশ ফাঁড়ি ও ১৮টি বাজার আক্রমণ করে, ১৪০টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৬৬৮০ টি গোলাবারুদ লুট করে এবং ২৬ জন রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করে। এ অরাজক অবস্থায় মোকাবিলায় আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে কতিপয় দমনমূলক ক্ষমতা গ্রহণ করে। এ সংশোধনীর অধীনে সরকার "বিশেষ ক্ষমতা আইন" পাস করে। উক্ত আইনের বলে অসংখ্য বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয় এবং বিরোধী সংবাদপত্রের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়। কিন্তু তাতেও অবস্থার কোন উন্নতি ঘটেনি। বরং বিরোধী দলগুলি তাদের সশস্ত্র তৎপরতা আরো বৃদ্ধি করে। এমনকি প্রকাশ্য দিবালোকে ঈদের সমাবেশে একজন আওয়ামী লীগ

Dhaka University Institutional Repository

দলীয় সংসদ সদস্যকে হত্যা করা হয়। এ অবস্থায় সরকার ১৯৭৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সকল রাজনৈতিক তৎপরতা ও মৌলিক অধিকার স্থগিত করে এবং ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী একদলীয় ক্ষমতা গ্রহণ করে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল, সংসদে বিরোধী দলের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বের অভাব। আমরা দেখেছি, ১৯৭৩ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। ৩১৫টি আসনের মধ্যে বিরোধী দল ও নির্দলীয় সদস্যদের মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ৯ জন। এ ৯ জন সদস্য আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে একটি সম্মিলিত বিরোধী দল গঠন করেন। কিন্তু সংখ্যাল্পতার কারণে সরকার এ দলকে "বিরোধী দল" হিসাবে স্বীকার করেনি। বরং সরকারী দলের কোন সদস্য সম্মিলিত বিরোধী দলকে উপহাস করতেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল খুবই সীমিত।

কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী, সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য ৩০ জন সংসদ সদস্যের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বিরোধী পক্ষে সদস্যদের সংখ্যা ৯ জন হওয়ার ফলে ১৯৭৩-৭৪ সালে একটি ও অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। সরকার কর্তৃক আনীত অধিকাংশ বিলই সংসদে সংশোধনী ছাড়াই গৃহীত হয়। ১৯৭৩-৭৪ সময়কালে বিরোধী দলীয় সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত কোন সংশোধনীই গৃহীত হয়নি। বিরোধী সদস্যগণ কর্তৃক আনীত সকল মূলতবী প্রস্তাব এবং সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হয়।

আমরা দেখেছি, অধিকাংশ বিরোধী দল সংসদীয় গণতন্ত্রে আস্থাশীল ছিল না। তদুপরি, সরকার কর্তৃক তাদের প্রতি অবহেলা ও অস্বীকৃতি এবং সংসদীয় কার্যক্রমে পর্যাপ্ত অংশগ্রহণের অভাব বিরোধী দলগুলির মধ্যে সংসদীয় রাজনীতির প্রতি যেটুকু আগ্রহ ছিল তাও নষ্ট করে দেয়, এবং তারা সহিংস রাজনীতির দিকে ধাবিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তা ছাড়া, ক্ষমতাসীন দল জনগণের আশা-আশাঙ্খা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। স্বাধীনতা সংগ্রাম জনসাধারণের মধ্যে অর্থনৈতিক মুক্তির এক প্রবল আকাঙ্খা জাগ্রত করে। কিন্তু স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দারুণ অবনতি ঘটে। প্রশাসনিক অদক্ষতা, দূর্নীতি, চোরাচালান, কালোবাজারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে জাতীয় উৎপাদন হ্রাস পায়। তা ছাড়া, বিশ্ব বাজারে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৭৪ সালের শেষার্ধে হাজার হাজার মানুষ দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করে। প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আদর্শগত ও উপদলীয় কোন্দলের কারণে আওয়ামী লীগ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দেশের অবনতিশীল পরিস্থিতির মোকাবিলায় ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। জনসাধারণ আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি আস্থা হারাতে থাকে এবং শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। জাতির পিতা ও বঙ্গবন্ধু হিসেবে শেখ মুজিবুর রহামান সম্ভবত তার সরকারের এ ব্যর্থতা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং তিনি সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য নিজ হাতে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং এক নতুন সাংবিধানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে অগ্রসর হন[১]।

২.২ ক. ১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারী পর্যন্ত সংশোধনীসমূহ ঃ

প্রথম সংশোধনী ঃ ১৯৭৩ সালের ১৪ই জুলাই জাতীয় সংসদে সংবিধানের প্রথম সংশোধনীটি গৃহীত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধে ধৃত পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের বিচারের জন্য সরকারকে যথোপযুক্ত ক্ষমতা প্রদান করা। এর দ্বারা সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদে একটি নূতন ধারা (৩) যোগ করা হয়। সেখানে বলা হয় যে, গণহত্যা কিংবা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য বা যুদ্ধবন্দীকে আটক, বিচার কিংবা শাস্তি প্রদান করার জন্য সরকার যে কোন আইন প্রণয়ন করতে পারবে এবং তা সংবিধানের পরিপন্থি বলেও বাতিল বলে গণ্য করা যাবে না। এ ব্যতীত, ৪৭ (ক) সংখ্যক একটি নূতন অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়। তাতে বিধান করা

Dhaka University Institutional Repository

হয় যে, যুদ্ধ-অপরাধীগণ আইনের আশ্রয়, প্রকাশ্য বিচার এবং সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করার অধিকার হতে বঞ্চিত হবে।

দ্বিতীয় সংশোধনী ঃ ১৯৭৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর সংসদে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীটি গৃহীত হয়। এই সংশোধনীর দ্বারা নির্বাহী বিভাগকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়।

১. নিবর্তনমূলক আটকের ক্ষমতা ঃ দ্বিতীয় সংশোধনীর দ্বারা ৩৩ অনুচ্ছেদের সংশোধন করে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখার বিধান করা হয়। মূল ৩৩ অনুচ্ছেদে বিধান ছিল যে, গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করে আটক রাখা যাবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তার মনোনীত আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার দিতে হবে। প্রত্যেক আটক ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ব্যতীত তাকে ২৪ ঘন্টার বেশী আটক রাখা যাবে না। কিন্তু দ্বিতীয় সংশোধনী অনুসারে জাতীয় সংসদ কোন ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার অধিককাল আটক রাখবার বিধান করতে পারে। সাধারণত অনুরূপ বিধানের অধীনে কোন ব্যক্তিকে ৬ মাসের অধিককাল বিনা বিচারে আটক রাখা চলবে না। তবে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ যদি ৬ মাস অতিবাহিত হবার পূর্বে আটক ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণের পর রিপোর্ট প্রদান করে যে, উক্ত ব্যক্তিকে ৬ মাসের অধিক আটক রাখবার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে, তবে তাকে আটক রাখা চলবে। উল্লেখ্য যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রয়েছেন বা ছিলেন বা সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা রাখেন এরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীন কর্মচারী নিয়ে উল্লেখিত উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে [অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ (৪)] নিবর্তনমূলক আইনের অধীনে কোন ব্যক্তিকে আটক করা হলে উক্ত আটকের আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আটকের কারণ জ্ঞাপন করবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশের জন্য তাকে যথা সত্বর সম্ভব সুযোগ দান করবেন। তবে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ 'জনস্বার্থবিরোধী' বলে মনে হলে উক্ত কর্তৃপক্ষ তা প্রকাশ নাও করতে পারেন।

উল্লেখ্য যে, মুল সংবিধানে নিবর্তনমূলক আটক সম্পর্কিত কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় সংশোধনী আইনের ফলে সংসদ নিবর্তনমূলক আইন পাশ করতে পারবে এবং অনুরূপ আইনের বলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যে কোন ব্যক্তিকে অন্ততঃ ৬ মাস বিনা বিচারে আটক রাখতে পারবেন। এই নিবর্তনমূলক আটক কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়, তা সতকর্তামূলক ব্যবস্থা। কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করেছে এই কারণে নয়, বরং কোন অপরাধ করতে পারে এই কারণে নিবর্তনমূলক আইনে তাকে আটক রাখা হয়। এই ক্ষেত্রে আটককারী কর্তৃপক্ষকে আদালতের সম্মুখে কোন অপরাধ প্রমান করতে হয়নি; সন্দেহ বা কোন কিছু করার সম্ভাবনাই হল আটকের ভিত্তি। লক্ষ্যনীয় যে, শুধু যুদ্ধ বা আপৎকালীন অবস্থায় নয়, স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ অবস্থায়ও নিবর্তনমূলক আটকের ব্যবস্থা করা যায়।

বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানে এরূপ নিবর্তনমূলক আটকের বিধান নেই। কেবল যুদ্ধের মত সংকটকালে বৃটিশ পার্লামেন্ট শাসন বিভাগকে বিনা বিচারে আটক করার ক্ষমতা দিয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহিরাক্রমণ বা বিদ্রোহজনিত জরুরী অবস্থা ব্যতীত স্বাভাবিক অবস্থায় কাউকে বিনা বিচারে আটক রাখা যায় না। আবার সেখানে আটকের কারণগুলি বিচার-বিবেচনা করার ক্ষমতা আদালতের আছে। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে নিবর্তনমূলক আটকের ব্যবস্থা বহুদিন হতে প্রচলিত রয়েছে। পাকিস্তানের ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানে এই ব্যবস্থা ছিল এবং বর্তমান ভারতীয় সংবিধানেও রয়েছে।

সংসদে বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ নিবর্তনমূলক আটকের এই বিধানকে অগণতান্ত্রিক বলে নিন্দা করেন। তাদের বিরোধীতার অন্যতম কারণ হল এই যে, নিবর্তনমূলক আটকের ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতা অত্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

সীমাবদ্ধ এবং এর ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হতে পারে। তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, নিবর্তনমূলক আটকের আইন বিরোধীদলের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে। বিগত দিনগুলিতে ক্ষমতাসীন দল এই আইনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে এবং সেই জন্য বাংলাদেশের জনগণ একে সুনজরে দেখে না।

২. জরুরী বিধানাবলী ঃ দ্বিতীয় সংশোধনী আইনের মাধ্যমে জরুরী অবস্থা মোকাবিলার উদ্দেশ্য সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করে সংবিধানে একটি নূতন নবম ক ভাগ সংযোজন করা হয়েছে। এই ভাগে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে ১৪১-ক, ১৪১-খ ও ১৪১-গ।

১৪১-ক অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা এর কোন অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, তা হলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। বিপদ আসন্ন হলে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হলে, প্রকৃত যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সংঘটিত হবার পূর্বেই তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। এরূপ জরুরী অবস্থার ঘোষণা সংসদে উপস্থাপন করতে হবে এবং উক্ত ঘোষণা সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত না হলে তা ১২০ দিনের বেশী বলবৎ থাকবে না। তবে, যদি সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া অবস্থায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় কিংবা অনুরূপ ঘোষণা জারি করার ১২০ দিনের মধ্যে সংসদ ভেঙ্গে যায়, তবে সংসদ পুনর্গঠিত হবার পর তার প্রথম তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে ঘোষণাটি সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। জরুরী অবস্থার ঘোষণা পরবর্তী কোন ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

১৪১-খ অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অন্তর্ভূক্ত বিধানাবলীর দ্বারা রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত ক্ষমতার উপর যে বাঁধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, জরুরী অবস্থার সময় ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২ অনুচ্ছেদসমূহের ক্ষেত্রে সেই বাঁধা

Dhaka University Institutional Repository

নিষেধগুলি প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ জরুরী অবস্থা চলাকালে সরকার উপরোক্ত অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি (যথাঃ চলাফেরার স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, বৃত্তির স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার) ক্ষুন্ন করে আইন প্রণয়ন ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। অবশ্য জরুরী অবস্থা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের এই বিশেষ ক্ষমতারও অবসান ঘটবে, এবং জরুরী অবস্থায় প্রণীত কোন আইন যে পরিমাণে কর্তৃত্বহীন বা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি সেই পরিমাণে অকার্যকর হবে। তবে, জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকাকালে অনুরূপ আইনের কর্তৃত্বে রাষ্ট্র যা করেছে বা করেনি তা অবৈধ হবে না। অর্থাৎ জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্র যদি ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২ অনুচ্ছেদবিরোধী কোন কাজ করে থাকে, তবে পরবর্তীকালে তার বিরুদ্ধে আদালতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবেনা।

১৪১-গ অনুচ্ছেদ অনুসারে, জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করতে পারেন, যে আদেশে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎকরণের জন্য আদালতে মামলা রুজু করবার অধিকার এবং আদালতে বিবেচনাধীন অনুরুপ সকল মামলার বিচার জরুরী অবস্থা চলাকালে স্থগিত থাকবে। সমগ্র বাংলাদেশ বা উহার যে-কোন অংশে এই অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত আদেশ প্রযোজ্য হবে এবং অনুরূপ প্রত্যেক আদেশ যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হবে।

অনেক দেশের সংবিধানে জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিধান রয়েছে। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসীগণ এইরূপ জরুরী আইনের সাথে বহুদিন হতে পরিচিত। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাগণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কিত কোন বিশেষ বিধান সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত করেননি। তবে, তার অর্থ এ নয় যে, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, আঞ্চলিক অখন্ডতা ও জননিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য কোন ব্যবস্থা মূল সংবিধানে ছিলনা। ৬৩ অনুচ্ছেদের (২) ও (৩) দফায় আপৎকালীন অবস্থা মোকাবিলার জন্য কতিপয় বিধান ছিল। দ্বিতীয় সংশোধনীর দ্বারা ৬৩ অনুচ্ছেদের (২) ও (৩) দফা বিলোপ করে নির্বাহী বিভাগকে অধিকতর

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা দেয়া হয়। ৬৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের রক্ষা ও প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষমতা তাকে দেয়া হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় সংশোধনী (নূতন ১৪১-ক অনুচ্ছেদ) অনুসারে রাষ্ট্রপতির নিকট যদি 'প্রতিয়মান' হয় যে, যুদ্ধ, বহিয়াক্রমণ কিংবা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, তবে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার উপরোক্ত কারণগুলি উদ্ভব হয়েছে কিনা তা রাষ্ট্রপতিই স্থির করবেন, সংসদ নয়। অবশ্য রাষ্ট্রপতির এইরূপ ঘোষণা সংসদে উপস্থাপিত হবে এমন কোন বিধান নেই। সংসদের অনুমোদন ছাড়াই নির্বাহী বিভাগ অনধিক ১২০ দিন জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। অপরপক্ষে মূল ৬৩ (২) ও (৩) দফা অনুসারে বহিয়াক্রমণ কিংবা সশস্ত্র বিদ্রোহজনিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে কিনা তা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করতে সংসদ এবং তা উক্ত পরিস্থিতির মোকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারত। কিন্তু বর্তমানে 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগের' কারণেও জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা যায়। মূল সংবিধানে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার জন্য কোন বিশেষ বিধান ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন বলে রাষ্ট্রপতির প্রণীত হলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা যায়। মূল সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্র সংকটকালে মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন বা হরণ করতে পারত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট অস্পষ্টতা ছিল। সেখানে বিধান ছিল, 'জন-নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অভিব্যক্ত সংসদের বিধিবদ্ধ কোন আইনকে এ সংবিধানের কোন কিছুই অবৈধ করবে না।' কিন্তু নুতন ১৪১-খ ও ১৪১-গ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন বা স্থগিত করার ক্ষমতা দ্ব্যর্থহীনভাবে রাষ্ট্রকে দেয়া হয়েছে। মোটকথা, দ্বিতীয় সংশোধনীর ফলে রাষ্ট্রের জরুরী অবস্থা মোকাবিলার ক্ষমতা ব্যাপকতর হয়েছে এবং সংসদের বিনিময়ে নির্বাহী বিভাগে ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংসদের ভিতরে ও বাহিরে সংশোধিত জরুরী বিধানাবলীর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা হয়। বিরোধী পক্ষের কোন কোন সদস্য এই সংশোধনী

Dhaka University Institutional Repository

আইনকে 'অগণতান্ত্রিক' ও 'জঘন্য' বলে মন্তব্য প্রকাশ করেন। জাতীয় লীগ প্রধান প্রবীন সংসদ সদস্য আতাউর রহমান খান বলেন যে, সংবিধানের ৬৩ অনুচ্ছেদ জরুরী অবস্থা মোকাবিলার জন্য যথেষ্ট ছিল এবং এ সংশোধনীর কোন প্রয়োজন ছিল না। অভ্যন্তরীন গোলযোগ ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে জরুরী ক্ষমতা গ্রহণের যে ব্যবস্থা করা হয় তিনি তার তীব্র বিরোধীতা করেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, জরুরী অবস্থার সময় মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিধান বাতিলের যে ব্যবস্থা রয়েছে তার শিকার হবে বিরোধীদল। এই সব সমালোচনার জবাবে আইনমন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধর বলেন যে, বিশ্বের প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশে জরুরী অবস্থা মোকাবিলার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা আছে। আমাদের সংবিধানে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ব্যবস্থা ছিল না। এর ফলে সংবিধানে যে শূণ্যতা ছিল তা পূরণের জন্যই এই সংশোধনীর প্রয়োজন। তিনি আর বলেন যে, বিনা কারণে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হতে পারে, সরকার তা মনে করে না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থেই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে দেশে যে সমাজবিরোধী শক্তি, মুনাফাখোর ও কালোবাজারী রয়েছে তা বিবেচনা করেই সংশোধনী আনা হয়েছে [২]।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা আঞ্চলিক অখন্ডতা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হবে সুষ্ঠুভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মত পর্যাপ্ত ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকা উচিত। ভারতসহ অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অনুরূপ অবস্থা মোকাবিলার জন্য জরুরী ক্ষমতা গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু যাতে এ ক্ষমতার অপব্যবহার না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ কিংবা সশস্ত্র বিদ্রোহের কালে সরকারের পক্ষে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অনেক সময় উপরোক্ত কারণে আসন্ন বিপদের হুমকি মোকাবিলা করার জন্যও জরুরী অবস্থা ঘোষণার প্রয়োজন হতে পারে। আবার অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে জরুরী অবস্থা ঘোষনার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে জরুরী অবস্থা ঘোষণার যে বিধান রয়েছে তার ফলে সরকার সামান্য গোলযোগকে উপলক্ষ্য করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জরুরী ক্ষমতা

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করতে পারে এবং মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে। ১৪১-ক অনুচ্ছেদে বিধান রয়েছে যে, জরুরী অবস্থার ঘোষণা সংসদে উপস্থাপিত হবে। কিন্তু তা যে অতি সত্বর সংসদে উপস্থাপিত হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। জরুরী অবস্থার ঘোষণা অবিলম্বে পেশ করার বিধান অধিকতর গণতান্ত্রিক হত।

দ্বিতীয় সংশোধনী অনুসারে সংসদের অনুমোদন ব্যতিরেকেই নির্বাহী বিভাগ ১২০ দিন জরুরী অবস্থা বহাল রাখতে পারেন। এর তুলনায় ভারতে জরুরী অবস্থা পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতীত দুই মাসের বেশী বলবৎ থাকতে পারে না (ভারতীয় সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদ)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকাকালে ভারতীয় লোকসভা তার মেয়াদ একবারে এক বৎসর বাড়াতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবার কাল ব্যতীত অন্য কোন জরুরী অবস্থায় সংসদের মেয়াদ বৃদ্ধি করা চলে না (বাংলাদেশ সংবিধানের ৭২ (৩) অনুচ্ছেদ)।

যুদ্ধজনিত আপৎকালীন অবস্থা ও অন্যান্য কারণে জরুরী অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও অর্থনৈতিক আপৎ- এ তিন কারণে জরুরী অবস্থার জন্য একই বিধান করা হয়েছে। সকল প্রকার জরুরী অবস্থাতেই আদালতের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার অধিকারকে রাষ্ট্রপতি স্থগিত রাখতে পারেন এবং সংসদ ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত অধিকারগুলি ক্ষুন্ন করে আইন প্রণয়ন করতে পারে। ভারতের সংবিধানেও যুদ্ধ এবং অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দরুণ সংকটাবস্থার মধ্যে পার্থক্য নেই। তবে অর্থনৈতিক সংকটাবস্থা মোকাবিলার জন্য পৃথক বিধান করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৩৬২)। সেখানে অর্থনৈতিক সংকটাবস্থায় স্বাধীনতার অধিকারগুলি ক্ষুন্ন করা হয় না; শুধু সরকার বিচারকগণসহ সরকারী কর্মচারীদের বেতন হ্রাস করার ক্ষমতা ভোগ করে।

এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত বিধানাবলীর উল্লেখ করা যেতে পারে। ইংল্যান্ডে ১৯২০ সালের জরুরী

Dhaka University Institutional Repository

আইন অনুসারে যুদ্ধ ব্যতীত অন্য সময় বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ লেখ (Writ of Habeas corpus) স্থগিত বা ফৌজদারী মামলার পদ্ধতি পরিবর্তন করা যায় না। একমাত্র যুদ্ধের সময় কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখা যায়। উল্লেখ্য যে ইংল্যান্ডের সংবিধান অলিখিত এবং পার্লামেন্ট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং পার্লামেন্ট যে কোন সময় যে কোন আইন প্রণয়ন করে নির্বাহী বিভাগকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করতে পারে। অনুরূপভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকৃত বিদ্রোহ বা আক্রমণের সময় জননিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন না হলে বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণ লেখকে স্থগিত রাখা চলেনা। বাস্তবে এ অধিকারকে স্থগিত রাখার মত অবস্থার উদ্ভব হয়েছে কিনা তা বিচার করবার অধিকার আদালতের থাকে। বিদ্রোহ বা আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে বলেই সেখানে মৌলিক অধিকার স্থগিত হতে পারে না। কিন্তু বাংলাদেশে (এবং অনুরূপভাবে ভারতেও) রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ কিংবা অভ্যন্তরীণ যোগলযোগের উদ্ভব হয়েছে কিংবা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন এবং আদালতে মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ স্থগিত রাখতে পারেন। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি ও সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এ ব্যাপারে আদালতের কোন এখতিয়ার নেই। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় বাংলাদেশ ও ভারতে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

তৃতীয় সংশোধনী ঃ ১৯৭৪ সালের ২৩ নভেম্বর গৃহীত তৃতীয় সংশোধনী সংবিধানের ২ অনুচ্ছেদকে সংশোধন করে বাংলাদেশের আঞ্চলিক সীমানা পুনঃনির্ধারণ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল ১৯৭৪ সালের ১৬ মে তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত সীমানা সংক্রান্ত দিল্লী চুক্তি বাস্তবায়ন করা। উক্ত দিল্লী চুক্তিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কিছু ভূখন্ড বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু সংবিধানের ২ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের আঞ্চলিক সীমানা সুনির্দিষ্ট করা হয়, সেহেতু উপরোক্ত ভূখন্ড বিনিময়ের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ সংশোধনী ঃ ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীটি সংসদে গৃহীত হয়। এ সংশোধনী দ্বারা শাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত ও কার্যগত পরিবর্তন সাধিত হয়। এর দ্বারা সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি সরকার প্রবর্তন করা হয়। রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত হয়। রাষ্ট্রপতি সরাসরি কিংবা তার অধীনস্ত কর্মচারীর মাধ্যমে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। তিনি সংসদ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত না হয়ে ভোটারদের দ্বারা সরাসরি ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হতেন। চতুর্থ সংশোধনী দ্বারা নুতনভাবে একটি উপ-রাষ্ট্রপতি পদ সৃষ্টি করা হয়। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৫ বৎসর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হতেন। রাষ্ট্রপতি কে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য একটি 'মন্ত্রীপরিষদ' ছিল। রাষ্ট্রপতি তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে প্রধামন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীদিগকে নিয়োগ করতেন এবং তারা রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী পদে বহাল থাকতেন। সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য যে কোন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী নিয়োগ করা যেতো এবং মন্ত্রীগণ রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকতেন।

চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা আইন বিভাগের কাঠামোগত পরিবর্তন হয়নি, তবে জাতীয় সংসদ এর অনেক ক্ষমতা হারায়। রাষ্ট্রপতি কিংবা মন্ত্রীদিগকে সংসদের নিকট দায়ী করা হয়নি। অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি সংসদ কর্তৃক গৃহীত যে কোন বিল (সংবিধান সংশোধনী বিল ব্যতীত) নাকচ করে দিতে পারতেন। (উল্লেখ্য যে, মুল সংবিধানের অধীনে রাষ্ট্রপতি কোন বিল পূনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত পাঠাতেন, কিন্তু কোন বিল নাকচ করতে পারতেন না।) তিনি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে সংসদের অধিবেশন আহবান ও মুলতবী করতে কিংবা সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারতেন। তবে শর্ত ছিল যে, বৎসরে অন্ততঃ দুবার সংসদের অধিবেশন ডাকতে হবে। পূর্বের মতই সংসদ অভিশংসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারতেন, তবে তার জন্য সংসদে দুই-তৃতীয়াংশের পরিবর্তে তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হত।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ শুধু নির্বাহী বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণই হারায়নি, একে নির্বাহী বিভাগের সমান মর্যাদাও দেয়া হয়নি।

চতুর্থ সংশোধনী দ্বারা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করা হয়। ৯৫ ও ৯৬ অনুচ্ছেদকে এমনভাবে সংশোধন করা হয় যে, রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদিগকে নিযুক্ত ও অপসারণ করতে পারতেন। (উল্লেখ্য যে, মূল সংবিধানের অধীনে সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতিকে অপসারণের জন্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত প্রস্তাবের প্রয়োজন হত) নিম্নতম আদালতসমূহের বিচারকগণের রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ ছাড়াই নিয়োগ করতে পারতেন। বিচার বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ, যা পূর্বে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত ছিল। তা রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পন করা হয়। মুল সংবিধানে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য সুপ্রীম কোর্টের নিকট আবেদন করার অধিকার দেয়া হয়। কিন্তু চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের এ ক্ষমতা একটি সাংবিধানিক আদালত কিংবা কমিশনকে অর্পন করা হয়। অবশ্য সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন ধরণের 'রীট' আবেদন গ্রহণ করার ক্ষমতা আগের মতই বহাল থাকে।

৯৬ অনুচ্ছেদ সংশোধনের ফলে নির্বাচন কমিশন ও সরকারী কর্ম কমিশনের স্বাধীনতাও ক্ষুন্ন হয়। কারণ এই কমিশনদ্বয়ের সদস্যবৃন্দ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের ন্যায় একই পদ্ধতিতে অপসারিত হয় থাকেন।

চতুর্থ সংশোধনীর সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী বৈশিষ্ট্য ছিল একদলীয় ব্যবস্থা। সংবিধানের নব-সংযোজিত ৬ষ্ঠ-ক ভাগে (অনুচ্ছেদ ঃ ১১৭-ক) বিধান করা হয় যে, রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে একটি মাত্র 'জাতীয় দল' গঠন করতে পারবেন এবং প্রয়োজনবোধে একদলীয় ব্যবস্থা রহিত করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতি একটি মাত্র 'জাতীয় দল' গঠন করলে তার নাম, কর্মসূচী, সদস্য-পদ, সংগঠন, শৃংখলা, কার্যাবলী ও আর্থিক বিষয়াদি তিনিই নির্ধারণ করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতির নির্দেশ-সাপেক্ষে সরকারী কর্মচারীগণও 'জাতীয় দলের' সদস্য হতে পারতেন। 'জাতীয় দল' কর্তৃক মনোনীত না হলে কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি কিংবা সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য হতেন না।

চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা ৭০ অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করে সংসদ-সদস্যদের উপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় করা হয়। তাতে কেবল দল হতে পদত্যাগ কিংবা দলের বিরুদ্ধে ভোটদানের কারণেই নয় বরং দলের আদেশ অমান্য করে ভোটদানে বিরত থাকা কিংবা সংসদে অনুপস্থিত থাকার কারণেও সদস্যপদ বাতিল হবার বিধান করা হয়।

বিশেষ বিধানকালে চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত সংসদের আয়ু ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুযারী হতে ৫ বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করা এবং 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে' সংশোধিত সংবিধানের অধীনে পূর্ণ ৫ বৎসর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বলে ঘোষণা করা হয়।

এভাবে চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সংসদ, মন্ত্রিসভা, বিচার বিভাগ এবং দল সবই রাষ্ট্রপতির অধীনস্থ হওয়ায় রাষ্ট্রপতি 'সংবিধানের মূল প্রস্তরে' পরিণত হন। কার্যতঃ একজন মার্কিন রাষ্ট্রপতি, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের সকল ক্ষমতা একত্রীভূত হয় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির হাতে।

২.২.খ যাকশাল শাসন ও কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা ঃ

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হবার অব্যবহিত পরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন এবং মনসুর আলী প্রধানমন্ত্রী করে নুতন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। নূতন মন্ত্রী পরিষদে পূর্বতন মন্ত্রিসভার প্রায় সকল সদস্য অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ অর্থাৎ 'বাকশাল' নামে দেশে একটি মাত্র 'জাতীয় দল' গঠন করেন। এর ফলে অন্য সকল রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটে। ১৯৭৫ সালের ৭ জুন তিনি জাতীয় দল বাকশালের গঠনতন্ত্র জারি করেন এবং এর বিভিন্ন কমিটি নিযুক্ত করেন।

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বাকশালের ৭টি সাংগঠনিক স্তর ছিল। সেগুলি হল ঃ ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি, একটি কেন্দ্রীয় কমিটি, একটি কাউন্সিল, প্রত্যেক জেলায় একটি জেলা কমিটি ও একটি জেলা কাউন্সিল, প্রত্যেক থানায় একটি থানা কমিটি এবং প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি ইউনিয়ন কমিটি।

রাষ্ট্রপতি ছিলেন দলের চেয়ারম্যান বা সভাপতি। তিনি পদাধিকার বলে নির্বাহী কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি ও পার্টি কাউন্সিল- এই তিনটি কেন্দ্রীয় সংস্থার সভাপতি ছিলেন। দলের সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতা নির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু নির্বাহী কমিটি সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হত এবং তার নিকট দায়ী থাকত। দলের সাধারণ সম্পাদক, অন্যান্য সম্পাদক, পার্লামেন্টারী বোর্ড, শৃংখলা কমিটি ইত্যাদি তিনিই নিয়োগ করতেন। প্রকারান্তরে দলের সমুদয় ক্ষমতা সভাপতি তথা রাষ্ট্রপতির হাতে কেন্দ্রীয়ভূত ছিল।

উল্লেখ্য যে, ৭ জুন তারিখে রাষ্ট্রপতি বাকশালের যে নির্বাহী কমিটি গঠন করে, একজন ব্যতীত উহার সকল সদস্য ছিলেন আওয়ামী লীগ হতে আগত। ১১৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৭৯ জন রাজনীতিক, ২১ জন বেসামরিক কর্মকর্তা, ৫টি সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর প্রধানগণ এবং ১৪ জন বিভিন্ন পেশাজীবী ছিলেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মধ্যে ৯ জন ব্যতীত সকলেই ছিলেন আওয়ামী লীগের। অনুরূপভাবে জেলা কমিটিগুলিতেও আওয়ামী লীগের প্রাধান্য ছিল। পার্টি কাউন্সিল নির্বাচিত হবার পূর্বে বাকশাল সরকারের পতন ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

বাকশাল সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল জেলা প্রশাসন পূনর্গঠন। ১৯৭৫ সালে ২২ জুন বিদ্যমান মহাকুমাগুলিকে জেলায় উন্নীত করা হয়। ৯ই জুলাই সংসদে জেলা প্রশাসন আইন নামে একটি আইন গৃহীত হয়। এই আইনে বিধান ছিল যে, প্রত্যেক জেলায় একজন গভর্ণর থাকবেন। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং তাঁর সন্তোষ অনুযায়ী স্বপদে বহাল থাকবেন। গভর্ণর জেলার উন্নয়ন ও রাজস্ব প্রশাসনের প্রধান হবে এবং বিচারকগণ ব্যতীত জেলার সকল কর্মচারী তার অধীনস্থ থাকবেন।

প্রতি জেলায় একটি জেলা প্রশাসন পরিষদেরও বিধান করা হয়। গভর্ণর, জেলার পার্লামেন্ট সদস্যগণ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার, বাকশালের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, পৌরসভার চেয়ারম্যান, সশস্ত্র বাহিনীসমূহের একজন করে উর্ধ্বতন অফিসার এবং কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মকর্তা নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হবে। এ পরিষদ জেলা প্রশাসন সম্পর্কে যাবতীয় বিষয়ে সুপারিশ করতে পারত এবং জেলার উন্নয়ন কর্মসূচীর তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়ন করত। তবে কার্যতঃ তা ছিল একটি উপদেষ্টা পরিষদ। প্রকৃত ক্ষমতা ছিল গভর্ণরের হাতে, যিনি তার কার্যাবলীর জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকতেন।

বাকশাল সরকারের আর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল গ্রাম সমবায় পরিকল্পনা। ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে সরকার ঘোষণা করেন যে, পরবর্তী পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রতিটি গ্রামে একটি করে বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। জমির মালিক, ভূমিহীন কৃষক ও কর্মক্ষম গ্রামবাসীগণ এ সমিতির সদস্য হবে। সমবায় সমিতিগুলির উৎপাদিত দ্রব্যাদির এক ভাগ পাবেন জমির মালিকগণ, এক ভাগ পাবেন ভূমিহীন শ্রমিকগণ এবং একভাগ পাবে সরকার। ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বৎসরে ৬০ হতে ১০০টি গ্রামে সমবায় গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং সেজন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্ধ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ কার্যকর করার পূর্বেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি মুজিবকে স্বপরিবারে হত্যা করে দেশে সামরিক শাসন আরোপ করা হয়।

---

১. *বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ, বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা ৮, পৃষ্ঠা- ৩০৩।*

২. *আহমদ মওদুদ, (Bangladesh; Era of Seikh Mujibur Rahman,) (ঢাকা, ১৯৮৩), পৃষ্ঠা- ২২৭*

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ সামরিক হস্তক্ষেপ (১৯৭৫-১৯৮২) ঃ

তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ঃ

যেসব রাষ্ট্র ও সামাজ বিজ্ঞানী রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ নিয়ে গবেষণা করেছেন, গ্রন্থ লিখেছেন তাদের মধ্যে এস.ই.ফাইনার, মরিস জানোউইচ, এস.পি.হান্টিংটন, জে, জনসন, লুসিয়ান ডব্লিউ পাই, ম্যারিয়ন, লেভি, মাইরন উইনার, কোহেন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মতে, সামরিক বাহিনীর জাতীয় অনুগত্য, নিয়ম-শৃঙ্খলাবোধ, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং এদের সাংগঠনিক শক্তির পাশাপশি রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের দূর্বলতা রাজনৈতিক সামরিক হস্তক্ষেপের কারণ[১]।অন্যকথায়, এ জন্য দুটি শর্ত অবশ্যই পুরণ হতে হবে, (১) হস্তক্ষেপের প্রবৃত্তি এবং (২) সুযোগ।

যেসব কারণে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে তা নিম্নরূপ-

এক. জাতীয় সংহতির সংকট ঃ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এদের অধিকাংশের উদ্ভব ঘটে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর একই সঙ্গে এসব দেশকে জাতি গঠন ও রাষ্ট্রগঠন সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়[২]। অনেক সময় বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর দ্বন্দ-সংঘাত-সংঘর্ষে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এমনই পরিস্থিতিতে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে সামরিক বাহিনী সরাসরি রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে।

দুই. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ঃ উন্নয়নশীল দেশসমূহে নানা কারণে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দিতে পারে। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, সরকারের পক্ষে তা সামাল দেয়া সম্ভব হয় না। এ রকম অবস্থায় সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলে এগিয়ে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

তিন. বৈধতার সংকট ঃ একটি সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে বৈধতা লাভ করে। আর সে নির্বাচন হবে অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ। উন্নয়নশীল দেশে এরূপ নির্বাচনের বড়ই অভাব। নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে ব্যপক কারচুপির অভিযোগ এনে পরিচালিত আন্দোলনের এক পর্যায়ে সামরিক বাহিনী নিজ হাতে ক্ষমতা নিয়ে নিতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, ১৯৭৭ সালে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ক্ষমতাচ্যুত করে পাকিস্তানে জেনারেল জিয়াউল হকের ক্ষমতা দখলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

চার. সুশীল সমাজের দুর্বলতা ঃ উন্নয়নশীল দেশে অনেক সময় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব লক্ষণীয়। সমাজে সংগঠিত শক্তির উপস্থিতি থাকে অত্যন্ত নিম্নের পর্যায়ে। সুশীল সমাজের এ দুর্বলতা সামরিক হস্তক্ষেপকে উৎসাহিত করে থাকে।

পাঁচ. শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতি ঃ অনেক দেশে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল বা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা না থাকায় সামরিক বাহিনী সহজে ক্ষমতা দখল কিংবা দীর্ঘকাল ক্ষমতাসীন থাকার সুযোগ পায়। যেমন- ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশে এরূপ ঘটে।

ছয়. বৈদেশিক ষড়যন্ত্র ঃ এর ফলে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলে প্ররোচিত হতে পারে। বিশেষ করে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ দু'পরাশক্তির মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠান্ডা লড়াই চলাকালে এটি অধিক প্রযোজ্য ছিল।

সাত. সামরিক বাহিনীর ক্ষমতালিপ্সা ঃ উন্নয়নশীল দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে একদিকে পেশাগত আনুগত্য ও শৃঙ্খলাবোধ দূর্বল, অন্যদিকে ক্ষমতার প্রতি মোহ প্রচন্ড। এ অবস্থা তাদের সরাসরি ক্ষমতা দখলে প্রলুব্ধ করে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রথম সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট। এটি কোন সামরিক অভ্যুত্থান নয়। এর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগতভাবে সামরিক বাহিনীর কোন সংশ্রব ছিল না। সামরিক বাহিনীতে চাকরিগত এবং বিভিন্ন অভিযোগে চাকুরিচ্যুত জুনিয়র অফিসারদের আনুমানিক ১৫০০ জন সদস্য ষড়যন্ত্রের ফল। এর নির্মম শিকার স্বাধীন বাঙালি জাতির জনক এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তার পরিবারের উপস্থিত সকল সদস্য এবং মুক্তিযুদ্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা পালনকারী আরো অনেকে। ঐ অফিসারদের হাতে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী অবস্থায় নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী চার জাতীয় নেতা- সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী শক্তি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নিজেদের অধিষ্ঠিত করে। দেশের সংবিধান বাতিল করা না হলেও, সামরিক শাসন জারি করা হয় এবং সে অনুযায়ী দেশ চলতে থাকে।

১৫ আগষ্ট ক্ষমতা দখল করে খন্দকার মোশতাক আহমদকে কিছুদিনের জন্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে সম্মুখে রাখা হলেও, মূল ক্ষমতা ছিল তরুণ অফিসারদের হাতে। এ নিয়ে শীঘ্রই সামরিক বাহিনীতে অসন্তোষ দেখা দেয়। সামরিক বাহিনীতে শৃঙ্খলা ও চেইন অফ কমান্ড পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে একটি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ১৫ আগষ্ট ও ৩ নভেম্বরের হত্যাকন্ডের সঙ্গে যুক্ত অনেককে বিদেশে যেতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু খালেদ মোশাররফ মাত্র চার দিন ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হন। ৭ নভেম্বর এক পাল্টা অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হন এবং জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হন। সামরিক বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং তার সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ এনে প্রথমেই জিয়া পঙ্গু বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার কর্নেল আবু তাহের বীর উত্তম

Dhaka University Institutional Repository

কে ফাঁসি দেয়ার ব্যবস্থা করেন। উল্লেখ্য, কর্নেল তাহের ও সামরিক বাহিনীতে তার অনুসারীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় জেনারেল জিয়া ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন। জেনারেল জিয়া ক্ষমতাসীন থাকাকালীন (১৯৭৫-১৯৮১) অন্তত বিশ বার তার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ব্যর্থ চেষ্টা হয় বলে বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ। এর সঙ্গে যুক্ত থাকার কথিত অভিযোগ অনেককে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। সাড়ে পাঁচ বছরের মতো দেশ শাসনের পর ১৯৮১ সালের ৩০মে জেনারেল জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে এক ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানে মর্মান্তিকভাবে নিহত হন। এরপর ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়ে কিছু কাল দেশ পরিচালনা করেন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সাত্তার সরকারকে অপসারিত করে ক্ষমতা দখল করেন। প্রায় ন বছর দেশ শাসনের পর ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর দেশব্যাপী এক ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানের ফলে এরশাদের পতন ঘটে। এরপর থেকে দেশে বেসামরিক শাসন অব্যাহত আছে।

সামরিক হস্তক্ষেপের কারণ বিশ্লেষণ ঃ

যে সব কারণে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটে তা হচ্ছে-

এক. রাজনৈতিক ক্ষমতা সচেতনতা ঃ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি সামরিক বাহিনীর নিয়মিত সদস্যের অনেকে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে তাদের মধ্যে এক ধরণের রাজনৈতিক ক্ষমতা-সচেতনতা ও উচ্চ আকাঙ্খা সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তীকালে তাদেরকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে প্রলুব্ধ করে।

দুই. চেইন অফ কমান্ড ভঙ্গ ঃ ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীভুক্ত বাঙালি সৈনিকদের অনেকে চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে বিদ্রোহ করে এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। এ দ্বারা ভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের এক নজির ও মানসিকতার সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তীকালে তাদের আচরণের উপর প্রভাব ফেলে।

তিন. প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্যের অভাব ঃ বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা-পাকিস্তান প্রত্যাগত, সেনা সদস্য-রক্ষী বাহিনী এরূপ অভ্যন্তরীণ বিভক্তি ও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল। এ অবস্থা সামরিক হস্তক্ষেপকে উৎসাহিত করে।

চার. মুক্তিযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ ঃ মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের পুনর্গঠনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। সরকারকে শূণ্য অবস্থা থেকে দেশের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অর্থনীতি গড়ে তুলতে হয়। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল অবৈধ অস্ত্র। তথাকথিত বিপ্লবের নামে বামপন্থী বলে পরিচিত কতিপয় সংগঠন সরকার উৎখাতে সক্রিয় হয়। দেশজুড়ে চলতে থাকে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ও নাশকতামূলক তৎপরতা। উদ্ভূত পরিস্থিতি শুধু অগণতান্ত্রিক বা অশুভ শক্তির জন্য অনুকূল ছিল। এর মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বলতে কিছুই ছিল না। আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিনের একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সংকটের বিস্তৃতি এতোই ব্যাপক ছিল যে তা সামলানো এ দলের পক্ষে প্রায় দুরূহ হয়ে পড়ে।

পাঁচ. ষড়যন্ত্র ঃ মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দেশী-বিদেশী শক্তি সরকার উৎখাতে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয় এবং সামরিক বাহিনীর কিছু সদস্যের উপর ভর করে তারা এতে সফলকাম হয়।

ছয়. স্নায়ু যুদ্ধকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি ঃ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বাংলাদেশের রাজনীতিতে যখন প্রথম সামরিক হস্তক্ষেপ সংঘটিত হয়, তখন দু'পরাশক্তির মধ্যে ঠান্ডা লড়াই চরম পর্যায়ে পৌঁছে

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ যে এর শিকার, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

১৯৭৫-১৯৯০ এ সময়ে দীর্ঘ ১৫ বছরেরও অধিক কাল দেশে কখনো সরাসরি কখনো বেসামরিক আবরণে সেনাশাসন চলে। ফলে তখন একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার কোন সুযোগেই পায়নি। নির্বাচনসহ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সংস্থা ও মূল্যবোধ যা-কিছু এবং যতটুকু-ছিল তাও বিনষ্ট হয়। পরিকল্পিতভাবে প্রশাসনের সামরিকীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। ক্ষমতাসীনদের জন্য দেখা দেয় চরম বৈধতার সংকট। এক কথায়, এ সময়ে দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি হয়ে পড়ে রুদ্ধ।

---

1. *Talukder Maniruzzaman, Military Widrawal From : Politics : A Comparative Study, USA 1987; S.W. Finer, The Man on Horseback : The Role of the Military in Politics, London 1962; Morris Janowitz, The Military in the Political Development of New Nations, Chicago 1964; John Johnson (ed.) The Role of the Military in Underdeveloped Countries, Princetion 1962; Alam R. Ball, Modern Politics and Government, London 1978.*

2. *Jahan Rounaq : Pakistan Failure in National Integration, Dhaka, UPL, PP-1-9.*

Dhaka University Institutional Repository

২৩.ক জেনারেল জিয়ার শাসনামল (১৯৭৫-১৯৮১)

ক. ক্ষমতায় আরোহন ও ক্ষমতা সুসংহতকরণে গৃহীত পদক্ষেপ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় জিয়াউর রহমান ২ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের মাধ্যমে 'মেজর জিয়া' (তখন তিনি মেজর) সর্বপ্রথম জনসম্মুখে পরিচিতি লাভ করেন। স্বাধীনতার পর একজন দক্ষ ও পেশাদার অফিসার হিসেবে তিনি বেশ সুনাম অর্জন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের হত্যাকন্ডের মাধ্যমে খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হলে, তিনি (মোশতাক) জেনারেল কে.এম. শফিউল্লাহকে চিফ অব ষ্টাফের পদ থেকে সরিয়ে তদস্থলে জিয়াউর রহমানকে নিযুক্ত করেন (জিয়া তখন ডেপুটি চিফ অব ষ্টাফ ছিলেন)। ঐ বছর ৩ নভেম্বর বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে এক সেনা অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এর চারদিনের ভেতর ৭ নভেম্বর জিয়ার নিজ সমর্থক ও জাসদের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার উদ্যোগে সংঘটিত হয় এক পাল্টা সেনা অভ্যুত্থান। এ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জেনারেল জিয়ার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে উত্থান ঘটে। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এ.এস.এম. সায়েম প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালের ৩০ নভেম্বর জেনারেল জিয়া প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। পরের বছর ২১ এপ্রিল বিচারপতি সায়েম স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন এবং জিয়া সে পদে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন।

ক্ষমতায় আরোহণের পর জেনারেল জিয়া নিজ অবস্থান সুসংহত করার লক্ষ্যে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা নিম্নরূপ-

প্রথমত, জিয়ার ক্ষমতার প্রতি জাসদ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে এর গোপন সংগঠন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার তরফ থেকে বড় ধরণের হুমকি দেখা দেয়। ৭ নভেম্বরের সিপাহী অভ্যুত্থানের সহযোগী এই শক্তি জিয়াকে

Dhaka University Institutional Repository

'বিশ্বাস ঘাতক' হিসেবে চিহ্নিত করে। তার বিরুদ্ধে নতুন করে সেনা অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা চালায়। কর্নেল তাহেরকে ফাঁসি দেয়া সহ জিয়া এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জিয়ার শাসন আমলে বিভিন্ন সময় কমপক্ষে ২০ বার কথিত সামরিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সেনাবাহিনীর বহু সংখ্যক জোয়ানকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়।

দ্বিতীয়ত, ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর জেনারেল জিয়ার হাতে কার্যত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ন্যস্ত থাকলেও তখনই তিনি রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পদে নিজেকে আসীন করেননি। বিচারপতি সায়েমকে সামনে রেখে তিনি পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়ার নীতি গ্রহণ করেন।

তৃতীয়ত, শুরু থেকেই তিনি সামরিক-বেসামরিক আমলাদের মধ্যে সুসম্পর্ক এবং এদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দেন।

চতুর্থত, খন্দকার মোশতাক ও পরে বিচারপতি সায়েমের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও, নিজ অবস্থান সুসংহত করতে তিনি আরো সময় নেন।

পঞ্চমত, সামরিক বাহিনীর মধ্যে নিজ অবস্থান সুদৃঢ় ও সমর্থন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি সামরিক খাতে বাজেট ব্যয় বৃদ্ধি, নতুন সেনা ডিভিশন গঠন, গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করা সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পুলিশের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং বিশেষ পুলিশ ফোর্স গঠন করা হয়।

ষষ্ঠত, জিয়া নিজ অবস্থান পাকাপোক্ত করতে এবং তার শাসনের একটি রাজনৈতিক ভিত গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক পর্যায়ে অর্থ, বিত্ত ও ক্ষমতার প্রলোভন দেখিয়ে বিদ্যমান রাজনৈতিক দল ভেঙ্গে এর নেতা-কর্মীদের নিজের পক্ষে টানতে উদ্যোগী হন।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তমত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে প্রাথমিক বৈরীভাব কাটিয়ে ওঠে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন, চীন ও পশ্চিমের দেশসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি ও মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হন।

২. বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া

জেনারেল জিয়া তার শাসনকে বেসামরিকীকরণের লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তা নিম্নরূপ-

১. **রাজনৈতিক দল বিধি (পি.পি.আর)** ঃ ১৯৭৬ সালের ২৮ জুলাই সরকার রাজনৈতিক দল বা পি.পি.আর- এর ঘোষণা দেয় [৫]। এই নতুন বিধি অনুযায়ী, রাজনৈতিক দলগুলোকে সরকারের কাছ থেকে বৈধতার সনদ লাভ করতে হয়। এভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত ২১ দলকে প্রথমে 'ঘরোয়া রাজনীতি' (Indoor Politics) করার অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৭৮ সালের ১ মে থেকে রাজনৈতিক দল বিধি তুলে দেয়া হয়।

২. **গণভোট অনুষ্ঠান** ঃ ১৯৭৭ সালের ৩০ মে দেশব্যাপী এক গণভোটের আয়োজন করা হয়। এতে কোন প্রার্থী ছিল না। জিয়ার উপর আস্থা আছে কি- নাই সে বিষয়ে ভোটারদের কাছে জানতে চাওয়া হয়। ভোটে শতকরা ৯৮.৮৮ ভাগ হ্যাঁ সূচক ফলাফল দেখানো হয় [৬]।

৩. **১৯ দফা কর্মসূচী** ঃ ১৯৭৭ সালে গণভোটের একমাস পূর্বে জিয়া তার আর্থসামাজিক উন্নয়নের ১৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। একে 'উৎপাদনের রাজনীতি' হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি এই কর্মসূচী নিয়ে ৪ সপ্তাহব্যাপী সারা দেশজুড়ে এক গণসংযোগে বের হন এবং ৭০টি জনসভায় ভাষণ দেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪. **স্থানীয় সংস্থায় নির্বাচন ঃ** ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে গ্রাম পর্যায়ে ৪৩৫২ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর আগষ্ট মাসে দেশের ৭৮টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৫. **রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঃ** ১৯৭৮ সালের ৩ জুন দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর পূর্বে জিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় তার ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এর সঙ্গে আওয়ামী লীগ বিরোধী নামে ৫টি দল (ন্যাপ-ভাসানী, মুসলিম লীগ, ইউ,পি,পি., লেভার পার্টি ও তপসিলি ফেডারেশন) মিলিত হয়ে 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট' নামে একটি নির্বাচনী জোট গঠন করে। জিয়া ছিলেন এ জোটের প্রার্থী। অপরদিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অপর ৫টি দলের (জাতীয় জনতা পার্টি, ন্যাপ-মোজাফফর, সিপিপি, গণ-আজাদী লীগ ও পিপলস্ লীগ) সমন্বয়ে 'গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট' গঠন হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এম.এ.জি. ওসমানী ছিলেন এ জোটের প্রার্থী। নির্বাচনে আরো কয়েকজন প্রার্থী থাকলেও, এটি জিয়া ও ওসমানীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্যবসিত হয়। সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল ওসমানীর প্রধান নির্বাচনী ইস্যু। নির্বাচনে জিয়া শতকরা ৭৬.৬৩ ভাগ এবং ওসমানী ২১.৭ ভাগ ভোট পান। জিয়ার সহজ বিজয় হয়। সামরিক শাসনাধীনে অনুষ্ঠিত এসব নির্বাচনে প্রধানত সরকারী নীল-নকশার বাস্তবায়ন ঘটে।

সারণী ২.২ ঃ ১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল।

দল/ফ্রন্টের নাম	প্রার্থী	প্রাপ্ত ভোট (প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার)
জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট	জেনারেল জিয়াউর রহমন	৭৬.৬৭
গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট	জেনারেল এম.এ.জি ওসমানী	২১.৭০
অন্যান্য		১.৬৩
মোট		১০০

উৎস ঃ Abdul Latif Masoom, Zia Regime, P. 116; Talukder Maniruzzaman, Bangladesh Revolution P. 225

Dhaka University Institutional Repository

৬. বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন ঃ ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টভূক্ত দলগুলোকে একীভূত করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করা হয়। পূর্বে প্রতিষ্ঠিত জাগদল বিলুপ্ত হয়ে যায়। জিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপি'র নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

৭. **জাতীয় সংসদ নির্বাচন** ঃ ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ছোট বড় ৩১টি দল অংশগ্রহণ করে। ৩০০ আসনের মধ্যে ২০৭টি আসন ও শতকরা ৪৪ ভাগ ভোট পেয়ে বিএনপি বিজয়ী হয়। আওয়ামী লীগ ৩৯টি আসন ও ২৫ ভাগ ভোট লাভ করে এবং সংসদে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। নির্বাচনের ফলাফলকে ভোটারদের ইচ্ছার প্রতিফলন ধরে নেয়া ঠিক নয়। কেননা সামরিক শাসনকে বৈধতাদানের প্রয়োজন থেকে ফলাফল এভাবে সাজানো ছিল তখনকার রীতি। যাহোক, ২ এপ্রিল নব নির্বাচিত সংসদের প্রথম অধিবেশনে শুরু হয়। ৬ এপ্রিল থেকে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এর মাধ্যমে জিয়ার বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া পূর্নতা পায়।

সারণী ২.৩ ঃ ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল।

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	প্রাপ্ত ভোট (প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২৯৮	২০৭	৪১.১৬
আওয়ামী লীগ	২৯৫	৩৯	২৪.৫৫
মুসলিম লীগ ও ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগ	২৬৬	২০	১০.০৮
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	২৪০	৮	৪.৮৪
আওয়ামী লীগ (মিজান)	১৮৪	২	২.৭৮
ন্যাপ (মোজাফফর)	৮৯	১	২.২৫
বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	১১	--	০.৩৯
অন্যান্য দল	৩২০	৭	৩.৮৫
স্বতন্ত্র	৪২২	১৬	১০.১০
মোট	২১২৫	৩০০	১০০

উৎস ঃ আবুল ফজল, বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা, পৃ- ১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

৩. সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী

জিয়ার শাসন আমলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী। ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদে তা গৃহীত ও পাশ হয়। এ দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পর্যন্ত সকল সামরিক আইন বিধি, আদেশ, ঘোষণা, অধ্যাদেশ বা অন্যান্য আইন ও আদেশকে সাংবিধানিক বৈধতা দেয়া হয়। পঞ্চম সংশোধনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এ দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়। 'ধর্মনিরপেক্ষতার' স্থলে 'সর্বশক্তিমান' আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস', সমাজতন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যায়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার, জাতীয়তাবাদ বলতে 'বাঙালির' পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' (অর্থাৎ ধর্মীয় উপাদান সংযুক্ত জাতীয়তাবাদের ধারণা) ইত্যাদি প্রতিস্থাপিত ও সংযোজিত হয়। ইসলামি সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করার নীতিও সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল জিয়া রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে উল্লিখিত পরিবর্তন এনে এক সংশোধনী আদেশ জারি করেন।

১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে এক সেনা বিদ্রোহে নির্মমভাবে নিহত হন। এর সঙ্গে তার সাড়ে পাঁচ বছরের শাসনের অবসান ঘটে।

সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনীঃ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ, অপসারণ অথবা মৃত্যুর কারণে পরবর্তী ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে সংবিধানের কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে। যার সংশোধনী দেশে ভবিষ্যৎ শাসন পরিচালনায় অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। এইরূপ সংশোধনীর প্রস্তাবে জাতীয় সংসদের কিছু সংখ্যক বিরোধী দলীয় সদস্য তীব্র বিরোধিতা করেন এবং সংসদের অধিবেশন বয়কট করেন।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু সংসদের ক্ষমতাসীন ও কিছু সংখ্যক স্বতন্ত্র ও বিরোধী দলের সদস্যদের উপস্থিতিতে তৃতীয় পাঠের পর ডিভিশন ভোটে ষষ্ঠ সংশোধনী বিল পাস হয়। বিলের পক্ষে ২৫২ টি ভোট পড়ে, বিপক্ষে কোন ভোট পড়েনি। ষষ্ঠ সংশোধনী বিলের ধারাগুলি নিম্নরূপঃ

১। সংবিধানের ৫১(৪) উপধারা সংশোধন করে প্রতিস্থাপন করা হয় যে, ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তিনি যে তারিখে প্রেসিডেন্টের কার্যভার গ্রহণ করবেন, সেই তারিখে তার পদ শূন্য হয়েছে বলে গণ্য হবে।

২। ৫১(৫) উপধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট অথবা ভাইস প্রেসিডেন্ট সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি প্রেসিডেন্ট অথবা ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ না করা পর্যন্ত সংসদ সদস্য থাকার যোগ্য হবেন না।

৩। ৫১(৬) উপাধারায় বর্ণিত হয়েছে যে একজন সংসদ সদস্য যদি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন অথবা ভাইস- প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন, তবে কার্যভার গ্রহণের দিনে সংসদে তার আসন শূন্য বলে গণ্য হবে।

৪। সংবিধানে (৬৬)২-(ক) উপধারা সংশোধন করে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যে, কেহ প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হবার কারণে প্রজাতন্ত্রের ফর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলে গণ্য হবে না।

এই সংশোধনীর বলে ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা লাভ করেন। পরবর্তীতে ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

বিচারপতি সাত্তারের শাসন কাল (৩০ মে ১৯৮১ - ২৪মার্চ ১৯৮২)

ক. রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ ও সেনা বিদ্রোহ দমন

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক সেনা বিদ্রোহে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হলে সংবিধান অনুযায়ী উপ-রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার (বয়স ৭৩) অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সে সময়ে সেনাবাহিনীর চিফ অব ষ্টাফ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের এবং বিভিন্ন সেনাছাউনির সমর্থনে বিচারপতি সাত্তার চট্টগ্রাম সেনা বিদ্রোহ দমনে সফল হন। আওয়ামীলীগ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দও বেসামরিক শাসনের প্রতি সমর্থন পূর্ণব্যক্ত করে, যা বিদ্রোহ দমনে বৃদ্ধ সাত্তারকে শক্তি ও সাহস যোগায়।

২.৪ দ্বিতীয় সামরিক শাসন ও জেনারেল এরশাদের শাসনামল (১৯৮২-১৯৯০)

ক. ক্ষমতা দখল

বিচারপতি সাত্তারের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের সীমাহীন দূর্নীতি, অন্তর্দ্বন্দ্ব, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সারাদেশে সামরিক আইন জারি করা হয়। জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। সংবিধান স্থগিত ঘোষিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আহসান উদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করা হয়। এরশাদ নিজে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং অপর দুই বাহিনীর প্রধানগণ উপ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর আহসান উদ্দিনকে সরিয়ে এরশাদ নিজেই রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন।

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার দৃশ্যত এরশাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেও, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থান। জেনারেল জিয়া নিহত হওয়ার (৩০ মে ১৯৯১) পর থেকেই তিনি এ লক্ষ্যে মনস্থির করেন বলে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়। সেনা বাহিনীর অভ্যন্তরে তিনি নিজের অবস্থান গুছিয়ে নিতে এবং

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যতে একটি আরো অনুকূল অবস্থার অপেক্ষায় কিছুটা কালক্ষেপণ করেন মাত্র। এ সময়ে তিনি দেশ শাসনে সেনা বাহিনীর স্থায়ী ভূমিকা থাকার কথা সদস্যদের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন। এভাবে 'গ্রাউন্ডওয়ার্ক' করে এরপর বৃদ্ধ ও অসুস্থ সাত্তারকে সরিয়ে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন।

১) বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচী

ক্ষমতা গ্রহনের পর এরশাদ বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করেন।[৭] এর মধ্যে, প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস ও বিকেন্দ্রীকরণ, ঢাকার বাইরে ৬টি জেলা সদরে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন, নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নে কমিশন গঠন, ভূমি সংস্কার পদক্ষেপ, ঔষধ নীতি প্রণয়ন, নারী নির্যাতন রোধে 'পারিবারিক আদালত' প্রতিষ্ঠা এবং পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ উল্লেখযোগ্য। সংশ্লিষ্ট মহলের প্রবল বিরোধিতা বা ভিন্ন কারণে এসবের কোন কোন বিষয় (যেমন, শিক্ষানীতি, ঔষধনীতি) তিনি বাস্তবায়ন করতে ক্ষম হননি। এরশাদের সংস্কার কর্মসূচীর মধ্যে প্রশাসনের পুর্নবিন্যাস ও বিকেন্দ্রীকরণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও উপজেলা ব্যবস্থা

১৯৮২ সালের ২৮ এপ্রিল এরশাদ জেনারেল মুনীমের নেতৃত্বে একটি প্রশাসনিক সংস্কার / পুনবিন্যাস কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রাক্তন ৪৬০টি থানাকে উপজেলায় রূপান্তরিত এবং মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয়। নতুন ব্যবস্থাধীনে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গঠিত উপজেলা পরিষদের জনগণের প্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা, মহিলা সদস্য অন্তর্ভূক্ত হন। সরকার নিযুক্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উপর পরিষদের নির্বাহী বা সচিবের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। এছাড়া, বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানীয় উন্নয়নের দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের হাতে অর্পন করা হয়। বিচার ব্যবস্থাকে উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বস্তুত উপজেলাকে প্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিম্নস্তর হিসেবে স্থির করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯

দীর্ঘ পার্বত্য উপজাতীয় সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে এরশাদ ১৯৮৭ সালে তার পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ. কে. খোন্দকারের নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির রিপোর্টের আলোকে ১৯৮৯ সালের ১ মার্চ জাতীয় সংসদে 'পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ পাশ হয়। এ আইনের অধীনে তিন পার্বত্য জেলার (বান্দরবন, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি) জন্য তিনটি স্থানীয় পরিষদ গঠন করে এর হাতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশসহ ২২টি বিভিন্ন বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্পন করা হয়। এই আইনে তিন জেলার প্রত্যেকটিতে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট একটি জেলা পরিষদ নিম্নোক্তভাবে গঠিত হওয়ার বিধান করা হয় পাহাড়ি ও বসতি স্থাপনকারী বাঙালী উভয় পক্ষকে নিয়ে তা গঠিত হবে, তবে অবশ্যই পাহাড়িদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে। পাহাড়ীদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। দু'পক্ষের প্রত্যেকের আসন সংখ্যা রিজার্ভ থাকবে, তবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিতে এবং প্রত্যেক জেলার ডেপুটি কমিশনার স্ব স্ব ক্ষেত্রে পদাধিকার বলে পরিষদের সচিব নিযুক্ত হবেন। আইনটি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে একটি অগ্রবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত।

২. সংবিধান সংশোধনী

এরশাদের প্রায় ৯ বছরের শাসন আমলে চার বার সংবিধান সংশোধন করা হয়, যথা- সপ্তম সংশোধনী, অষ্টম সংশোধনী, নবম সংশোধনী ও দশম সংশোধনী।[৮]

সপ্তম সংশোধনী

১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর জাতীয় সংসদে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী আইন পাশ হয়। ১৯৮২ সালের ২৪মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর সামরিক আইন তুলে নেয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সামরিক আইন চলাকালে ঘোষিত সকল আদেশ, নির্দেশ, ফরমান, গৃহীত সকল ব্যবস্থা অনুমোদন বা বৈধ করা এ সংশোধনীর প্রধান উদ্দেশ্য। এ দ্বারা বিচারকদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৬২ থেকে ৬৫ বছরে পুনর্নির্ধারণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম সংশোধনী

১৯৮৮ সালের ৭ জুন অষ্টম সংশোধনী বিলটি সংসদে পাশ করা হয়। এতে বলা হয়, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ধর্ম হবে ইসলাম। এটি পাশের পর সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। এরশাদ তার অবৈধ শাসনকে বৈধকরণ এবং জনগণের সমর্থন লাভের আশায় যে এ সংশোধনী আনেন তা স্পষ্ট। অষ্টম সংশোধনী দ্বারা রংপুর, যশোর, বরিশাল, সিলেট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম দেশের এ ৬টি জেলা সদরে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনেরও বিধান করা হয়। এটিও প্রচন্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। ১৯৮৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর দেশের আইনজীবিদের পক্ষ থেকে পূর্বে দাখিলকৃত এক রিট পিটিশনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ৮ম সংশোধনীর হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণের এই অংশ সংবিধান পরিপন্থী বলে ঘোষিত হয়। ফলে, জেলা সদরে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন বাতিল করা হয়।

নবম সংশোধনী

১৯৮৯ সালের ১০ জুলাই সংবিধানের নবম সংশোধনী বিলটি জাতীয় সংসদে পাশ হয়। এ সংশোধনী অনুযায়ী রাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত এবং তার মেয়াদ প্রেসিডেন্টের মর্জির ওপর না রেখে, ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে প্রেসিডেন্টের অনুরূপ একই সময় সরাসরি নির্বাচন এবং মেয়াদ বা কার্যকাল ৫ বছর স্থির হয়। একাধিকক্রমে দুই মেয়াদের অধিক কেউ স্বীয় পদে থাকবেন না এ মর্মে বিধান করা হয়। আরো স্থির করা হয় যে, প্রয়োজনে একে অন্যের কাছে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন। ১৯৯১ সালে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হলে নবম সংশোধনীর ভাইস প্রেসিডেন্টের অংশসহ অনেক কিছু বাতিল বা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

দশম সংশোধনী

১৯৯০ সালের ১২ জুন সংসদে দশম সংশোধনী বিলটি গৃহীত হয়। এ দ্বারা জাতীয় সংসদে ৩০টি আসন ১০ বছর মেয়াদে কেবল মহিলাদের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য সংরক্ষিত এবং পরোক্ষ পদ্ধতিতে এসব নির্বাচনের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার বিধান নতুন করে করা হয়।

৩. প্রশাসনের সামরিকীকরণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশ শাসনে সেনা বাহিনীর জন্য স্থায়ী ভূমিকার কথা বলে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তার শাসন আমলে প্রশাসনের ব্যাপক সামরিকীকরণ ঘটে। তথ্যসূত্রে দেখা যায় যে, ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ ছিলেন সামরিক বাহিনী থেকে আগত। ২৮ জন সেনাবাহিনীর অফিসার সচিবালয়ের উচ্চ পদে আসীন হয়েছিলেন। ২২টি বৃহৎ কর্পোরেশনের মধ্যে ১৪টির দায়িত্বে ছিলেন সেনাবাহিনীর লোকজন। ৬৪টি জেলার ৬৪টি জন এস.পি.র মধ্যে ৫৩ জনই ছিলেন সেনাবাহিনীভুক্ত। বিদেশে বাংলাদেশের ৪৮টি মিশনের প্রধানদের এক তৃতীয়াংশ ছিল সেনাবাহিনীর দখলে। এছাড়া আরো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-সংস্থার সেনাবাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতি ছিল খুবই লক্ষ্যনীয়।[৯] অদৃশ্য উপস্থিতি তো ছিলই। এরশাদের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া শেষেও এ চিত্রের খুব একটা হেরফের হয়নি।

৪. বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া

জেনারেল এরশাদ নিজ শাসনকে বেসামরিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে তার পূর্বসুরি জেনারেল জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। বস্তুত এক্ষেত্রে সকল সামরিক শাসকের মডেল প্রায় অভিন্ন। এরশাদ অনুসৃত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. **রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরুত্ব অনুমতি** ঃ বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে জেনারেল এরশাদ ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে 'ঘরোয়া রাজনীতি' এবং ১৪ নভেম্বর থেকে প্রকাশ্য রাজনীতি' চর্চার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু, কয়েক দফায় তাকে এরূপ রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করে দিয়ে পুনরায় প্রথম থেকে শুরু করতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২. **১৮ দফা কর্মসূচী** ঃ ১৯৮৩ সালের ১৭ মার্চ জেনারেল এরশাদ ১৮ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন, যা ছিল জিয়ার ১৯ দফা কর্মসূচীর অনুরূপ।

৩. **স্থানীয় সরকার নির্বাচন** ঃ ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশের ইউনিয়ন পরিষদসমূহের এবং ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ সালে সকল পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৪. **গণভোট অনুষ্ঠান** ঃ ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ দেশব্যাপী গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে এরশাদের অধিষ্ঠিত থাকা এবং তার অনুসৃত নীতিমালা ও কর্মসূচীর প্রতি জনগণের আস্থা বা সমর্থন আছে কি নাই তা ভোটারদের কাছে জানতে চাওয়া হয়। নির্বাচন কমিশনের হিসেব অনুযায়ী, গণভোটে এরশাদের পক্ষে শতকরা ৯৪.১৪ ভাগ আস্থা ভোট পড়ে। ফলাফল যা-ই দেখানো হোক না কেন, এতে যে খুবই স্বল্পসংখ্যক ভোটার অংশগ্রহণ করে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৫. **উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠান** ঃ এরশাদের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৮৪ সালের ২৪ মার্চ উপজেলা পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু বিরোধী দলের বয়কট ও প্রতিরোধের কারণে ঐ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। পরে ১৯৮৫ সালের ১৬ ও ২০ মে এ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এর মাধ্যমে এরশাদ উপজেলা পর্যায়ে একটি ক্ষমতার ভিত গড়ে তোলার সুযোগ পান।

৬. **দল গঠন** ঃ বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে রাজনৈতিক দল গঠন। এ লক্ষ্যে প্রথমে এরশাদের এক মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৯৮৩ সালে ১৮ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়ন পরিষদ

Dhaka University Institutional Repository

নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। একই বছর ২৭ নভেম্বর এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাষ্ট্রপতি আহসান উদ্দিনকে চেয়ারম্যান করে 'জনদল' নামে একটি দলের নাম ঘোষণা করা হয়। ১৮ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়ন পরিষদ এবং অন্যান্য দলের ক্ষুদ্র কিছু অংশ বা দলছুট ব্যক্তি এতে শামিল হয়। এরপর ১৯৮৫ সালের ১৬ আগষ্ট জনদলের সঙ্গে আরো ৪টি ক্ষুদ্র দল (কাজী জাফরের ইউ.পি.পি, সিরাজুল হোসেন খানের গণতান্ত্রিক পার্টি, বি.এ. সিদ্দিকীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের একটি অংশ এবং শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে বিএনপির একটি অংশ) মিলিত হয়ে 'জাতীয় ফ্রন্ট' নামে একটি জোট গঠন করে। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারী এদের একটি দলে একীভূত হওয়ার মাধ্যমে জাতীয় পার্টি গঠিত হয়। এরশাদ আরো পরে (১৯৮৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর) এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। এর পূর্বে তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন।

৭. **জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ** তিন দফা তারিখ পরিবর্তনের (২৭ মে ১৯৮৪, ৬ এপ্রিল ১৯৮৫, ২৬ এপ্রিল ১৯৮৬) পর অবশেষে ১৯৮৬ সালের ৭ মে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয়, জাতীয়পার্টি, জামায়াত, জাসদ, মুসলিম লীগ, ওয়ার্কার্স পার্টিসহ মোট ২৮টি দল অংশগ্রহণ করে। বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট নির্বাচন বর্জন করে।

সারণী ২.৪ ঃ ১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচণের ফলাফল

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	প্রাপ্ত ভোট (প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার)
জাতীয় পার্টি	৩০০	১৫৩	৫২.৩৪
আওয়ামী লীগ	২৫৬	৭৬	২৬.১৫
এন.এ.পি.	১০	৫	১.২৯
কমিউনিষ্ট পার্টি	৯	৫	০.৯১
বাকশাল	৬	৩	০.৬৭
জাসদ (সিরাজ)	১৪	৩	০.৮৭

Dhaka University Institutional Repository

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	প্রাপ্ত ভোট (প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার)
ওয়ার্কাস পার্টি	৪	৩	০.৫৩
ন্যাপ (মোজাফফর)	১০	২	০.৭১
গণ আজাদী লীগ	১	--	০.০৮৮
৮ দলীয় জোট	৩১০	৯৭	৩১২১
জামায়াতে ইসলামী	৭৬	১০	৪.৬০
জাসদ (রব)	১৩৮	৪	২.৫৪
মুসলিম লীগ	১০৩	৪	১.৪৫
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	৬০০	৩২	১৭.৮৬
মোট	১৫২৭	৩০০	১০০

উৎস ঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা, পৃ-১৯৫

জাতীয় পার্টি মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩টি ও শতকরা ৪২.৩৪ ভাগ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়। আওয়ামীলীগ এককভাবে ৭৬টি আসন ও শতকরা ২৬.১৫ ভাগ ভোট লাভ করে সংসদে দ্বিতীয় বৃহত্তর দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট সর্বমোট ৯৭টি আসন এবং শতকরা ৩২.২১ ভাগ ভোট পায়। নির্বাচনের পর আওয়ামীলীগ দাবি করে যে, নির্বাচনে জনগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে আওয়ামীলীগ ও জোটের প্রার্থীদেরই জয়ী করেছিল, কিন্তু এরশাদ সরকার মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে সে বিজয় ছিনিয়ে নেয়। পর্যবেক্ষকদের মতে, এ দাবির যথার্থতা রয়েছে।

এরশাদ পদত্যাগ ও একটি অর্থবহ নির্বাচনের দাবিতে বিরোধী দলসমূহ দূর্বার গণআন্দোলন এবং এক পর্যায়ে (নভেম্বর ১৯৮৭) একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করলে, ৬ ডিসেম্বর (১৯৮৭) এরশাদ জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন। পরের বছর ৩ মার্চ নতুন সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। আওয়ামী লীগ, বিএনপি সহ প্রধান বিরোধী দলসমূহ এ নির্বাচন বয়কট করে। ফলে তা এক প্রহসনে পরিণত হয়। নির্বাচন কমিশনের ফলাফল অনুযায়ী এতে জাতীয় পার্টি ২৫১ টি আসন পেয়ে বিজয়ী এবং আ.স.ম. আব্দুর রবের নেতৃত্বাধীন সরকার অনুগত্য

Dhaka University Institutional Repository

সম্মিলিত বিরোধী দল ১৯টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। বাকি আসনের ৩টি জাসদ (সিরাজ)।

৮. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঃ ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিরোধী দলসমূহ নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচনে ছোট ছোট দল ও স্বতন্ত্র মিলে মোট ১২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এরশাদ জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়ান এবং সরকারী হিসেব অনুযায়ী বিপুল ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হন।[১০] কার্যত এটি ছিল এরশাদের অপর একটি অর্থহীন নির্বাচনী প্রহসন।

চ. এরশাদ বিরোধী আন্দোলন

এরশাদ তার দীর্ঘ প্রায় ৯ বছরের শাসনামলের পুরো সময় প্রবল গণআন্দোলনের সম্মুখীন হন। এ আন্দোলনে রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবি, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, সাংবাদিক, বেতার-টেলিভিশন শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী, মহিলা, কৃষক, শ্রমিক-কর্মচারী প্রভৃতি শ্রেণী-পেশার জনগণ শামিল হয়। গড়ে উঠে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে এরশাদ বিরোধী বিভিন্ন জোট এবং শ্রেণী ও পেশাজীবিদের মধ্যে আন্দোলনের নতুন নতুন সংস্থা। এদের মধ্যে, ১৯৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে গঠিত ১৫ দলীয় ঐক্যজোট (১৯৮৬ সালের ৭ মে'র সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে যা বিভক্ত হয়ে ৮ দল ও ৫ দলের সৃষ্টি হয়), বিএনপি'র নেতৃত্বে ৭ দলীয় ঐক্যজোট, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (১৯৮৩) আন্দোলনের শেষের দিকে গঠিত ২২টি ছাত্র সংগঠন (যার মধ্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ অন্তর্ভূক্ত হয়), শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ), আইনজীবি সমন্বয় পরিষদ, ১৭টি কৃষক সংগঠন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক পর্যায়ে প্রণীত হয় ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোটের যৌথ ৫ দফা কর্মসূচী (অক্টোবর ১৯৮৩)। এর ভিত্তিতে গড়ে উঠে যুগপৎ আন্দোলন। ৫ দফা কর্মসূচীর মূল দাবি ছিল ঃ অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে আনা এবং যে কোন নির্বাচনের আগে সার্বভৌম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠান। রাজনৈতিক দল ও জোটের আহ্বানে শুরু হয় অর্ধদিবস, পূর্ণদিবস, ২৪ ঘন্টা, ৩৬ ঘন্টা, ৪৮ ঘন্টা, ৭২ ঘন্টার হরতাল ও অবরোধ। এরশাদ শাসনের অধিকাংশ সময় তা বারংবার ঘটে। ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর বুকে ও পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক' লেখা সহ ঢাকার জিপিও জিরো পয়েন্ট পুলিশের গুলিতে নূর হোসেন নিহত হলে, তা জনগণের চেতনামূলে নাড়া দেয়।

বিরোধী দলের উপর্যুপরি আন্দোলন ও কর্মসূচী ঘোষণার ফলে এরশাদ বারবার পিছু হটতে বাধ্য হন। বিভিন্ন নির্বাচনের তারিখ একাধিকবার ঘোষণা এবং পরে তা বন্ধ বা পরিবর্তন, একাধিকবার জরুরী অবস্থা ঘোষণা ও প্রত্যাহার, বিভিন্ন সরকারী নীতি বা পদক্ষেপ ঘোষণার পর তা প্রত্যাহার করে নিতে তাকে দেখা যায়।

১৯৯০ সালের নভেম্বর মাস থেকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন নতুন মাত্রা পায় এবং তা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। এর মূলে ছিল, তিন জোট (৮ দল, ৭ দল, ৫ দল) কর্তৃক ১৯ নভেম্বর সংবিধানের আওতায় এরশাদ ও তার সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ফর্মুলাসহ একটি যৌথ ঘোষণা জাতির সম্মুখে উপস্থাপন, যা 'তিন জোটের রূপরেখা' নামে খ্যাত। ১৭ নভেম্বর থেকেই শুরু হয়ে যায় ঢাকার মন্ত্রীপাড়া এবং সারাদেশে এরশাদ সরকারের দূর্নীতিবাজ এমপিদের বাসাবাড়ি ঘেরাও কর্মসূচী। ২৭ নভেম্বর বিএমএ (বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন) আহুত দেশব্যাপী চিকিৎসক ধর্মঘটের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসটি মোড়ে এরশাদের ঘাতক বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাণ হারান বিএমএ নেতা ডাঃ সামসুল আলম মিলন। এ হত্যাকান্ড এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়। ২৭ নভেম্বর রাতে সরকার দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং ঢাকা শহরে কার্ফুজারি করে। এসব উপেক্ষা করে জনগণও সংগ্রামী ছাত্রসমাজ আন্দোলনকে আরো তীব্র করে তুলে। ২৯ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সবাই আন্দোলনের সমর্থনে একযোগে পদত্যাগ করেন। এরপর এক এক করে

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দও পদত্যাগের ঘোষণা দেন। সংঘঠিত হয় এরশাদ বিরোধী '৯০ এর গণ অভ্যুত্থান। ৪ ডিসেম্বর এরশাদ ক্ষমতা থেকে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। ৬ ডিসেম্বর তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এভাবে, এরশাদের দীর্ঘ শাসনের অবসান ঘটে।

ছ. এরশাদের পতন ও এর কারণ

যেসব কারণে এরশাদের পতন ঘটে তা এরূপ-

ক) একটি নির্বাচিত সরকারকে মাত্র ১২৮ দিনের মাথায় ক্ষমতাচ্যুত করে অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা দখল,

খ) বিভিন্ন নির্বাচন (গণভোট, স্থানীয় সংস্থা, উপজেলা, জাতীয় সংসদ, রাষ্ট্রপতি) অনুষ্ঠান এবং কোন ক্ষেত্রে তা একাধিকবার করা সত্ত্বেও বৈধতা অর্জনে ব্যর্থতা,[১১]

গ) সন্ত্রাস ও কারচুপির আশ্রয় নিয়ে ভোটারবিহীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচন ব্যবস্থাসহ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধ যা কিছু ছিল তার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন এবং এর ফলে জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি,

ঘ) সমাজের সর্বত্র সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ব্যাপক বিস্তৃতি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতির ফলে জনজীবনে নিরাপত্তাহীনতা,

ঙ) দলীয় নেতা, মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক আমলা, ব্যবসায়ী, নিকট আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে দূর্নীতির প্রসার,

চ) প্রশাসনের সামরিকীকরণ,

ছ) এরশাদের চারিত্রিক স্খলন ও অবাধ লাম্পট্য,

জ) বাংলাদেশের সর্বস্তরের শ্রেণী পেশার জনগণের সর্বাত্মক বিরোধীতা এবং

ঝ) এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে চূড়ান্ত সেনাবাহিনীর সমর্থন প্রত্যাহার ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

২.৫ ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থান

২.৫.ক ঃ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশের জীবনের আরো একটি শুভ এবং ঐতিহাসিকক্ষণ হল ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯০ বিকেল ২.৪৫ মিঃ। বৃহস্পতিবার ৬ই ডিসেম্বর বিকেল পৌনে ৩টায় প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে ৮ বছর ২৫৬ দিনের ব্যক্তি কেন্দ্রীক স্বৈরাশাসনের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটেছে। তীব্র গণআন্দোলনের মুখে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ৪ঠা ডিসেম্বর রাতে রেডিও-টেলিভিশনের ভাষণের মাধ্যমে পদত্যাগের ঘোষণা দেন এবং বিরোধী দল সমূহকে উপরাষ্ট্রপতি পদে একজন ব্যক্তিকে মনোনিত করা আহবান করেন। বিরোধীদলগুলো ৫ই ডিসেম্বর ১৯৯০ইং মনোনীত উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রধান বিচারপতি শাহাব উদ্দিনের নাম ঘোষণা দেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ তা গ্রহণ করেন। বৃহস্পতিবার ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯০ সাল ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহম্মেদ সংবিধানের ৫১ ক (৩) অনুচ্ছেদ মোতাবেক পদত্যাগ করেন। এরপর উপরাষ্ট্রপতির পদ শূণ্য হয়। এরপর প্রেসিডেন্ট এরশাদ সংবিধানের ৫৫ ক (১) অনুচ্ছেদে উপরাষ্ট্রপতির শূণ্যপদে বিচারপতি শাহাবউদ্দিন আহম্মদকে উপরাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ করেন। শপথ বাক্য পাঠ করানোর পর এরশাদ পদত্যাগ করেন এবং পদত্যাগের দরুন উপরাষ্ট্রপতি শাহাবউদ্দিন আহম্মদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

জনাব শাহাবউদ্দিন আহম্মদ ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অনুষ্ঠানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে উপরাষ্ট্রপতি পদ শূণ্য থাকে। শুরু হয় অস্থায়ী সরকারের নির্বাচন উপলক্ষ্য কে সামনে রেখে কার্যক্রম। বিচারপতি শাহাবউদ্দিন অস্থায়ী সরকার প্রধান হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর এক বেতার ও টেলিভিশন ভাষনে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সত্যিকার জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান কাজ হচ্ছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় একটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করে দেয়া। যা করতে সরকার শত সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও সফল হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অস্থায়ী সরকার প্রধান জনাব শাহাবুদ্দিন আহম্মদ তার দায়িত্ব সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে পালনের জন্য ৫ দফায় মোট ১৭ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। তিনি এমন একটা উপদেষ্টা পরিষদ নিয়োগ করেছেন যার কেউই জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নাই।

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে সামনে রেখে অস্থায়ী সরকার প্রধান বিচারপতি সাহাবউদ্দিন আহম্মদ তার সরকারী কার্য পরিচালনা আরম্ভ করেন। অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ ছিলেন রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিগণ। সুতরাং তারা যে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন এটাই ছিল স্বাভাবিক।

*** নির্বাচনী তফসিলী ঃ**

দেশে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করার লক্ষ্যে সরকার সর্বপ্রথম যে কাজটি সম্পন্ন করেন, তা হলো নির্বাচন কমিশন পূণর্গঠন। এরশাদ আমলের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি সুলতান আহম্মদ পদত্যাগ করেন। তিনি পদত্যাগ করায় ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৯০ইং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবউদ্দিন আহম্মদ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফকে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করেন। তাছাড়া বিচারপতি নঈম উদ্দিন আহম্মদ ও বিচারপতি আমিনুর রহমান খানকে ও সরকার নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করে নির্বাচন কমিশন পূর্নগঠন করেন।

*** নির্বাচনের তারিখ ঘোষণ ঃ**

নির্বাচন কমিশন ১৫ই ডিসেম্বর ৯০ তারিখে ৫ম জাতীয় সংসদের নির্বাচনের তারিখসহ বিস্তারিত তফসিল ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে নির্বাচনের তারিখ এগিয়ে ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সালে ৫ম জাতীয় নির্বাচনের তাখি নির্ধারণ করা হয়। নির্বাচন কমিশনারের ঘোষণা অনুযায়ী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ ধার্য করা হয় ১০ই জানুয়ারী ১৯৯১। এই মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী

Dhaka University Institutional Repository

রিটার্নিং অফিসার কিংবা উভয়ের কাছে দাখিল করতে হবে। নির্বাচন কমিশনার ২২শে জানুয়ারী ৯১ মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন। প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ছিল ২১শে জানুয়ারী, ১৯৯১।

*** ভোটার তালিকা সংক্রান্ত ঘোষণা ঃ**

কমিশনার সূত্র অনুযায়ী ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটার ছিল ৬ কোটি ১৯ লক্ষ ৬৬ হাজার ১০৮ জন এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ছিল ৩ কোটি ২৮ লক্ষ এবং মহিলা ভোটার ছিল ২ কোটি ৯০ লক্ষ।

*** রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ ও নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ ঃ**

নির্বাচন কমিশন ৫ম জাতীয় সংসদ ১৯৯১ নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য সারা দেশের ৬৪টি জেলা প্রশাসককে রিটার্নিং অফিসার ও ২টি আন্তঃজেলা নির্বাচনী এলাকার জন্য ২জন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করেন। ৬৬ জন রিটার্নিং অফিসার ও ৪১৭ জন সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তা করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন ৪৬০ জন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ১০ জন জেলা নির্বাচনী অফিসার এবং ১ জন থানা শিক্ষা অফিসার।

১৯৮৪ সালের ২০ অক্টোবর প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় সংসদের ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার যে সীমানা প্রকাশিত হয় ৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সে সীমানা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়।

*** নির্বাচন কর্মকর্তা অধ্যাদেশ ঃ**

নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ বিধানের লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা অধ্যাদেশ ১৯৯০ নামে একটি নতুন অধ্যাদেশ ২৬শে ডিসেম্বর /৯০ তারিখ জারি করেন। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত সকল ব্যক্তিকে সরাসরি নির্বাচন কমিশনের অধীনে আনবার বিধান করা হয়েছে। নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে কোনরূপ অবহেলা বা অসদাচরণের জন্যে অধ্যাদেশে কঠোর শাস্তির বিধান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাদেশের ৪ (৩) ধারা অনুসারে-নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ নিয়োগ লাভের পর থেকে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের অধীনে চাকুরীরত রয়েছেন বলে গণ্য করা হবে। ৪ (১) ধারার বিধান অনুসারে কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনের কাজে নিয়োগ করা হলে তার দায়িত্ব গ্রহণে বা পালনে অপরাগতা বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করতে পারবে না।

নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত ভাবে ব্যর্থ হলে কিংবা অস্বীকৃতি প্রকাশ করলে বা কোন নির্বাচনী আইনের বিধান ইচ্ছাকৃত ভাবে লংঘন করলে কঠোর সাজাপ্রাপ্ত হবেন। এসব অপরাধের জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত করে চাকরী থেকে অপসারণ বা বরখাস্ত করা যেতে পারে। কোন ব্যক্তি তার নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে নির্বাচন কমিশন বা নির্বাচন কমিশনারের সম্মতি ক্রমে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার তাকে তাৎক্ষণিকভাবে চাকুরী থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবেন।

*** বিভাগওয়ারী নির্বাচনী আসন ঃ**

৩০০টি নির্বাচনী আসনের মধ্যে

১. রাজশাহী বিভাগে সর্বমোট আসন ৭২টি
২. খুলনা বিভাগে সর্বমোট আসন ৬০টি
৩. ঢাকা বিভাগে সর্বমোট আসন ৯০টি
৪. চট্টগ্রাম বিভাগে সর্বমোট আসন ৭২টি

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী ইশতেহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্মসূচী ও অঙ্গীকার জনগণের সামনে পেশ করার মাধ্যমে গণরায় গ্রহণের চেষ্টা করে। সেই অর্থে ইশতেহার হচ্ছে রাজনৈতিক দলের প্রদত্ত অঙ্গীকারের লিখিত দলিল।

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে ভোটাররা রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচী ও প্রতিশ্রুতি বিবেচনা করে তাদের ভোট প্রদান করে থাকে। আমাদের দেশে ইশতেহার ছাড়া কথা বার্তা দ্বারাই জনগণ প্রভাবিত হয়ে থাকে। ৯১ এর ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও দেশের প্রথম সারির রাজনৈতিক দলগুলো যথা- আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় পাঁচ দল, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি, ফ্রিডম পার্টি, ন্যাপ প্রভৃতি দলগুলো বিভিন্ন প্রকৌশলের মাধ্যমে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। সাধারণ ভোটাররা এসব ইশতেহার তুলনামূলকভাবে পুংখানুপুংখ বিচার করবেন না। তবে সচেতন নাগরিক ও বুদ্ধিজীবিদের নিকট ইহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আওয়ামীলীগের ইশতেহার ছিল সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত জনগণের মৌলিক অধিকার পরিপন্থী সকল বিবর্তনমূলক আইন ও কালাকানুন বাতিল করা। বিএনপির ইশতেহার ছিল সংবিধান পরিবর্তন না করে সর্বপ্রকার কালাকানুন বাতিল করে জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা। জাতীয় পার্টির লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদের ক্ষমতার মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য সৃষ্টি করা এবং তাদের মৌলিক আদর্শ ও মূলনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য সমূহ অব্যাহত রাখা সংবিধানের কোন প্রকার পরিবর্তন হবে না। ৫ দলের ইশতেহার ছিল ১ম ও তৃতীয় সংশোধনী বাদে অন্য সব বাতিল করা হবে। জামায়াতের ইশতেহার হলো সংবিধানের ধারা হবে কোরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে।

বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া নির্বাচনী জনসভায় বলেন, তারদল ক্ষমতায় গেলে দেশে কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা ও কলকারখানা স্থাপন করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রসার ঘটানো হবে। ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ ও ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করবে।

শেখ হাসিনা দেশের উত্তরাঞ্চলের এক নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা প্রদান কালে বলেন, তার দল ক্ষমতায় গেলে 'যমুনা' বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নিবে।

Dhaka University Institutional Repository

*** নির্বাচন ঃ**

নির্বাচন কমিশন ২৭শে ফেব্রুয়ারী ৯১ এর ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ধার্য করেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী/৯১ ২৯৮টি আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২৯৮টি আসনের মধ্যে ২৭শে ফেব্রুয়ারী/৯১ তারিখে ২৯৪টি আসনের ২১টি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত হয়ে যায়। এই ২১টি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় ৯ই মার্চ/৯১। ৩০০টি আসনের মধ্যে বাকী ২টি আসন 'ময়মনসিংহ'-৩ ও 'কুষ্টিয়া'-২ আসনে প্রার্থী মৃত্যুজনিত কারণে নির্বাচনের তারিখ পূনঃনির্ধারণ করা হয় যথাযথভাবে ১৪ই মার্চ/৯১ ও ২৮শে মার্চ/৯১ তারিখ।

সারণী- ২.৫

নির্বাচনী মোট সাধারণ আসন	৩০০টি (সংরক্ষিত আসন ছাড়)
মোট দলীয় প্রার্থী- ২৩৫০ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী- ৪২৫ জন	সর্বমোট প্রার্থীর সংখ্যা- ২৭৭৪জন
অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের	৭৬টি

সংখ্যা	
মোট ভোটারের সংখ্যা	৬,১৯,৬৩,১০৮ জন
পুরুষ ভোটারের সংখ্যা	৩,২৮,৮৭,৮৩৩ জন
মহিলা ভোটারের সংখ্যা	২,৯০,৭৫,২৭৫ জন
মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা	২৩,৯৬২টি
রিটার্নিং অফিসার	৬৭ জন
প্রিজাইডিং অফিসার	২৩,৯১৬ জন
সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার	১,১১,৬১৬ জন
পোলিং অফিসার	২,২৩,২৩২ জন
ভোটার কক্ষের সংখ্যা	১,১১,৬১৬টি
ভোট কেন্দ্রে নিয়োজিত ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা সর্বমোট সংখ্যা	৩,৫৮,৮৮০ জন

Dhaka University Institutional Repository

৪টি বিভাগে ৩০০টি আসনের জন্য মোট মনোনয়নপত্র জমা পড়ে-

১. ঢাকা বিভাগে ১১৬৯টি
আসন সংখ্যা ৯০টি

২. চট্টগ্রাম বিভাগে ৯৯৮টি
আসন সংখ্যা ৭৮টি

৩. রাজশাহী বিভাগে ৮৯৩টি
আসন সংখ্যা ৭২টি

৪. খুলনা বিভাগ ৭৬০টি
আসন সংখ্যা ৬০টি

মোট মনোনয়ন পত্র জমা পড়ে ৩৭৯৪টি, ২১শে জানুয়ারী /৯১ প্রার্থী প্রত্যাহারের সর্বশেষ দিনে ১০১৮ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন। প্রত্যাহারের পর বৈধ মনোনয়নপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৭৭৪ জনে উপনীত হয়। প্রতিটি আসনে গড়ে প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৯.৩ জন।

৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাধিক পরিমান রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে যার সংখ্যা ছিল ১১১টি, অতীতে আর কোন নির্বাচনে এত রাজনৈতিক দল যোগ দেয়নি।

১. ১৯৭৩ সালে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ১৪টি
২. ১৯৭৯ সালের অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৭৯টি
৩. ১৯৮৮ সালের অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৮টি
৪. ১৯৯১ সালের অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ১১১টি

যদিও ১১১টি রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশন থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রতীক বরাদ্ধ নেয়। তন্মধ্যে ২১টি দল বা জোট কোন প্রার্থী দিতে পারেনি। ১৩টি দল ১টি করে আসনে প্রার্থী দেয়। ১০টি আসনের নীচে প্রার্থী দিয়েছেন এমন দলের সংখ্যা ৪২টি। নিম্নে বিশিষ্ট কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নাম ও তাদের প্রার্থীর সংখ্যা দেয়া হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

১. বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ও তার জোট ২৯৮টি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছে।

২. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী (বিএনপি) দল ২৯৯টি আসনে মনোনয়ন দিয়েছে।

৩. জাতীয় পার্টি ২৭০টি আসনে মনোনয়ন দিয়েছে।

৪. জাকের পার্টি ২৪৭টি আসনে মনোনয়ন দিয়েছে।

৫. জামায়াতে ইসলামী ২২১টি আসনে মনোনয়ন দিয়েছে।

৬. জাসদ (রব) ১৬৫টি আসনে মনোনয়ন দিয়েছে।

৭. জনতা দর ৫১টি আসনে মনোনয়ন দিয়েছে।

৮. এ.ডি.পি. ১৮টি আসনে মনোনয়ন দিয়েছে।

৯. ন্যাপ ভাসানী ৩১টি আসনে মনোনয়ন দিয়েছে।

১০. মুসলিম লীগ ৮২টি আসনে মনোনয়ন দিয়েছে।

১১. খেলাফত আন্দোলন ৪২টি আসনে মনোনয়ন দিয়েছে।

১২. ফ্রিডম পার্টি ৬৪টি আসনে মনোনয়ন দিয়েছে।

১৩. কেন্দ্রীয় ৫ দলীয় জোট ২৫৮টি আসনে মনোনয়ন দিয়েছে।

১৪. জাসদ (সিরাজ) ৩৩টি আসনে মনোনয়ন দিয়েছে।

*** নির্বাচনী ফলাফল ঃ**

৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন/৯১ সর্বমোট আসন সংখ্যা ছিল ৩৩০টি। এর মধ্যে ৩০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। ৩০০টি সাধারণ আসন যা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। ৩০টি মহিলা সংরক্ষিত আসন যা ৩০০ জন নির্বাচিত এমপিদের ভোটে নির্বাচিত হন। ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০টি মহিলা সংরক্ষিত আসনের মধ্যে বিএনপি, জামায়াতের সাথে আঁতাত করে যথাক্রমে ২৮টি ও ২টি আসন ভাগাভাগি করে নেন। কারণ মহিলা আসন নির্বাচন পদ্ধতি হল সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সেক্ষেত্রে বিএনপির ১৪০ ও জামায়াতের ১৮টি, সর্বমোট ১৫৮টি ভোটের মাধ্যমে মহিলা আসনগুলো নির্বাচিত হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগ সহ জামায়াত ছাড়া আর কেহ মহিলা আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

২৭শে ফেব্রুয়ারী /৯১ বুধবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টি পর্যন্ত একটানা ২৯৮টি আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাকী ২টি আসন মুন্সীগঞ্জ-৩ ও কুষ্টিয়া-২ আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৪ই মার্চ/৯১ ও ২৮শে মার্চ/৯১ উক্ত ২টি আসনসহ জাতীয় সংসদের অনুষ্ঠিত ৩৩০টি আসনের ফলাফল দেখানে হলোঃ

মহিলা ৩০টি আসনসহ ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৩৩০টি আসনে সর্বশেষ দল ভিত্তিক ফলাফল।

সারণী ২.৬

রাজনৈতিক দলের নাম	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত আসন	প্রাপ্ত আসন
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১৮০	২৮	১৬৮
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৮৮	--	৮৮
জাতীয় পার্টি	৩৫	--	৩৫
জামায়াতে ইসলামী	১৮	২	২০
সিপিবি	৫	--	৫
বাকশাল	৪	--	৪+১ = ৫
ন্যাপ মোজাফফর	১	--	১
৫ দল (ওয়ার্কস পার্টি)	১	--	১
ইসলামী ঐক্যজোট	১	--	১
জাসদ (সিরাজ)	১	--	১
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এনডিপি)	১	--	১
স্বতন্ত্র	৩	--	৩
গণতন্ত্র পার্টি	১	--	১
সর্বমোট	৩০০	৩০	৩৩০

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগওয়ারী ফলাফলে দেখা যায় যে, ঢাকা চট্টগ্রামের আসনগুলোতে বিএনপি একচেটিয়া আসন লাভ করে। রাজশাহী বিভাগে বিএনপি বেশী আসন ফেলেও আওয়ামীলীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াত বেশ ভাল করে। খুলনা বিভাগে আওয়ামীলীগ সর্বাধিক আসন লাভ করে। চট্টগ্রাম বিভাগে বিএনপি ৩৭টি আসন ঢাকা বিভাগে বিএনপি ৫৭টি আসন, আওয়ামী লীগ চট্টগ্রাম বিভাগে পেয়েছে ১৭টি আসন এবং ঢাকা বিভাগে পেয়েছে ২৫টি আসন।

৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বমোট ৭৬টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে এবং এর মধ্যে ৬৫টি রাজনৈতিক দল একটি আসনও পায়নি। নীচে রাজনৈতিক দলগুলোর আসন ভিত্তিক বিশ্লেষণ দেখানো হলো ঃ

সারণী ২.৭

রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত আসনে ভোটের পরিমাণ	প্রাপ্ত প্রতিটি আসনে গড়ে ভোটের পরিমান
বিএনপি	১,০৩,৮৬,৫৫৭	৩১.৪৫%	১৪০	৭২,৬১,২১৭	৫১.৬৫৬টি
আওয়ামী লীগ	১,১৯,০৭৮৫৩	৩১.৮৪%	৮৮	৪২,০১,৮২৯	৪৭,৫০০টি
জাতীয় পার্টি	৩৮,১৯,৮৫৭	১১.৭৪%	৩৫	১৫,১০,৩০০০	৪৩,১৫১টি
জামাতে ইসলাম	৩৮,৬১,২৫০	১১.৭৪%	১৮	৮,৭৬,৭০০০	৪৮,৭২৫টি
সিপিবি			৫		
বাকশাল			৫		
গণতন্ত্রী পার্টি			১		
ন্যাপ (মোজাফফর)			১		
৫ দল			১		
ইসলামী ঐক্যজোট			১		
জাসদ (সিরাজ)			১		
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি			১		

Dhaka University Institutional Repository

*** নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনা ঃ**

নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অভিজ্ঞ মহল বলেছেন ভোটারা এবার এত্যন্ত সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। অতীত ব্রুট মেজরিটির সুবাদে ক্ষমতাসীন দল যেভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে তার অভিজ্ঞতা ভাল নয়। এবারই প্রথম বারের মত জনগণ ফাউকে ব্রুট মেজরিটি দেয়নি। এবারের সংসদের গঠনে "check and balance" এর সুযোগ রয়েছিল। অসাংবিধানিক স্বৈরাচার মুক্তি জাতি সাংবিধানিক তথা সংসদীয় স্বৈরাচারের ব্যাপারেও সতর্ক।

নির্বাচনী প্রচারাভিযানে ধর্মীয় শ্লোগানের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এবং বিসমিল্লাহকে সংযুক্ত করে স্লোগান অনেক দলই দিয়েছে। লক্ষ্য ছিল ধর্মপ্রাণ মানুষকে আকৃষ্ট করা। ৯১ এর নির্বাচনী প্রচারাভিযান ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সাধারণ মানুষ মুল দুই দলের সমাবেশেই ভিড় করেছে। তবে নীরব বিদ্বেষমূলক বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তত্ত্বাবধায়ক ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সরকারী দলবিহীন এ নির্বাচনে মানুষ অতীতের সরকার গুলোর কার্যক্রম মূল্যায়নের সুযোগ পেয়েছে। ভোটাররা প্রার্থীদের সঙ্গে এমন আচরণ করেনি যাতে তারা নিরাশায় পতিত হন। জয় সম্পর্কে অনেকেই আশাপোষণ করেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা হল তারা জাতীয় মূল্যায়নের সুযোগ পেয়েছে। ভোটাররা প্রার্থীদের সঙ্গে এমন আচরণ করেনি যাতে তারা নিরাশায় পতিত হন। জয় সম্পর্কে অনেকেই আশাপোষণ করেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা হল তারা জাতীয় রাজনৈতিক ইস্যুকে গুরুত্ব দিয়ে প্রার্থীর চাইতে প্রতীককে প্রাধান্য প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। রাজনৈতিক মেরুকরণটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যার জন্যে ৯১ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটাভুটি অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের পক্ষে শর্ত হয়ে দাঁড়ায়। আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে যে, এবার সরকার ও প্রশাসন নির্বাচনকে সুষ্ঠ ও অবাধভাবে তোলার জন্য অনেক পদক্ষেপ নিয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিজয়ের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

১. বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি ও জনপ্রিয়তা
২. জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রসার
৩. স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে অনমনীয় ও অপরিবর্তনীয় মনোভাব
৪. তরুনদের মধ্যে দলটির জনপ্রিয়তা
৫. নেতিবাচক বিদ্বেষমূলক বক্তব্য থেকে বিরত থাকা। বেগম জিয়া তার বক্তৃতায় প্রতিপক্ষ কোন দল বা নেতা নেত্রীর নাম উল্লেখ করেনি।
৬. বেগম জিয়ার ব্যাপক নির্বাচনী সফর
৭. নির্বাচনী প্রচারণায় জাতীয় ইস্যুকে তুলে ধরার প্রয়াস
৮. বিএনপির নির্বাচনী বক্তব্য প্রথম সরকারের সমালোচনা, আমলের সাফল্য চিত্রায়ন, স্বৈরাচারী এরশাদের আমলে কোন নির্বাচনে না যাওয়ায় অঙ্গীকার পালনের ব্যাখ্যা ইত্যাদি। শেষ কয়েকদিনের নির্বাচনী সভাগুলোতে বিপুল লোক সমাগমের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী জোয়ার সৃষ্টির দরুন দলটির পক্ষে বিজয় আসে।

আওয়ামীলীগের সাংবিধানিক ভিত্তি সবচেয়ে ভাল। দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশী আশাবাদী ছিল কিন্তু

১. 'জয়বাংলা' ও বাংলাদেশ জিন্দাবাদ এর বিতর্কে জড়ানো।
২. নির্বাচনী জোট গঠন নিয়ে শরীকদের সঙ্গে আলোড়ন মনোভাব ও শেষ মূহুর্তে আপোস করার জটিলতা;
৩. জোটের প্রার্থীদের সমর্থনে দলীয় প্রার্থী ও সমমনাদের প্রার্থী পদ নিয়ে সমস্যা।
৪. নির্বাচনী বক্তব্যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষমূলক বক্তব্য তুলে ধরা।
৫. জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের আভ্যন্তরীন কোন্দল।

Dhaka University Institutional Repository

৬. স্বৈরাচারী এরশাদের পদত্যাগপূর্ব ও পরবর্তী অবস্থাকে পুঁজি না করা

৭. দলীয় কর্মীদের প্রতি অতি বিশ্বাস

৮. নির্বাচনের পূর্বের দিন দলীয় নেত্রীর বক্তব্য ইত্যাদি কারণে দলটি তাদের প্রত্যাশা লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

অন্যদিকে জাতীয় পার্টি ৩৫টি আসনে জয়লাভের পেছনে ছিল-

১. বিজয়ী প্রার্থীদের স্ব স্ব এলাকায় উন্নয়ন তৎপরতা।

২. স্থানীয় ব্যক্তি ভিত্তিক সহানুভূতি লাভ।

৩. অধিকাংশ এলাকার উপজেলা ও ইউপি কর্মকর্তাদের অধিকাংশ তাদের পক্ষে কাজ করেছেন। নিভৃত এবং সর্বোপরি টাকার ছাড়াছড়ি ছিল উল্লেযোগ্য। নির্বাচনে মোট ৭৩টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে ৬৫টি রাজনৈতিক দল কোন ভোট পায়নি।

৯১ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়া ৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ৫টি আসনেই তিনি জয়লাভ করেন। শেখ হাসিনা ৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মাত্র ১টি আসনে জয়লাভ করেন। হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ ৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ৫টি আসনেই জয়লাভ করেন।

*** নির্বাচনকালীন হতাহত ঃ**

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অভূতপূর্ব শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হলেও নির্বাচনের আগে ও পরে বিভিন্ন স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বি রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে ১৫ জন নিহত এবং প্রায় সহস্রাধিক নেতা ও কর্মী আহত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে শতাধিক নির্বাচনী প্রচারণা কেন্দ্রে অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুর করা হয়।

নির্বাচনের পূর্বে ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুষ্টিয়া ও বরিশাল ১ জন প্রার্থীসহ আওয়ামীলীগ, বিএনপি, এনডিপি ও জাসদের মোট ১০ জন

Dhaka University Institutional Repository

নিহত হয়। নির্বাচনের দিন চট্টগ্রাম-৩ আসনের বিএনপি নেতা সিরাজ ও পোলিং এজেন্ট আবুল কালামকে গুলি করে হত্যা করা হয়। নির্বাচনের পরের দিন খুলনা ১ জন বিএনপি কর্মীকে দুস্কৃতকারীরা শ্বাসরুদ্ধকর ভাবে হত্যা করে বিএনপি অভিযোগ করেছে।

নির্বাচনী তৎপর্তী বিদেশী পর্যবেক্ষকদের ভাষ্য

ও

পরাজিত দলের বক্তব্য

১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে প্রত্যক্ষ করার জন্য বেশ কিছু বিদেশী পর্যবেক্ষকদল বাংলাদেশে আসেন। যে সকল পর্যবেক্ষকদল নির্বাচনকে প্রত্যক্ষ করার জন্য বাংলাদেশে আসেন সেগুলো হলোঃ

১. পিটার শেরের নেতৃত্বাধীন বৃটিশ পার্লামেন্টারী পর্যবেক্ষক দল।
২. হিয়োমটি যাকুদার নেতৃত্বাধীন জাপানী পর্যবেক্ষকদল।
৩. কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষকদল ও
৪. সার্ক পর্যবেক্ষকদল

১. বৃটিশ পর্যবেক্ষকদল ঃ সর্বদলীয় বৃটিশ সংসদীয় পর্যবেক্ষক দল ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ এর ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ভোটারদের মুক্তভাবে ভোট দেয়ার দৃষ্টান্ত বলে অভিহিত করেছেন। ১লা মার্চ/৯১ পর্যবেক্ষক দলের পিটার শের এবং অন্যান্য সদস্যরা বলেছেন যে, তারা ঢাকা ও সিলেটের বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। মুক্ত এবং অবাধভাবে ভোট দানের ঘটনায় তারা সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে জানান, বৃটিশ পর্যবেক্ষকদল ঢাকা মহানগরীর কোতয়ালী থানার লালবাগ ও মতিঝিল এবং সিলেটের গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন অঞ্চলের ৬৯টি ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। তারা বলেন যে, তারা কয়েকটি এলাকায় ভোটার তালিকায় তাদের নাম দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়েছেন। তাদের অভিমত হচ্ছে একটি নিখুঁক ভোটার তালিকা

Dhaka University Institutional Repository

থাকলে ভাল হতো তবে তারা মনে করেন যে, অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠান করার কারণে তা হয়ত সম্ভব হয়নি।

২. **জাপানী দল ঃ** ১লা মার্চ/৯১ সালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাপানী সংসদীয় দলের নেতা হিরোমিচি ফুফুফা বলেছেন এ নির্বাচন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

পর্যবেক্ষকদলের সদস্যরা বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচিন সাধারণতঃ অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়ে থাকে। তারা বলেন, আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি যে, বাংলাদেশের মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী সকল রাজনৈতিক দলসমূহ একটি সহনশীল এবং গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের লক্ষ্যে সহযোগিতা করবে। তারা জানান যে নির্বাচনের দিনে তারা ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং নারায়নগঞ্জের ৭টি নির্বাচনী এলাকার ২১টি ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং অনেক ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন। পর্যবেক্ষক দল দেখতে পান যে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব সফল কর্মকর্তা সুষ্ঠ ভাবে পালন করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এজেন্টদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব দেখতে পেয়ে আমরা অত্যন্ত খুশী হয়েছি। পর্যবেক্ষকদলের সদস্যরা বলেন, বাংলাদেশের জনগণ একটা অবাধ নির্বাচন চেয়েছিল। সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে তাদের আশা পূর্ণ হয়েছে। তারা বলেন যে, একথা ঠিক ভোটার তালিকায় কিছুটা অনিয়ম তা নির্বাচনী ফলাফলে তেমন কোন প্রভাব ফেলেনি। আওয়ামীলীগ সভানেত্রী নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলে যে অভিযোগ করেছেন সে প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে জাপানী পর্যবেক্ষক দল বলেন, তারা শহরাঞ্চলে তাদের সীমিত ক্ষমতা নিয়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন, অন্যান্য বিদেশী পর্যবেক্ষকদল গুলো ও অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. **কমনওয়েলথ দল** ঃ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আগত কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষকদল বৃহস্পতিবার, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ ঢাকায় বলেছিলেন যে, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ৯১ ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের জনগণের একটি বড় সাফল্য। দলের চেয়ারম্যান দাতো প্রার্থ মানবেন সাংবাদিকদের বলেন যে, নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও ভোটে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের জনগণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি প্রতিশ্রুতবদ্ধ। পর্যবেক্ষকদল ২৭শে ফেব্রুয়ারী/৯১ ৬০টি আসনের প্রায় ৩০০টি ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তারা নির্বাচনী ব্যবস্থা পর্যবেক্ষন করার জন্য ব্যাপকভাবে সফর করেন। তারা বলেন, সকল পর্যায়ের নির্বাচন কর্মকর্তাদের দক্ষতা ত্যাগ আমাদের অভিভূত করেছে। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্যে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের সম্পাদিত দায়িত্বের তিনি প্রশংসা করেন। তবে তিনি বলেন যে, এ সাফল্য বাংলাদেশের জনগণের নিকট বড় বিজয়, প্রতিনিধি দল কমনওয়েলথ মহাসচিবের নিকট তাদের রিপোর্ট পেশ করেন।

৪. **সার্ক পর্যবেক্ষকদল** ঃ ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আগত সার্ক পর্যবেক্ষকদলের ২ জন সদস্য ঢাকা জেলার বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার ১১টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ পর্যবেক্ষণ শেষে স্থানীয় সাংবাদিকদের বলেছেন যে, বাংলাদেশের এ নির্বাচন অন্যান্য সার্ক দেশের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে থাকবে। এই দুই জনের একজন ভারতের মের্ত্তন পত্রিকায় সম্পাদক নির্মর চক্রবর্তী বলেছেন, আমরা একটি নিরপেক্ষ, অবাধও সুষ্ঠ পরিবেশে ভোটারদের নির্ভয়ে ভোট দিতে দেখেছি। অপর সদস্য পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব নিয়াজ লায়েক বলেছেন- বাংলাদেশের মত একটি ৯১ এর নির্বাচন একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা। তিনি বলেন, এ ধরণের নির্বাচন অন্যান্য সার্ক দেশের জন্য একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তিনি আরো বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনগণের আহবান ও দাবী পূরণ করার লক্ষ্যে সঠিকভাবে সাড়া দিতে পেরেছে।

Dhaka University Institutional Repository

*** পরাজিত দল সমূহের বক্তব্য ঃ**

৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মহিলা আসন ব্যতীত সর্বমোট ১৪০টি আসন পায় এবং সরকার গঠন করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দলসমূহ। নির্বাচন পরাবর্তী সময়ে যে বিবৃতি দেন তন্মধ্যে নিম্নে উল্লেখযোগ্য ২/১টি দলের বক্তব্য তুলে ধরা হলো।

*** আওয়ামীলীগ** ঃ ৪ঠা মার্চ/৯১ নির্বাচনোত্তর আওয়ামীলীগ এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেছেন যে, ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে, কিন্তু সুষ্ঠ হয়নি। নির্বাচনের বায়ে শক্তিগুলো এ নির্বাচনে গোপন আতাঁতের মাধ্যমে ষড়যন্ত্র মূলক কর্মকান্ড, ভিত্তিহীন মিথ্যা প্রচারনা, কালো টাকার ব্যয় ভয়ভীতি ও অদৃশ্য শক্তির প্রভাব খাটিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্খাকে নস্যাৎ করার হীন অপপ্রয়াস চালিয়েছে। জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ঢাকা ৬ আসনে প্রার্থী মোজাফফর হোসেন পল্টু বলেন, নির্বাচনের ফলে জাতিকে কাংখিত সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনিশ্চিয়তার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। লিখিত বক্তব্যে তিনি অভিযোগ করেন অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারী প্রতিশ্রুতি সত্বেও স্বৈরাচারের দোসর ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো নির্বাচনের রায়কে সুপারিকল্পিত ছকে অতীতের মত সুক্ষ্ম কারচুপি ও নির্বাচনী বিধি ভঙ্গনে মদদ যুগিয়েছে। সে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করার সব পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়েছে।

*** ওয়াকার্স পার্টি** ঃ ওয়াকার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও নব নির্বাচিত এম.পি রাশেদ খান মেনন বলেছেন, ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সরকার গঠন করার জন্য এমন আহবান জানিয়েছিল। তিনি বলেন, এ নির্বাচন জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশ্যাপূর্ণ হয়েছে। এজন্য আমি অস্থায়ী সরকারকে ধন্যবাদ জানাই।

Dhaka University Institutional Repository

*** জামায়াতে ইসলামী ঃ** জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান ৩রা মার্চ/ ৯১ দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষনে বলেন, জনগণের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচনের যে ফলাফল হয়েছে তা আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছি এবং এটাই সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক স্পিরিট।

*** জাতীয় পার্টি ঃ** ২রা মার্চ /৯১ সালে জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহম্মদ বলেছেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে এ প্রথম একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ভোট গ্রহণ পর্বের ব্যবস্থাপনায় অস্থায়ী সরকারের ভূমিকা ও দক্ষতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে নির্বাচনের প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়ার দিক দিয়ে জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রে অনুসৃত আচরণ নিরপেক্ষ বা গণতান্ত্রিক কোনটাই ছিল না। তিনি সহস্র প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

সরকার গঠনঃ

৬ই ডিসেম্বর /৯০ স্বৈরাচার এরশাদ সরকারকে হটিয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাব উদ্দিন আহম্মদ দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁর নিকট সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটি ছিল একটা অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করা। ২৭শে ফেব্রুয়ারী/৯১ এর একটি সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পূর্ণ করে তিনি তার চ্যালেঞ্জটির উত্তর দিলেন। নির্বাচনে বিএনটি ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৪০টি আসন লাভ করে এবং একক বৃহৎ দল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন। যদি সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠন করতে হয় তাহলে তার জন্য প্রয়োজন ১৬৬টি আসনের। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মহিলা আসন সহ ৩৩০ টি আসনের মধ্যে বিএনপি জামায়াতের সহযোগিতায় সংরক্ষিত ৩০টি আসনের মধ্যে ২৮টি আসন সহ মোট ১৬৮টি আসন পেয়ে তথ্যগতভাবে সরকার গঠন করতে পেরেছিল। নির্বাচনের কিছু দিন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাব উদ্দিন আহম্মদ রেডিও টিভিতে এক ভাষনে বলেন, নির্বাচিত প্রার্থীদের দলগত অবস্থান থেকে কোন সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না। তাই

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানের ৫৮ ধারা অনুযায়ী মন্ত্রী পরিষদ গঠন ও এ মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না। যদি বিএনপি ১৪০টি আসনে জয়ী হয়। এদিকে ১লা মার্চ /৯১তে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপির নির্বাচিত দল সাহাব উদ্দিনের সাথে দেখা করলে তিনি তাদেরকে এক সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করা যেতে পারে বলে অভিমত প্রদান করেন। এদিকে ১৫ই মার্চ/৯১ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তার উপদেষ্টা পরিষদ ভেঙ্গে দেন। ১৮ই মার্চ/৯১ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ৩ জোটের নেতৃবৃন্দকে বঙ্গভবনে বৈঠক ডাকেন। এ বৈঠকের আমন্ত্রন লিপিতে আওয়ামীলীগ ও বিএনপির ৩ জন করে এবং ৫ দলের ২ জনকে আমন্ত্রন জানানো হয়। এ বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা হস্তান্তর। কারণ বর্তমানে দেশে এমন একটা অবস্থা বিরাজ করছে যে, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এটাই ছিল ব্যাপার। যদি, ১৯শে নভেম্বর /৯০ সালে ৩ জোট ঘোষিত রূপ রেখায় সার্বভৌম জাতীয় সংসদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী সংসদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিধান নাই। কেবলমাত্র বর্তমান উপরাষ্ট্রপতির পদ শূণ্য হলেই সংসদের স্পীকার রাষ্ট্রপতিরূপে কার্যভার পেতে পারেন। সংবিধানের ৫৬ ধারার ২ অনুচ্ছেদে বলা আছে যে কোন সময় রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি পুনরায় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পীকার রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনা করবেন। কিন্তু সংবিধানের বর্তমান অবস্থায় উপরাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলেই পদত্যাগ করতে পারবেন না।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ১৯শে/মার্চ ৯১ বিএনপির প্রধান এবং জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারীদের নেতা বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। বেগম জিয়াকে রাষ্ট্রপতি তার কার্য পরিচালনায় পরামর্শ দানের জন্য সংবিধানের ৫৮ (১) অনুচ্ছেদ বলে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করলেন। ২০শে মার্চ /৯১ মন্ত্রী পরিষদ সদস্যরা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে শপথ বাক্য পাঠ করেছেন। সেই সাথে বেগম খালেদা জিয়া হলেন বাংলাদেশের মহিলা এবং মুসলিম দেশ সমুহের দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

Dhaka University Institutional Repository

*** সংসদ অধিবেশন ঃ**

৫ই এপ্রিল /৯১ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ৫ম সংসদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন। এর আগে ১৭-৩-৯১ ইং তারিখে সংসদের সদস্য বৃন্দ নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফের নিকট শপথ বাক্য পাঠ করেন। সংসদ অধিবেশন শুরু হয় ৫ই এপ্রিল শুক্রবার ৯টা ৭মিঃ। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াৎ এর মধ্য দিয়ে সংসদের যাত্রা শুরু হয়। সংসদের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পীকার সামছুল হুদা চৌধুরী, তারপর স্পীকার নির্বাচনের পালা শুরু হলো। বিএনপি সংসদীয় দলের সদস্য আব্দুর রহমান বিশ্বাস নিযুক্ত হলেন, পরবর্তীতে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন। আব্দুর রহমান বিশ্বাস স্পীকার হিসেবে তার কার্যক্রম শুরু করলেন। তারপর সংবিধান অনুযায়ী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি দেশের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সংসদ সদস্যদের সম্মুখে বক্তব্য রাখেন। ৫ই এপ্রিল/ ৯১ জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে জল্পনাকল্পনা শুরু হয়ে গেল যে দেশে সরকার পদ্ধতি কি হবে। সরকার পদ্ধতির প্রশ্নে ১৪ই এপ্রিল/৯১ সংসদ অধিবেশনে বিরোধীদল আওয়ামীলীগ দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব উথাপন করে। সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে বিএনপি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২টি প্রস্তাব উথাপন করেন। ৪ঠা জুলাই/৯১তে ওয়াকার্স পার্টি ৪ বিলের নোটিশ প্রদান করে। এ অবস্থায় আইন মন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকারী ও বেসরকারী দলের মোট ১৫ জন সদস্যের সমবায়ে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। এবং বাছাই কমিটি ২৮শে জুলাই /৯১ সর্বসম্মতিক্রমে একটি রিপোর্ট পেশ করে। এ রিপোর্টের ভিত্তিতে ৬ই আগষ্ট/৯১ মধ্য রাতে ৩০৭-০ ভোটে সংবিধান সংশোধনীর দ্বাদশ বিলটি পাশ হয়। এর ফলে ষোল বছরের রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির শাসনের পরিবর্তে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার যাত্রা করে। বিলটি জনগণের সমর্থনের জন্য গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৫ই সেপ্টেম্বর /৯১ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে জনগণ এ বিলের পক্ষে রায় দেয়। গণভোটের ফলাফলের মধ্য দিয়ে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। তারপর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হলো। রাষ্ট্রপতি পদটি নামে মাত্র সেহেতু সংসদ

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যদের দ্বারা এ পদটি নির্বাচিত হবে। ৯ই অক্টোবর /৯১ আব্দুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস ৯ই অক্টোবর শপথ গ্রহণ করেন অস্থায়ী বিচারপতি জনাব এম এইচ রহমান রাষ্ট্রপতিকে শপথ বাক্য পাঠ করান। সংসদে পাশকৃত একাদশ সংশোধনী অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রপতি শপথ গ্রহণের সাথে সাথেই রাষ্ট্রপতি সাহাব উদ্দিন আহম্মদ ঘটনাবহুল ৩০৭ দিনের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের পরে প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যান।

Dhaka University Institutional Repository

পাদ টীকা

১. *Talukder Maniruzzaman, Military Withdrawl From Policies : A Comparative Study, USA 1987; S.E. Finer, The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics, London 1962; Marris Jonowits, The Military in the Political Development of New Nations, Chicago 1964; John Johnson (ed), The Role of the Military in Undeveloped Countries, Princetion 1962; Alan R. Ball, Modern Politics and Government, London 1978.*

২। সাপ্তাহিক ছুটি ১৪ই ডিসেম্বর ৯০ সংখ্যা পৃঃ-১৭-২৩।

৩। সাপ্তাহিক বিক্রম ১৭-২৩ ডিসেম্বর ৯০ সংখ্যা।

৪। সাপ্তাহিক বিচিত্রা ১৪-২০ ডিসেম্বর ৯০ সংখ্যা।

৫। দৈনিক বাংলা ৮ ও ৯ই ডিসেম্বর ১৯৯০।

৬। দৈনিক ইত্তেফাক ৯ ও ১৭ই জানুয়ারী ১৯৯১ ইং।

৭। সাপ্তাহিক বিক্রম ১৮-২৪শে ফেব্রুয়ারী ৯১।

৮। সাপ্তাহিক চিত্রবাংলা ১২-১৭ই ফেব্রুয়ারী ৯১।

৯। বাংলাদেশের সরকার ও রাজনীতি এফ. জামান।

১০। সাপ্তাহিক বিক্রম ৪-১০ই মার্চ ৯১।

১১। দৈনিক খবর ১লা মার্চ ৯১।

১২। দৈনিক খবর ২রা মার্চ ৯১।

১৩। দৈনিক বাংলা ৪ঠা মার্চ ৯১।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বেগম খালেদা জিয়ার সরকার ও সংসদীয় গণতন্ত্র ঃ

খালেদা জিয়ার সময়কালের সংসদীয় গণতন্ত্রের বিশ্লেষণের পূর্বে সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারণার সাথে সমরেখ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা যাক। Lucian W Pye রাজনৈতিক উন্নয়নকে দশটি ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে সংজ্ঞায়ন করেছেন-

1. the polictical prerequisite of economic development;
2. the politics typical of industrial society;
3. political modernization;
4. the operation of a nation-state;
5. administrative and legal development;
6. mass mobilization and participation;
7. building of democracy;
8. stability and orderly change;
9. mobilization and power;
10. one aspect of a multi-dimensional process of social change.[১]

S.P. Huntington-এর মতে রাজনৈতিক উন্নয়ন রাজনৈতিক আধুনিক করণের সাথে যুক্ত তার মতে, Polictical modernization involves the extension of political consciousness to new social groups and the mobilization of these groups into politics. Political development involves the creation of political institutions sufficiently adaptable, complex, autonomous, and coherent to absorb and order the participation of these new groups and to promote social and economic change in the society.[২]

---

1. L.W Pye, Aspects of Political Developmentp-33-45
2. S.P. Huntington, Political Order in Changing Society PP-5

Dhaka University Institutional Repository

Fredriggs রাজনৈতিক উন্নয়নকে একটি চমৎকার ডায়াগ্রামের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন-

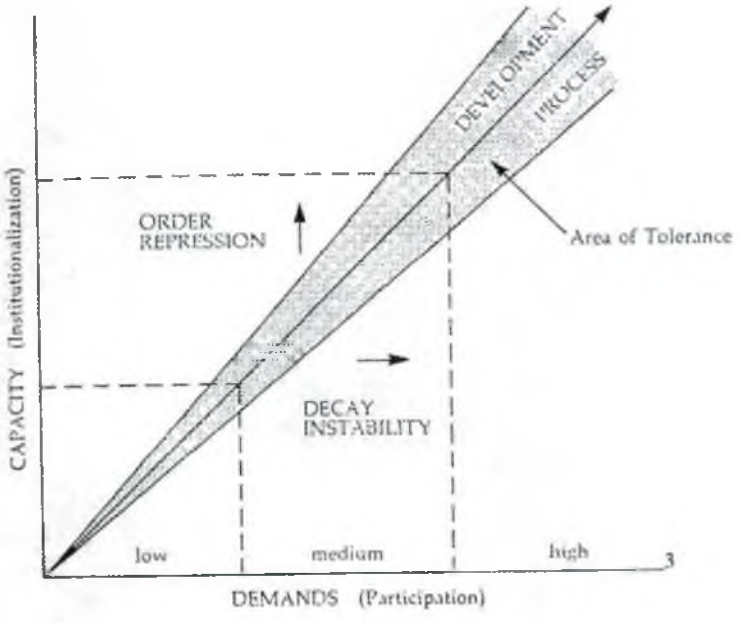

Fredriggs তার ডায়াগ্রামে দেখিয়েছেন যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়া হচেছ একটি দান্বিক প্রক্রিয়া এবং চাহিদা (Demand)-র ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা বর্ধিত সামর্থ্যের (capacity) সূচনা করে। এ প্রক্রিয়ার মূলে রয়েছে গতিশীল একটি সাম্যবস্থা যেখানে ভারসাম্যহীনতা (Demand এবং capacity-র মধ্যে) রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা করে অবশ্য কখনও কখনও এ ভারসাম্যহীনতা ক্রমবর্ধমান ভাবে ঘটার ফলে সংকটের সৃষ্টি হতে পারে। অতিপ্রাতিষ্ঠানিকিকরণ (over institutionalization) থেকে সৃষ্টি হয় দমন প্রক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বহির্ভূত অংশগ্রহণ যা থেকে পরবর্তী পর্যায়ে সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং রাজনৈতিক অবক্ষয় (political decay)।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পরেই বুদ্ধিজীবি মহলে যে বিতর্কটি শুরু হয় তাহলো স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল অনুপ্রেরণা কোন লক্ষ্যে পরিচালিত ছিল তা নিয়ে। এই ইস্যুটি নিয়ে এখন পর্যন্ত কোন গ্রহণযোগ্য এবং সর্বজনসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারার দরুন রাজনীতিতে

Dhaka University Institutional Repository

আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয়: রাজনীতির পথপরিক্রমায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনাসমূহ থেকে শুরু করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা এবং যৌক্তিকতা নিরূপনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবিগণ স্বাধীনতা যুদ্ধের লক্ষ্য নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কের দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেন। যেমন- স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা, ৭ই নভেম্বর, ১৫ই আগষ্ট এবং আরো সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর তাৎপর্য নিরূপনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবি মহলে তীব্র মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ একপক্ষের কাছে ৭ই নভেম্বর সিপাহী-জনতার মহামিলনে পরিচালিত জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। অন্যপক্ষের কাছে তা জাতীকে দ্বিধাদ্বন্ধে বিভক্ত করার জন্য পরিচালিত এক গভীর ষড়যন্ত্রের প্রতিফলন যার মূল উপাদান ছিল সেনাবাহিনীকে সুকৌশলে ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র থেকে জাতীকে দূরে নিক্ষেপ করার প্রয়াস। সৌভাগ্যক্রমে অদ্যাবধি জাতীয় বুদ্ধিজীবি মহলে এরশাদ বিরোধী গণঅভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে কোন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্যনীয় নয়। এরশাদ সরকারের পতন গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে জাতীয় রাজনীতিতে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তনের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে- এব্যাপারে সমসাময়িক বুদ্ধিজীবিগণ মোটামুটিভাবে (grossly) একমত। এ গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পর্যায়ে সকল রাজনৈতিক দলের অভূতপূর্ব মতানৈক্যে গঠিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহকে বিপুলভাবে আলোরিত করে। এই নির্বাচন দেশে এবং বহির্বিশ্বে ব্যাপক গ্রহণ যোগ্যতা লাভ করে। সুতারং নির্বাচনের মাধ্যমে খালেদা জিয়া সরকারের ক্ষমতায় আরোহন সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি লক্ষ্যনীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে বিবেচিত হয়। খালেদা জিয়া হয়ে উঠেন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আর্দশে উজ্জীবিত এক আপোষহীন নেত্রীর প্রতিভূ। গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে এ সরকারের কাছ থেকে আভ্যান্তরীন এবং বহির্বিশ্বীয় আকাংখার মাত্রা পরবর্তীতে ক্রমবর্ধমান আকাংখার বিস্ফোরণের (Revolution of rising expection) জন্ম দেয়।

---

2 *Fredriggs, Comparative Polal Studies-1, P-205*

Dhaka University Institutional Repository

৩.১ খালেদা জিয়ার সরকারের সংকট সমূহ ঃ

মাত্রাগত তারতম্যে ভিন্নতা শর্তেও সকল রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিছু সংকটের অভিজ্ঞতা ঘটে। রাজনৈতিক সংকট নিয়ে যে সমস্ত তাত্ত্বিকগণ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তার মধ্যে L.W. Pye অন্যতম। তিনি এ সংকটকে অভিহিত করেছেন উন্নয়নের সংকট হিসেবে। তিনি এক্ষেত্রে পাঁচটি সংকটের কথা উল্লেখ করেছেন-

1. The Identify crisis.
2. The Legitimacy crisis.
3. The participation crisis.
4. The distribution crisis.
5. Integration.[১]

স্বৈরাচার মুক্ত পরিবেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত খালেদা জিয়ার সরকার ক্ষমতায় আরোহনের পর শাসন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহবুদ্দিন আহমেদের অধীনে মন্ত্রী সভা গঠনের পর প্রথমেই সংকট দেখা দেয় সরকার পদ্ধতি প্রশ্নে। খালেদা জিয়া সময়ের দাবি ও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা কায়েম করে গণতন্ত্রের নব যাত্রা শুরু করে ছিলেন। (যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে)। এরপর যে সমস্যার সম্মুখীন হন তা হল গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ইস্যু নিয়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানে অবস্থানকারী এবং পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণকারী গোলাম আযম স্বাধীনতার ৮ বছর পর ১৯৭৮ সালে মায়ের অসুস্থতার জন্য বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করে অবৈধভাবে অবস্থান করতে থাকেন। দীর্ঘ দিন গোলাম আযম দেশে অবস্থান করলেও এ নিয়ে কোন মহল থেকে কোন প্রশ্ন উঠেনি কিংবা অবৈধ অবস্থানের জন্য বা যুদ্ধাপরাধী হিসেবে কোন মহল থেকে কোন মামলা দায়ের করা হয় নি। কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া সরকার গঠনের

Dhaka University Institutional Repository

পর গোলাম আযমকে জামায়াতে ইসলামীর আমীর (প্রধান) নিযুক্ত করায় সমস্যা সৃষ্টি হয়। গঠিত হয় ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এবং এই কমিটি কর্তৃক ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ গণআদালত নামক তথাকথিত আদালতে বিচারের মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। সরকার গোলাম আযমকে গ্রেফতার করে আইনের হাতে সোপার্দ করে। সরকার আইন এবং বিচারের মাধ্যমে গোলাম আযম প্রসংগটি মোকাবেলা করে রাজনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দেয়। সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র ১ বৎসরের মধ্যেই বিরোধী দল সরকারের উপর 'অনাস্থা প্রস্তাব' আনেন। একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এক বছর সময় কোন সময়ই নয়, তা সত্ত্বেও বিরোধী দল অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে সরকারকে বিব্রত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকারী দলের সংখ্যা গরিষ্ঠতা বজায় থাকায় বিরোধী দলের সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ফলে বিরোধী দল সরকারকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার চেষ্টা করে। ১৯৯৩ এর শেষের দিকে বিরোধী দল ভবিষ্যতের সকল জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের দাবি তুলে। মিরপুর এবং মাগুরা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেই দাবিকে আরও জোরাদার করা হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল আকর্ষণ 'সংসদ', সংসদকে কেন্দ্র করেই সফল আলোচনা ও বিতর্কের অবসান হওয়া উচিত। কিন্তু বিরোধী দল খালেদা জিয়ার শাসনামলের অধিকাংশ সময়ই সংসদ থেকে বাইরে থাকে। বিরোধী দল সংসদ পরিত্যাগ করে রাজপথে দাবি আদায়ের পথ বেছে নেয়। সংসদ থেকে পদত্যাগ, ধর্মঘট ও অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে বিরোধীদল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে অনড় থাকে। এ সময়ে দেশে চরম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে। চরম রাজনৈতিক অচলবাস্থায় মুখে ৫ম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির পর সরকারী দল "ভোটার বিহীন' বিতর্কিত ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। বিরোধী দলের দাবি অনুযায়ী 'অবৈধ' স্বল্প স্থায়ী ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে বহু প্রতিক্ষিত "তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল' পাস করা হয়। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার পর থেকে বিরোধী দল তাদের আন্দোলন আরও জঙ্গী করে অসহযোগ আন্দোলনে রূপ দেন। অসহযোগ আন্দোলনের মুখেই খালেদা জিয়ার সরকার ৩০ মার্চ ১৯৯৬

400417

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

পদত্যাগ করেন এবং সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসাবে বিচারপতি হাবিবুর রহমান প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিরোধী দলের দীর্ঘ দুই বছরের আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। খালেদা জিয়ার সরকারের এ সংকট সমূহ নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

ক) জামায়াতে ইসলামী প্রধান গোলাম আযম প্রসঙ্গঃ

খালেদা জিয়ার গণতান্ত্রিক সরকার যখন স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের দীর্ঘ দিনের বিশৃঙ্খল অবস্থা দূর করে একটি গতিশীল প্রশাসন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন তখনই জামায়াত নেতা গোলাম আযম প্রসংগটি সরকারের কাছে একটি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে সমর্থন দিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার প্রয়াস পান। তাই দীর্ঘ দিন দলীয় প্রধান পদটি অস্থায়ী প্রধান ভারপ্রাপ্ত আমীর দিয়ে চালাবার পর ১৯৯১ সালের ২৯ ডিসেম্বর স্বাধীনতা বিরোধী ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত অনাগরিক অধ্যাপক গোলাম আযমকে জামায়াতে ইসলামী তাদের আমীর (প্রধান) হিসেবে নির্বাচন করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিরোধী অধ্যাপক গোলাম আযমকে বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান নির্বাচন করায় বিভিন্ন মহল থেকে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৯২) তারিখে জাতীয় সংসদের নীতকালীন অধিবেশন শুরু হলে 'স্বাধীনতা বিরোধী পাকিস্তানী নাগরিক অধ্যাপক গোলাম আযমকে জামায়াতে ইসলামী দলের আমীর (দলীয় প্রধান) নির্বাচিত করা সংবিধানের ৩৮ ধারা মতে আইন সম্মত কিনা'[২] সে সম্পর্কে সংসদে প্রশ্ন উত্থাপন করেন আওয়ামীলীগের সংসদ সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম। সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "জন শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তি সঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।[৩] এ বিষয়ে জাতীয় সংসদে ব্যাপক বিতর্ক অনুষ্ঠিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। ৮ জানুয়ারী (১৯৯২) বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ৪টি মূলতবী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। আওয়ামী লীগের সাংসদ জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক, জনাব আজিজুর রহমান, জনাব আব্দুল আওয়াল মিয়া এবং ওয়ার্কাস পার্টির সাংসদ জনাব রাশেদ খাঁন মেননের উত্থাপিত ৪টি প্রস্তাবের মধ্যে স্পীকার আওয়ামীলীগের সাংসদ মোহাম্মদ শামসুল হকের মূলতবী প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং ঐ প্রস্তাবের ভিত্তিতে সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার সুযোগ পেয়ে মোহাম্মদ শামসুল হক বলেন, "বিদেশী কোন নাগরিককে বাংলাদেশে অবস্থান কালে বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইন মেনে চলতে হয়। সুতরাং পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন না।[৪] ওয়ার্কাস পার্টির সংসদ সদস্য জনাব রাশেদ খান মেনন বলেন, "বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী একজন নাগরিক অধিকার রহিত ব্যক্তিকে একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান নির্বাচিত করে একটি মুক্তিযুদ্ধের ফসল আমাদের সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।" জনাব রাশেদ খান মেনন আরও বলেন, "অধ্যাপক গোলাম আযম কেবল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই স্বাধীনতা বিরোধী ছিলেন না, স্বাধীনতার পরও ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৭৮ সালে গোলাম আযম পাকিস্তানের পাসপোর্টে বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন- জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের দাবি নিয়ে তিনি বাংলাদেশে আসেনি।[৫] জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য রুহুল কুদ্দুস গোলাম আযমের পক্ষ অবলম্বন করে বলেন, "গোলাম আযম জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। তার নাগরিক অধিকার অন্যায়ভাবে হরণ করা হয়েছে"।[৬] জাতীয় সংসদে ৮ জানুয়ারীর অসমাপ্ত আলোচনা ১২ জানুয়ারী (১৯৯১) অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামী সংসদ সদস্য জনাব এনামূল হক বলেন, "গোলাম আযম জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। যে আদেশ বলে তার নাগরিকত্ব হরণ করা হয়েছে, তা অবৈধ। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবেই তাকে আমরা দলের আমীর (প্রধান) নির্বাচিত করেছি।[৭] এর জবাবে আওয়ামী লীগের সংসদ এবং বিরোধী দলীয় উপনেতা জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, এটা জামায়াতে ইসলামী এবং আমাদের মধ্যে বিতর্কের ব্যাপার নয়। সমস্ত দায়িত্ব (বি,এন,পি) সরকারের। সরকারকেই জবাব দিতে হবে গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক কিনা। তার কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য কিংবা কর্মকর্তা নির্বাচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে কিনা।[৭] এ দিন এ প্রসঙ্গে বিরোধী দলের অনেক সংসদ সদস্যই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তবে সমাপ্তি বক্তব্য এবং সরকারী ব্যাখ্যা প্রদান করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুল মতিন চৌধুরী। তিনি বলেন, সরকার গোলাম আযমকে (বাংলাদেশের) নাগরিকত্ব দেয়নি। একজন বিদেশী হয়েও তাঁর (জামায়াত ইসলামীর) আমীর (প্রধান) নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি সরকারের গোচরীভূত হয়েছে। এর আইনগত বিষয়াদি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে"। অতঃপর গোলাম আযমের বাংলাদেশে অবস্থানের নেপথ্য কাহিনী উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদকে জানান, "(বাংলাদেশের) স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গোলাম আযম (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী শাখার) আমীর ছিলেন। ২২শে নভেম্বর (১৯৭১) তিনি পাকিস্তানে চলে যান। ১৯৭২ সালে তাকে বিদেশী নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৭৬ সালে লন্ডন থেকে তিনি (বাংলাদেশের) নাগরিকত্বের আবেদন করেন। ১৯৭৮ সালেও তিনি আবেদন করেন। কিন্তু দু'বারই তাঁর আবেদন নাকচ করে দেয়া হয়। ১১ই জুলাই (১৯৭৮) তারিখে (বাংলাদেশ) সরকারের কাছ থেকে তিনি ৩ মাসের ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। আসার সময় তিনি তাঁর মায়ের অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ছিলেন। ৩০শে এপ্রিল ১৯৮১ তারিখে গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভের জন্য অনুগত্য প্রকাশ করে "হলফ নামা" দাখিল করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক নন।[৯] গোলাম আযম প্রসংগটি খালেদা জিয়া সরকারের উত্তারিধকার সূত্রে প্রাপ্ত একটি সমস্যা। গোলাম আযম ১৯৭৮ সাল থেকে দেশে অবস্থান করছেন। এর মধ্যে বিএনপি'র দু'টি সরকার অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের আমল এবং লেঃ জেঃ (অবঃ) হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনকাল অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে এ ব্যাপরটির জন্য

Dhaka University Institutional Repository

সরকার দায়ী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাতীয় সংসদে প্রদত্ত বক্তব্যে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। সরকার গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করেননি। "উল্লেখ্য- ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আদেশের (অস্থায়ী বিধান) ৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গোলাম আযম সহ মোট ৩৯ জনকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভের অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়। এর কারণ হিসেবে গেজেট নোটিফিকেশনে বলা হয়, এসব ব্যক্তি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকে বিদেশে অবস্থান করছিলেন। এদের আচরণ ও বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না এবং এরা পাকিস্তানে অবস্থান করেছেন"[১০] উল্লেখ্য যে ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার সময় থেকে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়। '৭২ এর পি ও ১৪৯ [প্রজ্ঞাপন ১৯৭৩ সালের ১৮ই এপ্রিল][১১] এর মাধ্যমে। ১৯৭৬ সালের ১৮ জানুয়ারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের এক প্রেস নোটে নাগরিকত্ব বঞ্চিতদের নাগরিকত্ব ফেরৎ দেয়া হলেও গোলাম আযমের আবেদন সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যান হয়। ১৯৭৩ সালের মে মাসেও একবার নাগরিকত্ব পুনর্বহালের আবেদন করেছিলেন। ১৯৭৯ সালে নাগরিকত্ব ফেরৎ পাওয়ার জন্য পুনরায় আবেদন জানালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গোলাম আযমকে এ আবেদনও বাতিল করেছেন। এভাবে দেখা যায় গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া সত্ত্বেও তিনি দেশত্যাগ করেননি। যদিও সরকার ১৯৮৮ সালের ২০ এপ্রিলের মধ্যে বাংলাদেশে অবৈধভাবে বসবাসকারী সকল বিদেশী নাগরিকদের দেশত্যাগের আদেশ জারি করেছিলেন। কিন্তু গোলাম আযম সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে দেশে অবস্থান করতে থাকেন। কিন্তু এরশাদ সরকার ১৯৯০ সালের মধ্যেও গোলাম আযমের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। যার ফলে সরকারের কাছে এটি একটি উত্তারাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রাজনৈতিক সমস্যা।

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠন ঃ

১৯ জানুয়ারী (১৯৯২) শহীদ জননী জাহানারা ইমামকে আহবায়ক করে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট "একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি" গঠন করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এ কমিটি ২৫ মার্চের (১৯৯২) মধ্যে গোলাম আযমকে দেশ থেকে বহিস্কারের দাবি জানান। অন্যথায় তার বিচার অনুষ্ঠানের জন্য গণআদালত গঠনের কথা বলা হয়। নির্মূল কমিটির প্রথম ঘোষণায় বলা হয়, জামায়াতে ইসলামী সম্প্রতি পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযমকে তাঁদের আমীর বানিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর সরাসরি আক্রমন চালিয়েছে। এ গোলাম আযম একাত্তরেও জামায়াতে ইসলামীর আমীর ছিল। ------- কুখ্যাত পাকিস্তানী জেনারেল য়াও ফরমান আলীর সঙ্গে বসে এ গোলাম আযম ঘাতক আল-বদর বাহিনী তৈরী এবং বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা প্রণয়ন করেছিল। --- মুক্তিযোদ্ধাদের তারা বলেছে দুস্কৃতকারী, 'জারজ সন্তান, আর নিজেদের বলেছে, পাকিস্তান প্রেমিক। এ পাকিস্তান প্রেমের কারণে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরও গোলাম আযম বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে পাকিস্তান ও মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি গঠনের মাধ্যমে। ১৯৭৮ সালে অসুস্থ মাকে দেখার অজুহাতে পাকিস্তানের একান্ত অনুগত নাগরিক গোলাম আযম বাংলাদেশে এসে একাত্তরের হিংস্র থাবা বিস্তার করেছে জামায়াত ইসলামীকে পুনর্গঠিত করার মাধ্যমে। একাত্তরের ঘাতকদের ঐক্যবদ্ধ করে ১৯৮১ সালের ২৮ মার্চ প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলনে তারা স্বদম্ভে ঘোষণা করেছে ১৯৭১ সালে আমরা যা করেছি ঠিকই করেছি। এবং একাত্তরে বাংলাদেশের কনসেপ্ট ঠিক ছিল। এ কথা বলে তারা অবিরাম হামলা চালিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের শক্তির উপর। গত ১২ বছরে তারা শত শত ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করেছে।[১২] ১১ ফেব্রুয়ারী (১৯৯২) গোলাম আযম এবং তার সহযোগীদের বিচারের লক্ষ্যে ৪২ সদস্য বিশিষ্ট "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ১৯৭১ এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। জাহানারা ইমামকে আহবায়িকা ও অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরীকে সদস্য সচিব ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রধানদের এ কমিটির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গণআদালত গঠন ও গোলাম আযমের বিচার ঃ

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠন করে এ কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয় সরকার যদি গোলাম আযমকে ২৬ মার্চ (১৯৯২) এর মধ্যে দেশ থেকে বহিষ্কার না করে তবে ২৬ মার্চ ঘাদানি (ঘাতক দালাল নির্মূল) কমিটির উদ্যোগে গণআদালত গঠন করে বিচার করা হবে। ৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৯২) আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা যুদ্ধাপরাধী হিসাবে গোলাম আযমের বিচার হবে বলে মন্তব্য করেন, "এর এক মাস পর ৭ মার্চ (১৯৯২) শেখ হাসিনা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলভূক্ত ১ শ জন সংসদ সদস্য গণআদালতে গোলাম আযমের বিচার প্রসংগে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ঘোষণার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন"[১৩] এবং ঘোষণা করেন ২৬ মার্চ (১৯৯২) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযমের বিচার অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু সরকার গোলাম আযমের প্রসংগটি আইনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ উপলক্ষ্যে প্রথমে ১৩ মার্চ (১৯৯২) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গণআদালতের উদ্যোক্তদের সাথে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ঐ দিন গণআদালতের উদ্যোগক্তাতাদের মধ্যে মাত্র ৪ জন উপস্থিত হওয়ায় আলোচনা ফলপ্রসু হয়নি। তবে ১৮ মার্চ (১৯৯২) অনুষ্ঠিত সরকার এবং ঘাতক দালাল জাতীয় নির্মূল কমিটির বৈঠকে গণআদালতে গোলাম আযমের বিচার সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, গণআদালতে গোলাম আযমের বিচারের আন্দোলন পরিহার করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সরকারের উপর ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।[১৪] কিন্তু নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দ ২৬ মার্চ কর্মসূচি সম্পর্কে অনমনীয় মনোভাব পোষণ করেন। কারণ এর পূর্বেই ১৭ মার্চ গণআদালতে বিচার অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে "মুক্তিযোদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে গোলাম আযমের উপর এক সমন জারির মাধ্যমে অভিযুক্ত (!) গোলাম আযমকে নির্ধারিত দিন গণআদালতে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়েছে।

২৬ মার্চ (১৯৯২) তথাকথিত "গণআদালতে" গোলাম আযমের বিচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে সরকারী কড়া নিরাপত্তায়

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা সত্ত্বেও ঐ দিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অস্থায়ী মঞ্চে গঠন করা হয় একটি অস্থায়ী 'আদালত বেঞ্চ'। উক্ত আদালত বেঞ্চের চেয়ারম্যান ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহবায়িকা জাহানারা ইমাম সহ ১২ জন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ বিচার কার্য সমাপ্ত করেন। "বাংলাদেশের গণমানুষ" বনাম "গোলাম আযম" শিরোনামে এ মামলায় গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ১২টি অভিযোগ উপস্থাপন করা হয় এবং ১৫ জন স্বাক্ষী গঠিত এ আদালতে স্বাক্ষ্য প্রদান করেন"[১৫]। মামলার অভিযোগে বলা হয়, "অধ্যাপক গোলাম আযম, পিতা মাওলানা গোলাম কবির, সাকিন- পাকিস্তান, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ, জনপদ ধ্বংস, নারীধর্ষণ প্রভৃতি অপরাধ মূলক কাজে মদদকারী এবং স্বয়ং শান্তি কমিটি, আলবদর, আলশামস বাহিনী গঠন করায় প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, জনপদ ধ্বংস নারী ধর্ষণের ন্যায় জঘণ্য অপরাধ সংগঠনের নির্দেশ প্রদান, প্ররোচিত করণ বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা প্রণয়ন করে নিজস্ব বাহিনী আলবদর, আলশামসকে দিয়ে তাদের হত্যা করানো এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান পূনরুদ্ধার কমিটি গঠন করে বিদেশী শত্রুর চর হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন"[১৬]। মামলার শিরোনাম অনুযায়ী গণমানুষের পক্ষে অভিযোগ উত্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও ডঃ আনিসুজ্জামান। "গণআদালতের গঠিত বেঞ্চ" উত্থাপিত অভিযোগের সাক্ষ্য প্রমাণ উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় অধ্যাপক গোলাম আযমকে দোষী সাব্যস্ত করেন। উক্ত অস্থায়ী আদালতের চেয়ারম্যান জাহানারা ইমাম গোলাম আযমের 'মৃত্যু দন্ড' ঘোষণা করে রায় প্রদান করেন। রায় ঘোষণা কালে জাহানারা ইমাম বলেন, "গণআদালত কোন দন্ডাদেশ কার্যকর করে না বিধায় গোলাম আযমকে দোষী সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি[১৭]। উক্ত বিচার কার্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, গণ মানুষের পক্ষে মামলা পরিচালনা করে এ্যাডভোকেট জেড আই খান পান্না, এ্যাডভোকেট শামসুদ্দিন বাবুল ও এ্যাডভোকেট উম্মে ফুলসুম

Dhaka University Institutional Repository

রেখা, আসামী পক্ষে ছিলেন, এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম।[১৮]

গোলাম আযম ও গণআদালত সম্পর্কে গৃহীত সরকারী পদক্ষেপঃ

ইতোপূর্বে এক ঘোষণায় সরকার গণআদালতে কোন ধরণের বিচার অনুষ্ঠানের পরিবর্তে সরকারের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। সরকার ২৩ মার্চ (১৯৯২) রাতে অধ্যাপক গোলাম আযমের প্রতি এক কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করে বলেছেন যে, "সংবিধান লংঘণের মাধ্যমে তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর নিযুক্ত হওয়ায় তাকে কেন বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করা হবেনা এবং তার বিরুদ্ধে কেন আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবেনা আজ মঙ্গলবার (২৪/৩/১৯৯৪) সকাল ১০টার মধ্যে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"[১৯] একই দিন সরকার সংবিধান ও আইনের শাসন অবজ্ঞা করে গণআদালত আয়োজন করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে গণআদালতের উদ্যোক্তাদের প্রতিও শোকজ নোটিশ জারি করেন। ২৪ মার্চ (১৯৯২) সরকার গণআদালত উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে প্রেস নোট জারি করেন। সরকারী প্রেস নোটে বলা হয়, "যেহেতু সরকার কর্তৃক গৃহীত আইনগত ব্যবস্থার ফলে গণআদালতে প্রতিষ্ঠার মূল কারণ অপসারিত হয়েছে সেহেতু সরকার আশা করেন যে তথাকথিত গণআদালতের উদ্যোক্তাগণ এধরণের সংবিধান পরিপন্থী কার্যকলাপ হতে বিরত থাকবেন,"[২০] একই দিন গোলাম আযম কর্তৃক কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব সরকারের কাছে গ্রহণ যোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় সরকার ২৪ মার্চ (১৯৯২) মধ্যরাতে জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম কে ফরেনার্স এ্যাক্ট এর আওতায় গ্রেফতার করেন। সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদির ফলে ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কার্যক্রম অব্যহত থাকায় সরকার ২৫ মার্চ (১৯৯২) নির্মূল কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের আশে পাশে সভা সামবেশ নিষিদ্ধ গোষণা করেন। তা সত্ত্বেও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ২৬ মার্চ আইন বর্হিভূত ভাবে 'গণআদালত গঠন করে সরকারের প্রচলিত আইন ও

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে বিচার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এর প্রেক্ষিতে সরকার ২৮ মার্চ (১৯৯২) 'গণআদালত' উদ্যোক্তাদের মধ্যে ২৪ জনের বিরুদ্ধে[২১] ঢাকা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব আজিজুল হক ভূইয়ার কোর্টে মামলা দায়ের করেন। ফলে উক্ত কোর্ট থেকে অভিযুক্ত ২৪ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়। অভিযুক্ত ২৪ জনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দন্ড বিধির ১২১(এ), ১২১(বি), ১৪৮, ১২৪ (এ), ৩০৭, ৫০৫ (এ) ও ৫০৬ (বি) ধারার আওতায় অভিযোগ কগনিজেন্স নেয়া হয়। ২৯ মার্চ অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরী ও বিচারপতি এম,এ, করিমের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে জামিনের আবেদন পেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। ডিভিশন বেঞ্চ প্রথমে জামিনের আবেদন গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং নিম্ন আদালতে অর্থাৎ যেখানে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে সেখানে আত্মসমর্পন করে জামিনের প্রার্থনা জানাতে উপদেশ দেন। পরে আবেদনকারীদের পক্ষে ডঃ কামাল হোসেন এবং এটর্নী জেনারেলের বক্তব্য শুনে হাইকোর্ট বেঞ্চ আবেদনটির উপর শুনানি গ্রহণে সম্মত হন এবং শুনানি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জামিনের আবেদনকারী ২৪ জনকে গ্রেফতার না করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে আদেশ জারি করেন। অতপর ৩১ মার্চ (১৯৯২) 'শুনানি শেষে হাইকোর্ট বেঞ্চে অভিযুক্তদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন। রায়ে ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন আদালতকে অবিলম্বে এ মর্মে একটি আদেশ জারি করতে নির্দেশ দেয়া হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ঐ আদালতে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পনের পর থেকে মামলাটির নিষ্পত্তি পর্যন্ত জামিন মঞ্জুরীর স্বীকৃতি থাকবে।[২২]

'গণআদালতে' ও এর কার্যক্রম বিশ্লেষণ ঃ

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ষড়যন্ত্রকারী নিরীহ নাগরিকদের হত্যাকারী লুণ্ঠনকারী, নারী ধর্ষণকারী এবং সর্বোপরি পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী ও হানাদারদের সহযোগীদের বিচার এবং শাস্তি হওয়া উচিৎ একথা যে কোন দেশ প্রেমিক নাগরিকের স্বীকার্য। আধুনিক সভ্য এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে কোন ধরণের বিচার এবং বিচারের রায় কার্যকর করার

Dhaka University Institutional Repository

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষই হচ্ছে সরকার। গণতান্ত্রিক পরিবেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার কার্যকরী থাকা সত্ত্বেও গোলাম আযম প্রসঙ্গে এ ধরণের গণআদালত গঠন এবং এর মাধ্যমে বিচার কার্য পরিচালনা করা আইন এবং সংবিধান সম্মত কিনা এ প্রশ্ন আসা খুবই স্বাভাবিক। তাই উল্লেখিত কার্যাদি বিশ্লেষণ নিম্নলিখিত প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

প্রথমত ঃ গণআদালত কি?
দ্বিতীয়তঃ গণআদালত কি আইন ও সংবিধান সম্মত?
তৃতীয়তঃ গোলাম আযমের বিচার প্রচলিত আইনে কি সম্ভব ছিলনা?
চতুর্থতঃ কি উদ্দেশ্যে এ ধরণের গণআদালত গঠন করা হয়েছে?
পঞ্চমতঃ গোলাম আযম প্রসঙ্গে সরকারের ভূমিকা কি সঠিক হয়েছিল?

প্রথম প্রশ্ন গণআদালত কি? গণআদালত বলতে জনগণের আদালত বা বিচার ব্যবস্থাকেই বুঝায়। ইংরেজীতে যাকে Mass cout বা Mass Tribunal বলে। সাধারণত দেশে যখন কোন স্বৈরাচারী সরকার বিরাজ করে আইন আদালত এবং বিচার ব্যবস্থা যখন একজন বা গুটি কয়েক লোকের ইচ্ছাধীনে চলে বা আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে কিংবা জনগণ আইনের শাসন থেকে বঞ্চিত হন কিংবা আইনের আশ্রয় লাভের ক্ষেত্রে জীবন বা সম্পত্তির ধ্বংসের সম্মুখীন হবে কিংবা মতামত বা প্রতিবাদ জানানোর উপযুক্ত পন্থা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত থাকে তখন নিরাপদ কোন স্থানে জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছা বা প্রয়াসের ব্যপ্তি ঘটানোর জন্য গণআদালত বা Mass Tribunal গঠন করা যায়। অর্থাৎ প্রচলিত বিচার এবং আইন যখন অনুপস্থিত থাকে এবং ন্যায় বিচার পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা থাকে না তখনই গণআদালতের প্রশ্ন আসে। উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় "হিটলার যখন তার নাৎসী বাহিনীর সাহায্যে জার্মানী সহ গোটা ইউরোপ জুড়ে চালিয়েছে নির্মম অত্যাচার, হত্যাযজ্ঞ, বেসামরিক লোকদের গুলি করে হত্যা, গ্যাস চেম্বারে লাখ লাখ মানুষ জ্যান্ত শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে, নারী ধর্ষণ লুটতরাজ ইত্যাদি জঘন্যতম অপরাধ সংঘটিত করেছে। হিটলারের বিরুদ্ধে কথা

Dhaka University Institutional Repository

বলার বা প্রতিকার চাওয়ার কিংবা বিচার পাওয়ার উপযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষ না থাকায়। যুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে 'নরেম বার্গ ট্রায়াল' অনুষ্ঠিত হয়। এ ট্রায়াল চার ধরণের অপরাধের বিচার করা হয়। মানবতা বিরোধী, শান্তি ভঙ্গ, যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা এবং জোরপূর্বক প্রভুত্ব আরোপ।"[২৩] ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্যদের আগ্রাসন ও জনগণ সরকারের যৌথ উদ্যোগে গণহত্যার জন্য বিখ্যাত দার্শনিক বট্রান্ড রাসেল লন্ডনে ১৯৬৬ সালের ১৩ নভেম্বর "ভিয়েতনাম ট্রাইবুনাল" আহবান করেন। মার্কিন প্রশাসনের ছত্রছায়ায় জনসন সরকারের কাছে আইনের মূল্য না থাকায় লন্ডনে এ ট্রাইবুনাল আহুত হয়েছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, গণআদালত তখনই আহুত হয় যখন কোন একটি দেশে প্রচলিত আইন ও বিচার ব্যবস্থা ন্যায় বিচারের অনুকূলে নয় তখনই "গণআদালত" ধরণের কোন আদালাতের মাধ্যমে বিচার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত ঃ "গণআদালত" কি আইন ও সংবিধান সম্মত? এ প্রসঙ্গে বলা যায় গণআদালত আইন ও সংবিধান সম্মত নয়ই বরং আইন ও সংবিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কেননা আইনের আশ্রয়লাভ সম্পর্কে সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িক ভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে"।[২৪] আবার সংবিধানের ৩৫ (৩) অনুচ্ছেদ আলোচনা করলে দেখা যাবে ২৬ মার্চ (১৯৯২) এর 'গণআদালত' সংবিধান সম্মত নয়ই বরং সংবিধানের পরিপন্থী। ৩৫ (৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারের অধিকারী হইবেন।[২৫] এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে "আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালের কথা। 'গণআদালত' আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছিলনা এবং এটি কোন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা

Dhaka University Institutional Repository

ভঙ্গকারী, মানবতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিতে বিচার করার জন্য আইনটি প্রণয়ন করা হয়।[৩০] কাজেই যেহেতু এ আইনটিও এখন পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে এর মাধ্যমে ও গোলাম আযম সহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা সম্ভব ছিল।

চতুর্থ ঃ কি উদ্দেশ্যে এ গণআদালত গঠন করা হয়েছিল? এ প্রসঙ্গে বলা যায়, গোলাম আযম দেশে এসেছে ১৯৭৮ সালে এবং 'গণআদালত গঠন করা হয়েছে ১৯৯২ সালে। এ দীর্ঘ ১৪ বছর গোলাম আযম দেশে অবস্থান কালে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে কিংবা 'স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচারের লক্ষ্যে কোন সংগঠন জন্ম লাভ করেনি কিংবা কোন নাগরিকের পক্ষ থেকে এমন কি কোন সরকারের পক্ষ থেকেও প্রচলিত আদালতে কোন মামলা দায়ের করা হয় নি। যদিও সংবিধান অনুযায়ী দেখা যায় যে, প্রচলিত আইনে গোলাম আযমদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়। তা সত্বেও এমন এক সময় 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ১৯৭১ এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠন করা হল যখন একটি গণতান্ত্রিক সরকার দীর্ঘ দিনের স্বৈরশাসনের অবসানের পর দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক মাসের মধ্যেই এ ধরনের সংবিধান ও আইনের পরিপন্থী কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারকে বিচলিত এবং সরকারের সুষ্ঠু কার্যক্রমের ওপর আঘাত হানাই এর মূল উদ্দেশ্য এ কথা সহজেই অনুমেয়। কারণ ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যাদের নিয়ে করা হয়েছে তাদের অধিকাংশই বিভিন্ন সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা বিবৃতি ও আচরণেও এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে এ 'গণআদালত' গঠন করা ছিল সরকারকে রাজনৈতিক ভাবে পর্যুদস্ত করার জন্য। সমন্বয় কমিটির আহবায়ক জাহানারা ইমাম বিরোধী দলের পক্ষ থেকে পূর্ণ আশ্বাস ও নিশ্চয়তা পেয়েই এমন একটি গণ আদালত গঠন করেছিল। শাহরিয়ার কবিরের লেখা বই থেকে জানা যায় যে, "২৫ মার্চ রাতের বেলা জাহানারা ইমাম শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ফাল গণআদালতে তোমার সমর্থন আর সহযোগিতা পাবো তো? পরিস্থিতি যদি খারাপের দিকে যায় সামাল দিতে পারবে? শেখ হাসিনা তাকে

Dhaka University Institutional Repository

ট্রাইবুনাল ছিল না। তৎকালীন বি,এন,পি সরকারের তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদা গণআদালত সম্পর্কে বলেন, "..... এটা একটা 'এস্টাবলিষ্ট গভর্নমেন্টের কাছাকাছি একটি বেআইনী কাজ। ..... সংবিধানের বাইরে কোন কোর্ট হতে পারে না। যারা এটা করেছে তারা বেআইনী কাজ করেছে।"[২৬] জাতীয় পার্টির তৎকালীন ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ বলেন, "গণআদালতের রায় যাহাই হোক না কেন জামায়াত নেতা গোলাম আযমের শাস্তি বিষয়টি আইনের নিজস্ব গতিতে নিস্পত্তি হবে বলে জনগণ প্রত্যাশা করেন।"[২৭]

তৃতীয়ত ঃ গোলাম আযমের বিচার প্রচলিত আইনে কি সম্ভব ছিল না? এর উত্তরে বলা যায় যে, গোলাম আযম বা এই ধরণের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা আমাদের সংবিধান এবং প্রচলিত আইনেই বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রেও যদি সংবিধান দেখি তাহলে দেখা যাবে যে, সংবিধানের ৪৭(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্বেও গণহত্যা জনিত অপরাধ, মানবতা বিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা দন্ডদান করিবার বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থী এই কারণে বাতিল বা বেআইনি বলিয়া গণ্যা হইবে কিংবা কখন ও বাতিল বা বেআইনি হইয়াছে, তাহা স্বত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীনে কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিবার অধিকার গণ ব্যক্তির থাকিবেনা।"[২৯] এখানেও দেখা যাচ্ছে যে, যুদ্ধাপরাধীর বা অনুরূপ অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে যদি অন্য কোন আইনের মাধ্যমে ক্ষমা বা হ্রাস করাও হয় কিংবা সংবিধানের পরিপন্থী হয় তবুও তা বাতিল বা বেআইনী হবে না। শুধু তাই নয়, ৪৭ (৩) দফা যদি কারও ওপর প্রযোজ্য হয় তবে তা'কে সুপ্রীম কোর্টের আশ্রয় লাভ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যদ্ধাপরাধীদের বিচারের সকল বাধা অপসারণ করা হয়েছে। এছাড়াও, আন্তর্জাতিক ক্রাইমস ট্রাইবুনাল এ্যাক্ট ১৯৭৩ এ আইনটি পাশ করা হয়। গণহত্যা শাস্তি

Dhaka University Institutional Repository

বলেছিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। গণআদালত কেউ আটকাতে পারবেনা। যদি কিছু হয় তার সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব আমার।"[৩১] এতএব, বিরোধী দলের নেত্রী যখন দায় দায়িত্ব নিজেই নিতে চান তাহালে এ ঘটনা বিরোধী দলের পক্ষ থেকেই করা হয়েছে এ কথা সহজেই অনুমেয়। এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে বিরোধী দলীয় নেত্রীর একটি 'চিরকুটের' বক্তব্য থেকে, ২৬ মার্চ সকাল 'গণআদালত' বসার পূর্বে শেখ হাসিনা ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহবায়িকা বেগম জাহানারা ইমামের কাছে একটা 'চিরকুট' পাঠান এতে লেখা ছিল, "আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনি আপনার সিদ্ধান্তে অটল থাকবেন। অনেকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে। কারো কথায় কান দিবেন না। খোদা আপনার সহায় হোন।"[৩২] কাজেই একথা বলা যায় যে, সদ্য গঠিত একটি গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে কোন রাজনৈতিক ইস্যু না থাকায় বিরোধী দলের পক্ষ থেকেই এ ইস্যু তৈরী করা হয়েছিল। সমন্বয় কমিটির আহবায়িকা জাহানারা ইমাম বিরোধী দল কর্তৃক ব্যবহৃত হয়ে ছিলেন মাত্র। বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ ভালভাবেই জানতেন যে গণআদালত আইন বা আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট কোন আদালত নয় এবং এর আইনগত কোন বৈধতা নেই তবুও বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ রায় কার্যকর করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। 'গণআদালত' কর্তৃক রায় ঘোষণার পরপরই বিরোধী দলীয় নেত্রী এক বিবৃতিতে বলেন, "একাত্তরের স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক দালালের বিচারের মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণে যে জাতীয় ঐক্যমত সৃষ্টি হয়েছে। তা আগামী দিনে দেশবাসীকে প্রেরণা জোগাবে। একই সঙ্গে তিনি গণআদালত পরিচালনা সঙ্গে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি সরকারের প্রতি আহবান জনান এ বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন"[৩৩] "দেশ প্রেমিক গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, কেন্দ্রীয় পাঁচ দল, জাসদ সিরাজ প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও এ রায় কার্যকর করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জনান।[৩৪] পরবর্তীতে এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি (ঘাদানি) বেশ কয়েকটি হরতাল, সমাবেশ, সংসদ অভিমুখে পদ যাত্রা ও স্পীকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ সহ বেশ কিছু কর্মসূচি পালন করে রাজনৈতিক ও সরকারের স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

করার চেষ্টা করেছিল। গণআদালতের উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে সমস্ত স্থানে 'গণআদালত' গঠন করা হয়েছে সে সমস্ত স্থানে স্বাভাবিকভাবে আইনের আশ্রয় লাভের কোন স্থানে সুযোগ ছিলনা। কিংবা প্রচলিত আইনকে অস্বীকার করে বা সরকারের সমান্তরাল কোন আদালত গঠনের উদাহরণ পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে ১৯৯২ সালে মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশে আইনের সকল ধারা যখন উন্মোচিত তখন এ ধরণের গণআদালত গঠন দেশের প্রচলিত আইন ও সংবিধানকে অবজ্ঞা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং বিরোধী দল 'গণআদালত' কে সমর্থন করে অনেক বিবৃতি এবং গণআদালতের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু সেই বিরোধী দলের নেত্রী বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এখন ক্ষমতাসীন সরকারী দল। 'গণআদালতের' প্রদত্ত রায় এখনও বলবৎ থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সরকারী দল সেই রায়ের প্রতি 'শ্রদ্ধাশীল' হতে পারেননি। গণআদালতের সামান্যতম বৈধতা যদি থাকতো তাহলে তাদের উচিৎ ছিল সেই কথিত রায় কার্যকর করা। কিন্তু তারা সেই রায় কার্যকর করা তো দূরের কথা, গোলাম আযম ও তার সহযোগীদের বিচারের ও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। কাজেই এ কথা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, গণআদালত তৎকালীন বিরোধী দল কর্তৃক সৃষ্ট একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি যার মাধ্যমে সরকারকে বিব্রত করা যায়, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করা যায় এবং কিভাবে সরকারকে পর্যুদস্ত করা যায় তার একটি ব্যবস্থা মাত্র।

পঞ্চমতঃ গোলাম আযম প্রসঙ্গে সরকারের ভূমিকা কি সঠিক ছিল? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় সরকার আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে গোলাম আযমকে আইনের হাতে তুলে দিয়েছে। প্রথমে সরকার গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করেনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ১২ জানুয়ারী (১৯৯২) জাতীয় সংসদে প্রদত্ত বিবৃতিতে গোলাম আযমকে অনাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করেন। [পরবর্তীতে গোলাম আযম আইনের মাধ্যমে নাগরিকত্বের স্বীকৃতি পান এবং বাংলাদেশে তার অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে নিরপেক্ষ বক্তব্য পেশ করেন। এরপর গোলাম আযমকে বিদেশী হিসেবে চিহ্নিত করে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করেন। কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব, সরকারের কাছে যথাযথ বিবেচিত না হওয়ায় ফরেনার্স এ্যাক্ট এর অধীনে গোলাম আযমকে গ্রেফতার করেন। পাশাপাশি সরকার বেআইনী কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য 'গণআদালত' উদ্যোক্তাদের ও প্রথমে কারণ দর্শাও নোটিশ এবং পরে গ্রেফতারী পরোওয়ানা জারি করেন। কারণ আইন শৃঙ্খলা স্থিতিশীল রাখা সরকারের কর্তব্য। ২৫ মার্চ (১৯৯২) সরকার গণআদালত গঠনের প্রাক্কালে যে প্রেস নোট জারি করে ছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল, "সরকার এটা পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিতে চায়, তথা কথিত গণআদালতের নামে নৈরাজ্য, বিশৃংখলা, সন্ত্রাস ও ঘৃণা সৃষ্টি করে যারা স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার অসৎ তৎপরতার সঙ্গে জড়িত হবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রেসনোটে আরও উল্লেখ করা হয়, দেশের আইন অনুযায়ী গোলাম আযমকে গ্রেফতার করে আটক রাখা হয়েছে। সর্বশেষে বলা হয়, তথাকথিত গণআদালতে কোন কঠোর হুশিয়ারী সত্ত্বেও ঘাতক দালার নিমূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে ২৬ মার্চ (১৯৯২) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে 'গণআদালত' এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ২৮ মার্চ গণআদালতের উদ্যোক্তাদের ২৪ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছেন। এ সম্পর্কে বিএনপি'র তৎকালীন তথ্য মন্ত্রী ব্যরিষ্টার নাজমুল হুদা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "তবে আমি মনে করি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভাবে আইনের এখতিয়ার। ----- একটা 'এস্টাবলিসড'। সরকারের পাশাপাশি, একটা 'এস্টাবলিসড' রাষ্ট্রীয় আদালত ব্যবস্থার পাশাপাশি, কোন রকম 'ন্যাচারাল' বা সমান্তরাল আদালত বসতে পারে না। এ প্রশ্নটা আমরা আদালতে নিয়ে গেছি। যারা এ সব কর্মকান্ডের জন্য দায়িত্ব বহন করছেন তাদের কাঠগড়ায় যেতে হবে। সেখানে যদি তারা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে পারেন অবশ্যই তারা ছাড়া পাবেন"।[৩৬] কাজেই এমতাবস্থায় সরকারের আইনের আশ্রয় নেয়া ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। এছাড়াও 'গণআদালত' ও গোলাম আযম প্রসংগে জাতীয় সংসদে সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১১ এপ্রিল (১৯৯২) থেকে

Dhaka University Institutional Repository

১৯ পর্যন্ত এপ্রিল সরকারী এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ব্যাপক আলোচনা করা হয় এবং বিরোধী দল ও সরকারী দল থেকে এ সম্পর্কে দু'টো প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। বিরোধী দলের প্রস্তাবে বলা হয়, "১৯৭১ এর যুদ্ধাপরাধী হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর আমীর (দল প্রধান) পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযম ও তার সহযোগীদের ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম এ্যাক্ট এর (১৯৭৩) অধীনে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিচার অনুষ্ঠান এবং জনমতের প্রতিফলনকারী গণআদালতের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার"[৩৭] সরকারী প্রস্তাবে বলা হয়, "৩০ লাখ শহীদের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীন দেশে নয় বছরের সংগ্রামের পর নির্বাচিত সংসদের দিকে তাকিয়ে আছে জাতি। এ অবস্থায় সংসদ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর, তাই অনাগরিক গোলাম আযমের বিষয়টির নিষ্পত্তি করা হবে সাংবিধানিক রীতির প্রচলিত আইনের নিয়মানুযায়ী।"[৩৮] বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে ১৯ এপ্রিল (১৯৯২) সরকারী প্রস্তাবটি পাস করা হয় এবং গোলাম আযমের বিষয়টি আইনের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়।

বিচার বিভাগীয় রায় ঃ

সরকার গোলাম আযমকে গ্রেফতারের পর গোলাম আযমের পক্ষ থেকে নাগরিকত্বের প্রশ্নে হাইকোর্টে রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টের ২ সদস্যের সংশ্লিষ্ট হাইকোর্ট বেঞ্চের মাননীয় বিচারপতি ইসমাইল উদ্দিন সরকার এবং অপর বিচারপতি বদরুল ইসলাম চৌধুরী ১১ আগষ্ট (১৯৯২) নাগরিকত্বের প্রশ্নে পরস্পর বিরোধী রায় প্রদান করেন। এ পরস্পর বিরোধী রায়ের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে ১ সদস্য বিশিষ্ট হাইকোর্ট বেঞ্চ গঠন করা হয়। ২২ এপ্রিল (১৯৯৩) তারিখে মাননীয় বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরী জামাত নেতা গোলাম আযমকে জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে রায় প্রদান করেন। বিচারপতি চৌধুরী রায় ঘোষণা করে বলেন, "নাগরিক আইনের ধারা ২ অনুযায়ী দালালীর অপরাধে কাউকে নাগরিকত্বের অযোগ্য বলা যাবে না। গোলাম আযমকে জামায়াতের আমীর নিযুক্ত করায় সংবিধান লংঘিত হয়নি।"[৩৯] সরকার এ

Dhaka University Institutional Repository

রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করে। ২২ জুন (১৯৯৪) তারিখে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রশ্নে সরকারের আপিল আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন। এ রায়ের ফলে হাইকোর্ট বিভাগ গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বহাল রেখে যে রায় দিয়েছিলেন তা বহাল থাকলো। প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি হাবিবুর রহমান (প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা) সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি এ.টি. এম আফজাল (প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি), বিচারপতি লতিফুর রহমান (প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি), এ চারজন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ সর্বসম্মতি ক্রমে ঘোষণা করেন, "সরকারের আপীল আবেদন নাকচ হলো"[৪০] রায়ের প্রতিক্রিয়ায় এটর্নীজেনারেল আমিনুল হক বলেন, "একটি মানুষ যিনি মুক্তিযুদ্ধ কালে আলবদর, আলশামস ও রাজাকারদের ঘাতক বাহিনী গঠন করে বাংলাদেশের বহু নিরাপরাধ মানুষ হত্যা করেছে। প্রচলিত আদালতে আজ তারই নাগরিকত্ব বহাল হলো। আইন ও সর্বোচ্চ আদালত যখন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমি পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিচ্ছি"[৪১]। সরকার এভাবেই গোলাম আযমের প্রসংগটি নিষ্পত্তি করেছিল। যদিও এ প্রসংগটি খালেদা জিয়া সরকার কর্তৃক সৃষ্ট কোন সমস্যা ছিল না। এটি ছিল সরকারের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একটি পুরানো সমস্যা।

খ) সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব ঃ

খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গঠিত সংসদীয় ব্যবস্থাধীনে গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র এক বছরের মধ্যেই বিরোধী দল কর্তৃক এ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। যদিও একটি সরকারের সাফল্য ব্যর্থতা মূল্যায়নের জন্য একবছর কোন সময়ই নয়। তার উপর এ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এরশাদ সরকারের দীর্ঘ নয় বছরের স্বৈরশাসনের অবসানের পর। তবুও ১৯৯২ সালের ৫ আগষ্টের জাতীয় সংসদ সচিবালয় সংসদের কার্য প্রণালী বিধির ১৫৯ ধারায় উপ বিধি (৩) অনুসারে মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে 'অনাস্থা প্রস্তাব' উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করে নোটিশ প্রদান করেন বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ নেতা ও সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ,

Dhaka University Institutional Repository

জাসদ (সিরাজ) এর জনাব শাহজাহান সিরাজ, ওয়ার্কাস পার্টির জনাব রাশেদ খান মেনন, সিপিবির জনাব সামসুদ্দোহা, জাতীয় পার্টির জনাব মনিরুল হক চৌধুরী এবং গণতন্ত্রী পার্টির জনাব সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত নিজ নিজ দলের পক্ষ থেকে অনাস্থা প্রস্তাব দেন। ন্যাপের পক্ষ থেকে ও একটি অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেয়া হয়। অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশে বলা হয়েছে যে, "দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। সরকার সে পরিস্থিতির যথোপযুক্ত মোকাবিলা করে জনগণের জান মালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নিরোধ ও ছাত্র ছাত্রী এমন কি শিশু কিশোরদের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠান চাঁদাবাজ মাস্তানদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। সরকার অর্থনৈতিক জীবনে সৃষ্ট নৈরাজ্য দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারের দলীয় করণ নীতির পরিণতিতে শিল্পাঞ্চল ও সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়নে হাইজাক, টার্মিনাল দখল, কলোনী দখলের ফলে শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। সরকার শিল্পাঞ্চলে শান্তি রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। সরকার সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কর্মচারীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতা প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। সে অঞ্চলে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। সরকার রোহিঙ্গা শরনার্থীদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। এ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে সংগঠিত সশস্ত্র তৎপরতা ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ঘটনা প্রতিরোধেও সরকার ব্যর্থ হয়েছে। সরকার বিদেশী দূতাবাসেরও নিরাপত্তা বিধানে ও ব্যর্থ হয়েছে। সে কারণে বিদেশেও দেশের ভাবমূর্তি চরম ভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে।[৪২] সরকারের বিরুদ্ধে আনীত বিরোধী দলের এ অনাস্থা প্রস্তাব ৯ আগষ্ট (১৯৯২) জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়। বিরোধী দল কর্তৃক ইতোপূর্বে দাখিলকৃত ৭টি নোটিশের বক্তব্য ও ভাষা এক ও অভিন্ন হওয়ায় মাননীয় স্পীকার জনাব শেখ রাজ্জাক আলী নোটিশ দাতাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি নোটিশ গ্রহণ করেন। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ কার্যপ্রণালী বিধির ১৫৯ (৪) অনুযায়ী এ অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সরকারের বিরুদ্ধে আনীত এ

Dhaka University Institutional Repository

অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন সম্পর্কে মাননীয় স্পীকার জনাব শেখ রাজ্জাক আলী বলেছেন, "নব প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং সুসংহত করার স্বার্থে এবং সর্বোপরি জনগণের মানসিকতাকে গনতান্ত্রিক চেতনা বোধে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে অনাস্থা প্রস্তাবটি গৃহীত হল"[৪৩] ১২ আগষ্ট (১৯৯২) বিরোধী দলের উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাবের উপর আলোচনা ও ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। অনাস্থা প্রস্তাবের উপর সরকারী দলের ৩০ জন এবং বিরোধী দলের ২৩ জন সংসদে বক্তব্য রাখেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "প্রতিটি ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য, গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের অযোগ্যতা, অদক্ষতা, দলীয়করণ এবং সন্ত্রাস এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে যে, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে গিয়ে যেন জনগণের কাছে আমরা আমাদের স্থান হারিয়ে ফেলেছি। জনগণ আমাদেরও দোষারোপ করতে শুরু করেছে"। অনাস্থা প্রস্তাবের উপর সমাপনি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলের অভিযোগের উত্তরে যে বক্তব্য রাখেন তার উল্লেখযোগ্য হল "গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেয়ার জন্য সর্বপ্রকার প্রক্রিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল শুর করেছে এবং ভবিষ্যতেও তারা সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে। ছিনতাই হাইজ্যাক ও অন্যান্য সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সম্পর্কে বিরোধী দলের নেত্রীর অভিযোগের উত্তরে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, দীর্ঘ ৯ বছর যে স্বৈরাচার দেশে জেঁকে বসেছিল সেই স্বৈরাচারই সন্ত্রাসকে লালন করেছে, আশ্রয় দিয়েছে প্রশ্রয় দিয়েছে। এ অবস্থায় রাতারাতি কি সব হাইজ্যাক বন্ধ হয়ে যাবে? সেটি কখনও সম্ভব নয়। আমরা বলেছি, কিছু কিছু সন্ত্রাস অবশ্যই আছে। সেগুলো দমন করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে"। তিনি আরও বলেন, "আজকে বুঝতে হবে অস্ত্রের যাত্রা কখন থেকে শুরু হয়েছিল; অস্ত্রধারীদের কারা প্রশয়-আশ্রয় দিয়েছে। জাতীয় পার্টি সারা বাংলাদেশে অস্ত্রের রাজনীতি শুরু করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে দেয়ার প্রক্রিয়া তারা শুরু করেছিল। শুধু তাই নয়, সে দিন সকল

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিবিদকে হত্যা করার জন্য সন্ত্রাসীদের ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, যার ফলে ডাঃ মিলন নিহত হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিরোধী দলগুলি বলতে চায় দেশে কিছু হয়নি। আমি শুধু তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই এরশাদ স্বৈরাচার ৯টি বছর দেশের সকল প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে গেছে; দূর্নীতির বীজ বপন করে গেছে প্রতিটি জায়গায়। আজকে আমরা সেই দূর্নীতি উচ্ছেদ করেছি".....
দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান বিএনপি চায়না বলে বলা হয়েছে। আমরা বলতে চাই, "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা কার সৃষ্টি? আওয়ামী লীগ যখন স্বাধীনতার পর ক্ষমতায় ছিল তখন তারা বলেছিল, পার্বত্য অঞ্চলে সকলেই বাঙ্গালী। সকলকে জোর করে বাঙ্গালী করা হয়েছে। তখন থেকেই তারা প্রতিবাদমূখর হয়ে উঠে। আমরা বলতে চাই যে, তারা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান চাই, এরই মধ্যে সেটি প্রমানীত হয়েছে"। ------- আমরা একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছি। দলীয়করণের অভিযোগ সম্পর্কে বেগম জিয়া বলেন, "দলীয় করণ কি জিনিষ- তা আমরা জানিনা। আমরা সকলকে সমান সুযোগ দেই। আপনারা তা দেখেছেন। আপনাদের এলাকাতে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা ঘাট হচ্ছে, ব্রীজ হচ্ছে। এ থেকে কি প্রমাণ হয় না যে, আজকে আমরা শুধু সংসদীয় পদ্ধতি চালূ করিনি, এ পদ্ধতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য গণতন্ত্রকে চিরস্থায়ী করার জন্য, সকলকে সমান সুযোগ দেয়ার জন্য, আমরা সম্পদের সমান বন্টন করছি। সে ভাবে আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছি।"[৪৫]

বেগম খালেদা জিয়া আরও বলেন, বিরোধী দলীয় নেত্রী বলেছেন আমাদের গণতন্ত্র শিখাবেন আমরা তাদের একদলীয় গণতন্ত্র শিখতে চাইনা। বরং শহীদ জিয়াউর রহমানই তাদেরকে বহুদলীয় গণতন্ত্র শিখিয়েছেন, তারা বাকশাল ছেড়ে তাই আবার বহুদলীয় গণতন্ত্রে ফিরে এসেছে। কিন্তু নির্বাচনের মাধ্যমেইতো কেবল জনগণের রায় বা অভিপ্রায় প্রতিফলন ঘটে"। তিনি বলেন, "বিএনপি এ নিয়ে দু'বার সরকার চালাচ্ছেন। আমার প্রশ্ন বিএনপির প্রতি যদি জনগণের আস্থাই

Dhaka University Institutional Repository

না থাকতো তা হলে বিএনপি দ্বিতীয় বার কি করে ক্ষমতায় এসেছে? তিনি বলেন, বিএনপি হচ্ছে জনগণের দল। জনগণের কাছে বিএনপি যে সব ওয়াদা করেছে তা পর্যায়ক্রমে অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে"।[৪৬]

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। বিভক্তি ভোটে প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে ১২২টি ভোট এবং বিপক্ষে পড়ে ১৬৮টি ভোট। জামায়াত ভোট দানে বিরত থাকে। "ভোট গ্রহণ কালে জাতীয় পার্টির ৪, জন ইসলামী ঐক্য জোটের ১ জন, এনডিপির ১ জন, আওয়ামী লীগের ৫ জন এবং ২ জন স্বতন্ত্র সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আওয়ামী লীগের দু'জন সংসদ সদস্য ইন্তেকাল করায় তাদের আসন শূণ্য ছিল। বিএনপির ব্যারিষ্টার জিয়াউর রহমান দেশের বাইরে থাকায় এবং শেখ রাজ্জাক আলী স্পীকার পদে থাকায় ভোট দেননি।"[৪৭] সংখ্য গরিষ্ঠতা বজায় থাকায় বিরোধী দলের এ অনাস্থা প্রস্তাবের ফলে বিএনপি সরকারের পতন বা সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যহত হয় নি। গণতন্ত্র মানেই সংখ্যাগরিষ্টের শাসন। মূলত সরকারকে সতর্ক করার জন্যই বিরোধী দলের এ অনাস্থা প্রস্তাব। তবে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতার জন্য সরকারের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণের জন্য আরও কিছু বেশী সময় দেয়ার প্রয়োজন ছিল। তবুও সরকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়ই বিরোধী দলের অনাস্থা প্রস্তাব মোকাবেলা করেন যা গণতন্ত্রের ভিতকে শক্তিশালী করেছে। জয় হয়েছে গণতন্ত্রের।

গ) নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা বাস্তবায়নের আন্দোলনঃ

খালেদা জিয়ার শাসনামলে সংসদীয় গণতন্ত্রে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলেও সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ স্বাদ জনগণ ভোগ করতে পারেনি। কেননা জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতি ও সংসদ বয়কটের কারণে সরকারের শেষের দুই বছরে এক দলীয় নিষ্প্রাণ সংসদীয় ব্যবস্থায় পরিণত হয়। সরকার বিরোধী ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনের কারণে দেশে বিরাজ করে চরম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা যা কেবলমাত্র

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় গণতন্ত্র নয় গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ পথে ছিল ব্যাপক বাধা স্বরূপ। সংসদীয় গণতন্ত্রে সফলতার জন্য সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের প্রয়োজন ছিল তা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত ছিল। জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতির কারণে জনগণের আশা আকাংখা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার ও বিরোধী দলের অনৈক্যের কারণেই বিরোধী দল কর্তৃক ১ বছরের মধ্যেই অনাস্থা প্রস্তাব আহুত হয়েছিল। সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকায় অনাস্থা প্রস্তাবে সরকার পতনের মত কোন ঘটনা ঘটে নি। তবে অনাস্থা প্রস্তাবের পর সরকার ও বিরোধী দলের ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পায়।

১৯৯৪ সালের ১ মার্চ থেকে বিরোধী দল হেবরনে মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞের ব্যাপারে বিএনপি'র তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদার একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিরোধী দল প্রথমে সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে। পরে এ ওয়াক আউট লাগাতার সংসদ বর্জনে পরিণত হয়। মাগুরা উপনির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও ভোট ডাকাতির অভিযোগ এবং মাগুরা-২ আসনের ফলাফল বাতিল ও পুনঃনির্বাচনের দাবিতে বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বয়কট দীর্ঘস্থায়ী বয়কটে রূপ নেয়। মাগুরা নির্বাচনের পর বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটি জোরালো ভাবে উত্থাপন করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে বিপক্ষে ব্যাপক যুক্তি উত্থাপিত হয়। বিরোধী দল সংবিধান সংশোধন করে ভবিষ্যতে সকল জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের দাবি জানান। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কেন্দ্র করে দেশে চরম রাজনৈতিক সংকট বিরাজ করে। সরকার ও বিরোধী দলের এ সংকট নিরসনের জন্য বেশ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সংসদ উপনেতা ও স্পীকারের উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর কমনওয়েলথ মহাসচিবের আগ্রহে কমনওয়েলথ বিশেষ দূত স্যার ষ্টিফেন নিনিয়ানের মধ্যস্থার সংকট নিরসনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু নিনিয়ানের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। রাজনৈতিক সংকটের মুখে ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলের ১৪৭ জন সংসদ সদস্য 'পদত্যাগ' করেন। যার ফলে সংসদীয় গণতন্ত্র গভীর সংকটে নিপতিত হয়। বিরোধী দল সংসদ বয়কট ও পণপদত্যাগের

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি দেশে হরতাল এবং ধর্মঘটের মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের ফলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করতে থাকে। স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী বিরোধী দলের সংসদ থেকে "গণপদত্যাগ" সংবিধান সম্মত না হওয়ায় পদত্যাগপত্র সমূহ গ্রহণ করেনি। তবে বিরোধী দল রাজপথে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে অর্থনৈতিক অগ্রগতি দারুনভাবে ব্যহত হয়। ইতোমধ্যে সংবিধান অনুযায়ী বিরোধী দলের সংসদ বয়কট একাদিক্রমে ৯০ দিন অতিবাহিত হলে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের সদস্যপদ বাতিল হবে কি না এ সাংবিধানিক প্রশ্নে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টে রেফারেন্সের জন্য পাঠান। সুপ্রীমকোর্ট রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স গ্রহণ করেন এবং আইনজ্ঞ নিয়োগের মাধ্যমে শুনানি শেষে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের জবাব দেন। সুপ্রীমকোর্টের উপদেশ মূলক বক্তব্যের (জবাবের) পর স্পীকার সাংবিধানিকভাবে যাদের অনুপস্থিতিকাল একাদিক্রমে ৯০ দিন অতিবাহিত হয়েছে তাদের সদস্যপদ বাতিল ঘোষণা করেন। ফলে জাতীয় সংসদে একমাত্র সরকারী দল বিএনপি ছাড়া আর কোন দলের প্রতিনিধি ছিল না। বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতার প্রশ্নে কুটনৈতিক মহল সহ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টা চলে, স্পীকারও উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর মধ্যে বেশকিছু পত্র বিনিময়ও হয় কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোন উন্নতি ঘটেনি। বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের আসন শূণ্য হওয়ার পর সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দেয়। নির্বাচন কমিশন প্রথমে দৈবদূর্বিপাকের কারণে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়সীমা আরও ৯০ দিন বর্ধিত করেন। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যেও সরকারের সময়সীমা শেষ পর্যায়ে চলে আসে। উপনির্বাচনের পরিবর্তে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতার প্রশ্নে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও কোন ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিরোধী দল সংবিধান বহির্ভূত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে অনড় থাকে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বারবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার অসাংবিধানিক বলে এ দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তবে সরকারী দল সাংবিধানিক কাঠামোয়

Dhaka University Institutional Repository

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ব্যাপারে বেশ কয়কটি ফর্মুলা পেশ করেন। বিরোধী দল ও তাদের ফর্মুলা পেশ করেন। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে মতপার্থক্য খুব বেশী না থাকা সত্ত্বেও কোন সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উপনির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের অনেক চেষ্টা নেয়া হয় নি। কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই সফল হয় নি। এদিকে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় উপনির্বাচনের আয়োজন করা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি ২৪ নভেম্বর (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী পঞ্চম জাতীয় সংসদের মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই অবসান ঘটান। এরপর সরকার একটি অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বিরোধী দলের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন কিন্তু বিরোধী দল নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অনড় থাকেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন বিরোধী দল সমঝোতায় পৌছলে এবং নির্বাচনে রাজী হলে তিনি নির্বাচনের ১ মাস পূর্বে পদত্যাগ করবেন। রাজনৈতিক সমস্যা-সমাধানের প্রচেষ্টার সাথে সাথে সময় দ্রুত অতিবাহিত হতে থাকে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ এর মধ্যে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণের সকল উদ্যোগ ব্যহত হলে অবশেষে সরকার ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করেন ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬। বিরোধী দল এই নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া একটি অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বিরোধী দল কর্তৃক ঘোষিত গণকার্ফুর মধ্যে সরকার কিছু আসন বাকী রেখে বাকী আসনে নির্বাচন সম্পন্ন করেন। যদিও এই নির্বাচনকে ঘিরে আইন শৃংখলার ব্যাপক অবনতির আশঙ্কায় জনগণের আশা আকাংখা ছিল খুবই কম। নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ৩ মার্চ (১৯৯৬) জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের একমাত্র কাজ সংবিধান সংশোধন এবং ভবিষ্যতে সুষ্ঠ নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ইঙ্গিত দান করেন। এ প্রেক্ষিতে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ কর্তৃক সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাসের মধ্য

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে বিরোধী দলের দীর্ঘ দুই বছরের লাগাতার আন্দোলন ও রাজনৈতিক কর্মসূচির অবসান ঘটে।

খালেদা জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও ঘটনাবলী নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলঃ

বিরোধী দলের সংসদ বয়কট ঃ

সংসদীয় গণতন্ত্রে পুনঃ প্রবর্তনের পর ১৯৯৪ সালের ১ মার্চ পর্যন্ত সংসদীয় কার্যক্রম মোটামুটি ভালভাবেই চলছিলো। ইতোপূর্বে জাতীয় সংসদের ১২টি অধিবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশন সমূহে সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে কেবল মাত্র একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশের সময়ই সমঝোতা হয়েছিল। অন্যান্য সময় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে যে সমস্ত মতানৈক্য সৃষ্ট হয়েছে তা খুব বেশী দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ইতোপূর্বে বিরোধী দল সংসদ থেকে অনেকবার ওয়াক আউট করেছে তবে দীর্ঘ স্থায়ী হয়নি। অবশ্য সংসদে ৭ম অধিবেশনে সরকারী দল কর্তৃক 'সন্ত্রাস দমন আইন' পাশের প্রতিবাদে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করে ছিল এবং সংসদের ৭ম অধিবেশনের বাকী দিন গুলিতে আর সংসদে ফিরে আসে নাই। ১৯৯৪ সালের ১ মার্চ জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশতম অধিবেশনে ক্ষমতাসীন বিএনপি দলীয় সংসদ ও তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদার একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিরোধী দল ওয়াক আউট করে। বিরোধী দলের এই ওয়াক আউট পরবর্তীতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সংসদ বর্জনে রূপ নেয়। ঐ দিন জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের সাংসদ আবুল হাসান চৌধুরী বৈধতার প্রশ্নে আলোচনার সূত্রপাত করে বলেন, "হেব্রনে নামাজরত অবস্থায় গুলি করে ৫২ জন ফিলিস্তিনী মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে অথচ সরকার কিংবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কথা বলেছেনা।"[৪৮] এর উত্তরে সংসদ উপনেতা ডাঃ এ, কিউ, এম, বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, "সংসদে শোক প্রস্তাব নেয়া হয়েছে। সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, "ফিলিস্তিনীদের বর্বরোচিত হত্যাকান্ড নিয়ে আলোচনায় সরকারী দলের আপত্তি নেই।"[৪৯] কিন্তু সংসদে সংসদীয় পরিবেশের বিঘ্ন ঘটে সরকার দলীয় সদস্য তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদার বিরোধী দলের

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যদের উদ্দেশ্যে ছুড়ে দেয়া একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা সংসদে বলেন, ফিলিস্তিনীদের দুঃখে বিরোধী দলের মায়াকান্না দেখে মনে হচ্ছে তারা হঠাৎ খুব বেশী মুসলমান হয়ে যাচ্ছেন।[৫০] ব্যারিষ্টার হুদার এ মন্তব্যে বিরোধী দলের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সকল বিরোধী দলের সদস্যরা এক যোগে দাড়িয়ে তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, গণতন্ত্রী পার্টি, ওয়ার্কাস পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোট ও গণফোরামের সংসদ সদস্যগণ বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্য প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনার দাবিতে ওয়াক আউট করেন। ওয়াক আউট শেষে সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এক প্রেস ব্রিফিং এ বলেছেন, "ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করে ও ধর্মকে কটাক্ষ করে সংসদে বক্তব্য রাখার জন্য তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদাকে সংসদে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে এবং সম্পূর্ণ বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। ধর্ম সম্পর্কে ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তির জন্য তাকে সমগ্র জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।"[৫১] একই দিন সংসদ মূলতবীর পর এক প্রেস ব্রিফিং এ সংসদ উপনেতা ডাঃ এ,কিউ,এম, বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, "তথ্য মন্ত্রী ইতিমধ্যেই হাউজে তাঁর বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন আমি নিজেও দু'বার দাড়িয়ে তার দুঃখ প্রকাশের কথা উল্লেখ করেছি। সেই সঙ্গে আপত্তিকর অংশ কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেয়া হলেও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়, জাতীয় দৈনিক সমূহ ও বিভিন্ন প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়েছে তার থেকে বাদ দেয়া সম্ভব হয়নি। বিষয়টি নিয়ে সরকারও বিরোধী দলের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ৬ মার্চ (১৯৯৪) তথ্যমন্ত্রী সংসদে এক বিবৃতিতে বলেন, "আবার ও দুঃখ প্রকাশ করছি, বক্তব্য প্রত্যাহার করেছি।"[৫৩] পক্ষান্তরে বিরোধী দলের চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম সম্মিলিত বিরোধী দলের এক বৈঠক শেষে প্রেস ব্রিফিং এ জানিয়ে দেন, সংসদে দাড়িয়ে তথ্যমন্ত্রী নিঃশর্ত ক্ষমা না চাইলে তারা (বিরোধী দল) অধিবেশনে যোগদান করবেন না। এরপর বিরোধী দল সংসদের ত্রয়োদশতম অধিবেশনে আর ফিরে আসেনি।

Dhaka University Institutional Repository

মাগুরা উপনির্বাচন ও রাজনৈতিক জটিলতা ঃ

২০ মার্চ (১৯৯৪) জাতীয় সংসদের মাগুরা ২ আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে উক্ত আসন শূণ্য হয়। ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত উক্ত নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী জনাব কাজী সলিমূল হক ৭৩ হাজার ২শ ৪৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। নিকটতম প্রার্থী আওয়ামীলীগের শরীফুজ্জামান বাচ্চু পেয়েছেন ৩৯ হাজার ৬শ ভোট । উক্ত নির্বাচানে মোট ১০২ট কেন্দ্রের মধ্যে ৯৯টি কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩টি কেন্দ্র নির্বাচনী সহিংসতায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। উক্ত তিনটি কেন্দ্রের মেটি ভোটের চেয়ে বিএনপি প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান বেশী হওয়ায় বিএনপি প্রার্থী জনাব কাজী সলিমূল হককে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ পরস্পরের বিরুদ্ধে হামলা, ভোট কেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, প্রহার, অগ্নিসংযোগ ভোট ডাকাতি প্রভৃতি অভিযোগ আনা হয়। নির্বাচনে যেহেতু বিএনপি জয়লাভ করেছে সেহেতু আওয়ামী লীগ সহ বিরোধী দল সমূহ বিএনপির বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করেন। বিরোধী দল এ নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে। ২১ মার্চ (১৯৯৪) মাগুরা পূর্ণ দিবস এবং ২৩ মার্চ দেশব্যাপি অর্ধ দিবস হরতাল কর্মসূচি পালন করে। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ২০ মার্চ (১৯৯৪) এক সংবাদ সম্মেলনে ফলাফল বাতিলের দাবি জানিয়ে জলেন, 'বিএনপি সরকার গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। ভোটের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। তাই আমরা সরকারের পদত্যাগ দাবি করেছি।" তিনি আরও বলেন "বিএনপি'র অধীনে কোন নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে পারে না, বিএনপি নিজেরাই তা প্রমান করেছে।"[৫৪]

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৩.১ মাগুরা উপনির্বাচনের ফলাফল

মোট ভোট ঃ ২০৬৬২৪

ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার (%)
১.	কাজী সলিমুল হক	বিএনপি	৭৩২৪৮	৫০.৬৮
২.	শরিফুজ্জামান বাচ্চু	আওয়ামী লীগ	৩৯৬২৩	২৭.৪২
৩.	নিতাই রায় চৌধুরী	জাতীয় পার্টি	২০৭৯৪	১৪.৩৯
৪.	মোঃ গোলাম আকবর	জামায়াতে ইসলামী	৭৭৩২	৫.৩৫
৫.	মাওঃমোঃ মাহবুবুর রহমান	ইসলামী ঐক্যজোট	৩১২২২	২.১৬
	মোট প্রদত্ত ভোট		১৪৪৫১৯	(৬৯.৯৪%)

সূত্রঃ আজকের কাগজ ২১ মার্চ ১৯৯৪ইং।

জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেছেন, "মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনের ঘোষিত ফল আমরা প্রত্যাখান করেছি।"[৫৫] জামায়াতে ইসলামীও মাগুরা-২ আসনে পুনঃ নির্বাচন দাবি করেছে। মাগুরা উপনির্বাচন সম্পর্কে আব্দুল মতিন তাঁর বইয়ে দৈনিক 'সংবাদে' প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন, উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, "মাগুরা উপনির্বাচনটি ছিল প্রায় সব বিরোধীদলের চোখের সামনে প্রধানমন্ত্রী সহ ক্ষমতাসীন বিএনপি'র মন্ত্রী, এম,পি প্রশাসন, পুলিশবাহিনী সর্বহারা পার্টির সশস্ত্র ক্যাডার, মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের এক যৌথ অভিযান। অভিযানের লক্ষ্য ছিল নির্বাচনে জয়ী হওয়া, যার ফলাফল সম্পর্কে বিএনপি ঢাকা থেকে নীতি নির্ধারণ করে গিয়েছিল। মাগুরা নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনীতির গতিধারা পাল্টে দিয়েছে। রিপোর্ট তিনি আরও উল্লেখ করেন ঃ

প্রথমতঃ একটি নির্বাচিত সরকার, যারা নিজেদের গণতন্ত্রী দল বলে দাবি করে, তারা ১৯৮৬ সালে স্বৈরাচারী এরশাদ যেভাবে নির্বাচন করেছে, সেভাবে বা তার চেয়েও স্বৈরাচারী জবরদখলী কায়দায় নির্বাচন করে খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়তঃ এই নির্বাচনে সরকারী প্রশাসন রাজনৈতিক শক্তিকে সমন্বিত ভাবে ব্যবহার করে নির্বাচনে কারচুপির একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন ঘটিয়েছে।

তৃতীয়তঃ এ প্রথম প্রকাশ্যে এবং সবধরণের নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে এবং আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গলি প্রদর্শন করে সরকার ও ক্ষমতাসীন দল জেল থেকে সাজাপ্রাপ্ত খুনী ও সশস্ত্র ক্যাডারদের বের করে এনে নির্বাচনের কাজে লাগিয়েছেন।

চতুর্থতঃ এ প্রথম সর্বহারা দলের সশস্ত্র ক্যাডারদের সরকারী উদ্যোগে নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাদের মাগুরার শ্রীপুর ও মোহাম্মদপুর থানায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

পঞ্চমতঃ এ প্রথম কোন নির্বাচনী ময়দান থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পালিয়ে আসতে হয়েছে।"[৫৬]

উল্লেখ্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আব্দুর রউফ মাগুরা-২ আসনের নির্বাচনের পূর্বে মাগুরা থেকে আকস্মিক প্রত্যাবর্তন করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের এ আকস্মিক প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে বিচারপতি আব্দুর রউফ বলেছেন, "আমি মাগুরার নির্বাচনের দিন থাকতে গিয়ে দেখালাম সেখানে অনেক মন্ত্রী আছেন, বিরোধী দলের অনেক নেত্রী আছেন, একশোর উপর এমপি আছেন, আমি আমার থাকার প্রয়োজন বোধ করিনি; তাই চলে এসেছি।"[৫৭] প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মাগুরা ত্যাগ প্রসঙ্গে বিএনপি'র পক্ষ থেকে যুগ্ম মহাসচিব ও শ্রম মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূইয়া বার্তা সংস্থা ইউএনবিকে টেলিফোনে বলেন, "প্রধান নির্বাচন কমিশনারের জন্য মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্মকর্তারা সার্কিট হাউস খালি করে দিয়েছেন। কিন্তু, আওয়ামী লীগ নেত্রী স্থানীয় প্রশাসনকে খবর না দিয়ে সার্কিট হাউজে প্রবেশ করে ১নং কক্ষ দখল করেছেন।" তিনি আরও বলেন, "প্রধান নির্বাচন কমিশনারের এ সন্ধ্যায় (শনিবার) মাগুরা ত্যাগের এটা একটা কারণ হতে পারে।"[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

মাগুরা আসনের উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও পত্রপত্রিকা বিএনপির বিরুদ্ধে যে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করেন এ জবাবে বিএনপির মহাসচিব ব্যারিষ্টার আব্দুল সালাম তালুকদার ২১ মার্চ (১৯৯৪) এক বিবৃতিতে বলেন, "বরাবরের মত এবারও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ নির্বাচনের আগে প্রতিবন্ধীগণ কর্তৃক নির্বাচনে কারচুপির সম্ভাবনার কথা বলে পরাজিত হলে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন এবং পরাজিত হয়ে সেই হুমকি কার্যকর করার প্রয়াস নিয়েছেন। নির্বাচনে বিজয়ী হলে বরাবরের মতই তারা কারচুপি আন্দোলন সব কিছু ভুলে যেতেন। অবস্থা এমন দাড়িয়েছে যে, তাদের অভিযোগ ও আন্দোলনের হুমকি এড়ানোর জন্য বিএনপি কে সকল নির্বাচনে ইচ্ছাকৃতভাবে পরাজয় বরণ করে তাদেরকে জিতিয়ে দিতে হবে। জনাব সালাম তালুকদার আরও বলেন, "আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ দাবী করেছেন যে, বিএনপির মন্ত্রী এমপিগণ প্রায় ৭০টি কেন্দ্রে কারচুপি ও ভোট ডাকাতি করে তাদের নিশ্চিত বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছে। এ ব্যাপারে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতি আমরা সচেতন জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গত ২০ মার্চের উপনির্বাচনে মাগুরার ১৯টি ইউনিয়নের মধ্যে ৬টি ইউনিয়নে বিএনপি পরাজিত হয়েছে। এর মধ্যে ৩টিতে জাতীয় পার্টি এবং বাকী ৩টিতে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়েছে। অর্থাৎ তাদের দাবি অনুযায়ী বিএনপি সেখানে কারচুপি করেনি সেখানেও তারা বিজয়ী হতে পারেনি। এমতাবস্থায় গোটা এলাকায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নিশ্চিত বিজয়ে সম্ভাবনার দাবি কতটা যুক্তিযুক্ত? অন্যদিকে গোটা নির্বাচনী এলাকায় প্রদত্ত ১,৪৪,৫১৯ ভোটের মধ্যে বিরোধীদল সমূহ মোট ভোটের ৭১২৭১ ভোট পেয়েছেন এবং বিএনপি প্রার্থী পেয়েছেন ৭৩২৪৮ ভোট অর্থাৎ সরকারী দলও বিরোধী দল প্রায় সমান সমান সংখ্যক ভোট পেয়েছেন। আওয়ামীলীগের দাবি অনুযায়ী ১০৩ টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে ৭০টিতে ভোট ডাকাতি হলে এমন ফলাফল কি করে সম্ভব হতে পারে? পরিশেষে ব্যারিষ্টার তালুকদার বলেন, "এবার মাগুরার উপনির্বাচনের দিন বিরোধী দলীয় নেত্রী সহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী সকল দলের বিপুল সংখ্যক সংসদ সদস্য ও নেতা কর্মী ও দেশ

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশের অসংখ্য সাংবাদিক, অসংখ্য সরকারী কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেট ও আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ঐ ছোট্ট একটি এলাকায় সকলের উপস্থিতিতে ১০৩টির মধ্যে ৭০টি ভোট কেন্দ্রে বিএনপি কর্তৃক কারচুপি ও ভোট ডাকাতি সম্ভব কিনা- এটা বিবেচনার ভার আমি জনগণের উপর ছেড়ে দিয়েছি।"[৫৯] দৈনিক ইনকিলাব এক প্রতিবেদনে মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনের ওপর আমেরিকান দুতাবাস কর্তৃক আয়োজিত পর্যবেক্ষণ দলের অভিমত তুলে ধরেছেন, উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, মাগুরা উপনির্বাচন উপলক্ষ্যে আমেরিকান দুতাবাসের গঠিত একটি পর্যবেক্ষক দলের মতে, ঐ উপনির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কারচুপি ও অনিয়মের কোন প্রমান পাওয়া যায়নি। আমেরিকান দূতাবাসের এক কর্মকর্তার উক্তি দিয়ে প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, পর্যবেক্ষণ দলের কর্মকর্তারা ২০শে মার্চ এবং উপনির্বাচনের দিনে ভোট গ্রহণ কালে শালিখা ও মোহাম্মদপুর থানার বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে পরিদর্শন করেন। ঐ কর্মকর্তা জানান, ভোট চলাকালে তিনি শালিখা ও মোহাম্মদপুর ২০টি কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। এসব কেন্দ্রের কোথাও কোন কারচুপি হয়েছে বলে তিনি প্রমাণ পাননি। তিনি জানান, যে সব কেন্দ্রে তিনি পরিদর্শন করেছেন, সে সব কেন্দ্রে আওয়ামীলীগের পোলিং এজেন্টদের সাথে বিস্তারিত কথা বলেছেন এবং জানতে চেয়েছেন কোন অনিয়ম বা কারচুপি হয়েছে কি না। আওয়ামীলীগের এজেন্টরা তাকে সেদিন জানান, ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে এবং কোন কারচুপি বা অনিয়ম কিংবা অন্য কোন সমস্যা হচ্ছে না। দুতাবাস কর্মকর্তা আরও বলেন, দুপুরের দিকে আওয়ামীলীগের একজন নেতা কয়েকটি কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করে তাকে জানান যে, ঐ সব কেন্দ্রে কারচুপি এবং সন্ত্রাস হচ্ছে। ঐ খবরে আমেরিকান ঐ কর্মকর্তা তাৎক্ষনিকভাবে ঐ সব কেন্দ্রে উপস্থিত হন এবং দেখতে পান যে আওয়ামী লীগ ঐ নেতার অভিযোগ মোটেই সঠিক নয়।"[৬০] উল্লেখ্য যে আমেরিকান দুতাবাসের উক্ত কর্মকর্তার নাম প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

মাগুরা-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী জয়লাভ করায় বিরোধী দলের পক্ষে থেকে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উথাপিত হয়েছে। প্রশ্ন হলো বিভিন্ন দলের প্রায় একশতেরও বেশি এমপি ও মন্ত্রীর উপস্থিতিতে এত ব্যাপক কারচুপি হল কিভাবে? এ নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীর জয়লাভের একটি সুক্ষ্ম কারণ ছিল যা স্থানীয় জনগণের নিকট থেকে জানা যায়, এ সুক্ষ্ম কারণটি হল আঞ্চলিকতা। জাতীয় সংসদের মাগুরা-২ আসনটি ৩টি থানা নিয়ে গঠিত। এর একটি থানা হল শালিখা। বিগত ৪০ বছরে এই শালিখা থেকে কোন এমপি নির্বাচিত হয়নি। বিএনপি প্রার্থী কাজী সলিমুল হকের বাড়ী এ শালিখা থানায় এবং তিনি উক্ত থানা থেকে একমাত্র ও সরকারী দলের প্রার্থী ছিলেন। ফলে শালিখার জনগণ স্থানীয় উন্নয়নের কথা ভেবে এবং নিজ এলাকার এমপি রাখার জন্য বিএনপি প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে। উল্লেখ্য যে শালিখা থানায় ভোটার সংখ্যা ৭৩ হাজার ৮ শত ৭১ জন।

মাগুরা উপনির্বাচনের ফলাফল জাতীয় রাজনীতিতে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে কাজ করেছে। একদিকে বিরোধী দল জাতীয় সংসদে তাদের বর্জনকে স্থায়ী রূপ দেয়, দ্বিতীয়ত ইতিপূর্বে উথাপিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিকে জোরালোভাবে উথাপন করেন। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বলা হয়। বিএনপি সরকারের অধীনে আর কোন নির্বাচন নয়। ভবিষ্যতের সকল জাতীয় নির্বাচনে নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন হতে হবে। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ২৮ মার্চ (১৯৯৪) তারিখে সিলেটের বিভিন্ন জনসভায় ঘোষণা করেন, "মাগুরা উপনির্বাচনে ইতিহাসের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে, এ উপনির্বাচন কোনা ভাবেই মেনে নেয়া যায় না। শেখ হাসিনা অবিলম্বে নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানান"[৬১]

মাগুরা উপনির্বাচন ছিল বিএনপি সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের ১৬ তম উপনির্বাচন। এছাড়াও বিএনপি সরকারের অধীনে ইউনিয়ন কাউন্সিল পৌরসভা এবং চারটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন গুলো নির্বাচন নিয়ে কোন কারচুপির

Dhaka University Institutional Repository

অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। কারণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় যে, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে যথাক্রমে আওয়ামীলীগের জনাব মোহাম্মদ হানিফ ও এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী জয়লাভ করেন। বাকী ২টি সিটি কর্পোরেশনে অর্থাৎ খুলনা রাজশাহীতে জয়লাভ করে বিএনপির যথাক্রমে শেখ তৈয়বুর রহমান এবং মিজানুর রহমান মিনু। জাতীয় সংসেদ ১৬টি নির্বাচনের মধ্যে মাগুরা ব্যতীত মিরপুর (ঢাকা-১১) আসনের নির্বাচনের কারচুপির অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত ও হস্তক্ষেপের ফলে সেই বিভ্রান্তির অবসান ঘটে। মিরপুর ঢাকা-১১ আসনের ফলাফল ঘোষণায় বিভ্রান্তি এবং আওয়ামীলীগের কতিপয় অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন উক্ত নির্বানের ঘোষিত ফলাফল বাতিল ঘোষণা করে পুনঃরায় ভোট গণনার নির্দেশ দিয়েছেলো। ১৩ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) নির্বাচন কমিশন ঢাকা-১১ আসনের ফলাফল পুনঃ গণনা প্রসঙ্গে জানান, নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর ৩৭ অনুচ্ছেদ বলে প্রত্তকৃত ও ৩৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ক্ষমতা বলে ঘোষিত ফলাফল ও তৎসংক্রান্ত আনুসাঙ্গিক যাবতীয় আদেশ নির্দেশ আইনানুগ সম্পন্ন না হওয়ায় ও পুনঃ গণনার জন্য রিটার্নিং অফিসারকে নির্দেশ দেয়া হলো"।[৬৫] বাংলাদেশ নির্বাচন প্রক্রিয়ার ইতিহাসে নির্বাচন কমিশনের এ পদক্ষেপ ছিল প্রথম। ১৫ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) মিরপুর উপনির্বাচনের ভোট পুনঃ গণনা করা হয়। ভোট পুনঃগণনার পূর্বে নির্বাচন কমিশন আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে আনীত অভিযোগসমূহ নিস্পত্তি করেন। আওয়ামীলীগের নির্বাচনী এজেন্ট খ.ম. জাহাঙ্গীর স্বাক্ষরিত নির্বাচন কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগ নামায় ভোট কেন্দ্রের বাইরে রাস্তায় ব্যালট পেপার প্রাপ্তি, গণনায় গরমিল, ঢাকা ট্রেজারীতে সীল গালা ব্যতীত ছালার বস্তা প্রভৃতি বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয় এবং উক্ত আসনে পুনঃ নির্বাচন দাবি করা হয়। নির্বাচন কমিশন অভিযোগ সমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার যৌথ স্বাক্ষরিত রায়ে বলেন, "১৯৭২ সালের জন প্রতিনিধিত্ব আইনের ৪২ ধারা মোতাবেক ঢাকা ট্রেজারীতে নির্বাচন কমিশন সচিব দেখতে পান সেখানে ব্যালট পেপার যথাযথ আছে এবং কোন ত্রুটি

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায়নি। তাই যথাযথভাবে অভিযোগ বাতিল বলে নিষ্পত্তি হলো।"[৬৩] এছাড়াও আওয়ামীলীগের মতিয়া চৌধুরী ছালার বস্তায় ঠিকমত সীল গালা লাগানো ছিলনা বলে লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে উক্ত অভিযোগ নাকচ করে দেন। রাস্তায় ব্যালট পেপার প্রাপ্তি সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের অভিমত হলো, কোন ভোটার যদি ব্যালট পেপার বাক্সে না ঢুকিয়ে বাইরে নিয়ে যায়, তাহলে সে ব্যালটতো বাইরে পাওয়া যেতেও পারে এতে নির্বাচন কমিশনের কিছুই করার নেই। অতএব এ অভিযোগও বাতিল হয়ে যায়। এরপর ভোট পুনঃগণনায় বিএনপি প্রার্থী পান ৮০ হাজার ৬শত ৫১ ভোট, রিটার্নিং অফিসারের ঘোষিত ফলাফলে ৮০ হাজার ২ শত ৭৬ ভোট ছিল। আওয়ামী লীগের কামাল আহমেদ মজুমদারের প্রাপ্ত ভোট ৭৭ হাজার ১ শত ২৭ ভোট। ইতোপূর্বে রিটার্নিং অফিসারের ঘোষিত ফলাফলে ছিল ৭৭ হাজার ৫ শত ৩৫ ভোট। কাজেই এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক পুনরায় ভোট গণনায় বি এন পি প্রার্থীর ভোট আরও বৃদ্ধি হয়েছে। এর ফলে সকল বিভ্রান্তির অবসান ঘটে।

সারণী ঃ ৩.২

মাগুরা উপনির্বাচন পর্যন্ত বিএনপির অধীনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের পরিসংখ্যান

মোট আসন	বিএনপি	আওয়ামী লীগ	জাতীয় পার্টি
১৬	৭	৫	৪

দেখা যাচ্ছে যে বিএনপি সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অধিকাংশ আসনে বিরোধী দলই জয়লাভ করার পরও ১টি মাত্র- মাগুরা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকারের মেয়াদ পুর্তির পূর্বেই সরকারের পদত্যাগ দাবি করে এবং বিএনপি সরকারের অধীনে আর কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণে অস্বীকার করে। অবশ্য পরবর্তীতে বিরোধী দল আর কোন উপনির্বাচনে এমনকি জাতীয় নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ থেকে রাজপথে বিরোধী দল ঃ

১ মার্চ ১৯৯৪ ইং থেকে বিএনপির তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদার একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিরোধীদলের সংসদ বয়কট স্থায়ী রূপ নেয় মাগুরায় উপনির্বাচনে সরকারী দলের বিরুদ্ধে .কারচুপির অভিযোগে। মাগুরা উপনির্বাচনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিরোধীদল সংসদ বয়কটের পাশাপাশি হরতাল ধর্মঘট অবরোধ কর্মসূচি অব্যাহত রাখে। ৭ এপ্রিল (১৯৯৪) মাগুরা উপনির্বাচনের ফলাফল বাতিল, পুনঃ নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামীলীগের ডাকে সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন শেষে সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি সরকার গণতন্ত্রের ভাষাকে বুলেটের মাধ্যমে কেড়ে নিতে চায়।"[৬৪] বিরোধী দল ৫ম জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশতম অধিবেশন থেকে বয়কট করেন। সংসদের চতুর্থতম অধিবেশনে যোগ দেয়ার প্রশ্নে ২০ এপ্রিল (১৯৯৪) বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত বিরোধীদলের বৈঠকে সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে যোগদেয়ার মত পরিবেশ তৈরী হয়নি বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয় এবং সংসদ অধিবেশনে যোগ না দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩ মে (১৯৯৪) আওয়ামীলীগের বিশেষ বর্ধিত সভা ও সংসদীয় দলের বৈঠকেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি না মানা পর্যন্ত সংসদে না যাওয়ার অভিমত ব্যক্ত করা হয়। ৪ মে '৯৪ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের প্রথম দিবসে সংসদ নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলের উদ্দেশ্যে বলেন, "আন্দোলনের বন্ধুরা আসুন, সংসদেই সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি"। তিনি আরও বলেন, "সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাণ কেন্দ্র জাতীয় সংসদ। রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। জাতীয় ক্ষেত্রে সমস্যাও রয়েছে অনেক। এসব নিয়ে সংসদে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বের করতে হবে।"[৬৫] কিন্তু বিরোধী দল তাদের দাবিতে অনড় থেকে চতুর্দশ অধিবেশনের কোন বৈঠকেই যোগ দেয়নি। এমনকি পরবর্তীতে ৫ম জাতীয় সংসদের কোন অধিবেশনেই যোগ দেয়নি। জাতীয় সংসদের পঞ্চদশ অধিবেশনেই ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করা হয়। বিরোধী দল বাজেট অধিবেশনেও

Dhaka University Institutional Repository

অনুপস্থিত ছিল। বিরোধী দলের বাজেট অধিবেশনে যোগদান না করা প্রসঙ্গে গণযোগাযোগ সম্পর্কিত বেসরকারী সংস্থা সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট (সি এফ এস ডি) জাতীয় সংসদে পেশকৃত ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরের বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দলের উপস্থিতি সম্পর্কে জনগণের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে ১১-১২ জুন (১৯৯৪) এক জনমত জরিপ চালায়। জরিপে দেখা যায়, "ঢাকা মহানগরীর শতকরা ৮৬.৫ ভাগ মানুষ মনে করেন জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দলের উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। বাকী শতকরা ১৩.৩ ভাগ মনে করেন। সংসদে অনুপস্থিত থেকে বিরোধী দল সঠিক কাজ করেছেন।"[৬৬]। বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বয়কট সম্পর্কে প্রখ্যাত আইনজ্ঞ এবং রাজনীতিবিদ ডঃ কামাল হোসেন বলেন, "Prolonged boycott of parliament sessions could by no means help resolve the political crisis facing both part in power and opposition[৬৭] বিরোধী দলকে জাতীয় সংসদে ফিরিয়ে আনতে সরকারি তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীর আহবান ছাড়াও সংসদ উপনেতা, স্পীকার এবং কুটনৈতিক পর্যায়ে থেকেও ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিরোধী দল শেষ পর্যন্ত পঞ্চম জাতীয় সংসদে আর ফিরে আসেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে তারা সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং রাজপথে সরকার বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হন।

সংসদ বয়কটের বিরুদ্ধে রীট ও রায় ঃ

জাতীয় সংসদ থেকে বিরোধী দলের সংসদ বয়কট স্থায়ী রূপ নিলে জনৈক এডভোকেট আনোয়ার হোসেন খান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে একটি রীট দাখিল করেন। ১১ ডিসেম্বর (১৯৯৪) উক্ত রীটের এক রায়ে জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের সংসদ বয়কটকে অবৈধ ঘোষণা করে, সংসদের বিরোধী দলিয় নেত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা ব্যারিষ্টার মওদুদ আহম্মদ এবং জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর প্রতি এক আদেশে হাইকোর্ট বেঞ্চ সংসদের পরবর্তী অধিবেশন শুরু হলে তাতে

Dhaka University Institutional Repository

সকল বিরোধী দলের সাংসদদের যোগ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বিচারপতি কাজী শফিউদ্দিন এবং বিচারপতি কাজী মনোয়ার উদ্দিনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ উক্ত রায় প্রদান করেন। উক্ত রায়ে আরও বলা হয়েছে, "সংসদ বর্জনকালীন সময়ে তারা যে বেতন ভাতা গ্রহণ করেছেন তা অসাংবিধানিক ও অন্যায়। এ বেতন ভাতা উপযুক্ত আইনের মাধ্যমে উসুল যোগ্য।"[৬৮] সংসদ বর্জকারী দল সমূহের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে উক্ত রায়ের কার্যকারিতার ওপর স্থগিতাদেশের আবেদন জানান হলে আদালত উক্ত আবেদন নাকচ করেন, তবে উচ্চ আদালতে আপীলের অনুমতি দান করেন। বিরোধী দলের তিন নেতার পক্ষ থেকে পরবর্তীতে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল আবেদন করেন এবং আপীল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি এটিএম আফজাল উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিরোধী দলের সংসদ বর্জন সংক্রান্ত মামলার রায়ের কার্যকারিতা ১৫ জানুয়ারী (১৯৯৫) পর্যন্ত স্থগিত ঘোষনা করেন। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যগণ ২৮ ডিসেম্বর (১৯৯৪) সংসদ থেকে গণ পদত্যাগ করেন। পরবর্তীতে উক্ত মামলাটি অনিস্পন্ন অবস্থায় পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম রূপ রেখা ঃ

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৯৩ এর শেষের দিকে বিরোধী দল সমূহ নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি তোলে। মাগুরা উপনির্বাচনে ক্ষমতাসীন বিএনপি'র বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ উত্থাপিত হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটি জোরালো ভাবে উত্থাপন করা হয় এবং বিরোধী দল সমূহ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখে। জাতীয় সংসদ থেকে সংসদ বর্জনরত অবস্থায় জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ২৭ জুন (১৯৯৪) জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রথম বারের মত আনুষ্ঠনিকভাবে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ রেখা' ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য যে বিরোধী দল সমূহের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে ২৬ জুনের মধ্যে জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল আনার জন্য সরকারকে

Dhaka University Institutional Repository

আলটিমেটাম দিয়েছিলো এবং উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বিরোধী দল সমূহের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ রূপ রেখা ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত রূপরেখায় বলা হয়েছে,

"একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে, জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন।

রাষ্ট্রপতি অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনা করার জন্য জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী আন্দোলন রত রাজনৈতিক দলসমূহের পরামর্শক্রমে একজন নির্দলীয় সরকারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে তার কার্য পরিচালনা করেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন এবং নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এমন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি মন্ত্রী সভা গঠন করবেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মূল দায়িত্ব হবে একটি অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা এবং সংবিধান প্রদত্ত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়া জরুরী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সংসদ নির্বাচনের পর সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ৩ দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অবলুপ্ত হবে।

রূপ রেখায় আরও বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনকে পূনর্গঠন করতে হবে এবং নির্বাচন কমিশন যাতে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে তার প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আচরণ বিধি প্রণয়ন ও নিশ্চিত করতে হবে।

উপরোক্ত পদক্ষেপ সমূহ বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে বলে রূপ রেখায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘোষিত রূপ রেখার শেষাংশে বলা হয়েছে যে, "এ রূপ রেখা বাস্তবায়ন করার জন্য জাতীয় সংসদে সকল বিরোধী দল আজ ঐক্যবদ্ধ। সরকার যেহেতু সংবিধান সংশোধনী বিল আনতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সকল বিরোধী দলকে সংসদের বাইরে থাকতে বাধ্য করেছেন সেহেতু আজকে এ রূপ রেখা বাস্তবায়ন করার জন্য একটি বৃহত্তর গণআন্দোলন ছাড়া কোন বিকল্প নেই।"[৬৯] বিরোধী দল কর্তৃক উক্ত রূপ রেখা ঘোষণার একদিন পর বিএনপি'র পক্ষ থেকে মহাসচিব ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার এক প্রতিক্রিয়ায় বিরোধী দল কর্তৃক ঘোষিত এ রূপ রেখাকে অসাংবিধানিক বলে উল্লেখ করে বলেন, "এ রূপ রেখা নিরপেক্ষ নয়, কারণ বিএনপি'র ১৭৩ জন সংসদ সদস্যের কথা এ রূপ রেখায় উল্লেখ নেই। তত্ত্বাধায়ক সরকার প্রশ্নে যে সব বিরোধী দল আন্দোলনরত শুধুমাত্র সে সব দলের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে হবে এটা নিরপেক্ষ যুক্তি হতে পারে না।"[৭০] তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ রেখার ভিত্তিতে বিরোধীদল সরকারী দলকে সংবিধান সংশোধন করে ভবিষ্যত সকল জাতীয় নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান করার জন্য দাবি জানায় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। খালেদা জিয়ার শাসনামলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে চিহ্নিত হয়ে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীর যৌক্তিকতা ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারনা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন না হলেও খালেদা জিয়ার শাসনামলে বিশেষ করে মাগুরা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি তোলা হয় এ ধারণাটি বাংলাদেশের রাজনৈতিতে নতুন এবং বাংলাদেশের সংবিধানে অনুপস্থিত।

সাধারণত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলতে একটি অস্থায়ী সরকারকে বুঝায় যার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য দেশের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন শাসন কার্য পরিচালনা করা। 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' হিসেবে যে কোন নিয়মিত সরকার বা যে কোন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত সরকারও দায়িত্ব পালন করতে পারে। যেমন আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত এবং পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন যে সমস্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো তত্ত্বাবধায়ক বা বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে হয়েছে; তবে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল পূর্ব থেকেই ক্ষমতাসীন দলীয় সরকার। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ভারতে কিংবা গণতান্ত্রিক সরকার যেখানে বিদ্যমান সেখানে, যখন কোন সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারান বা সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় তখন যে সরকার প্রধান থাকেন তিনি নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রধানের কাছে পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন। তখন রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধান (ক্ষেত্র মতে) ক্ষমতাসীন সরকার (পদত্যাগী) কেই তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার অনুরোধ করেন। তখন থেকেই সেই সরকার তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এরশাদের দীর্ঘ নয় বছর স্বৈরাশাসনের পর বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়েছিল সেই সরকারকেও 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের সরকার গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলেও বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিলো না। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের

Dhaka University Institutional Repository

সরকারকে সাংবিধানিক ও নিয়মিত সরকারই বলা যায়। যদিও বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদে মনোনীত হয়েছিলেন তিন জোটের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে কিন্তু তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সাংবিধানিক ভাবে। প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদত্যাগের ফলে উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মেদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ সাংবিধানিক সরকার প্রধান হিসেবে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা করেন যদিও তাকে অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলা হয়। কিন্তু পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংসদ বর্জনরত বিরোধী দল সমূহ যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি জানান তা সংবিধানে অনুপস্থিত এবং সংবিধান পরিপন্থী হলে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ দাবি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। পক্ষান্তরে এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে এর পক্ষে বিপক্ষে বিতর্ক দেখা দেয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রধন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামী সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ঘোষিত 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' রূপ রেখার ভিত্তিতে যৌথভাবে আন্দোলনের কর্মসূচি পালন করেন। ৮ দলের সমন্বয়ে গঠিত বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি জানালেও আওয়ামী লীগ সহ তিন দলের ঘোষিত রূপ রেখার সাথে তাদের দ্বিমত রয়েছে। বামফ্রন্ট, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের ত্রিদলীয় ঐক্যের পক্ষ থেকে ঘোষিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ রেখাকে 'অপূর্ণ' বলেছেন। এ সম্পর্কে বাম ঐক্যের পক্ষ থেকে ঘোষিত, "-এ রূপ রেখা দ্বারা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত হবেনা। তার উপর সংবিধান বহির্ভূত পন্থায় অশুভ শক্তির হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দেয়া এবং সেভাবে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর অশুভ আতাঁতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা এ রূপ রেখায় উন্মুক্ত রাখা হয়েছে"[৭১] বাম ফ্রন্ট নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সংবিধান সংশোধনের যে প্রস্তাব করেছেন তাহলো সংবিধানের "১২৩ নং ধারা সংযোজন করে সেই ধারায় নিম্নোক্ত ১২৩ (৫) উপ ধারা যুক্ত করতে হবে- এই সংবিধানে অন্য যা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে সংসদ বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে রাষ্ট্রপতি কয়েকজন নির্দলীয় এবং নিরপেক্ষ বলে বিবেচিত বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। যার কাজ হবে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজটি সম্পাদনের নির্দেশ দেয়া ও দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় কাজ চলু রাখা। এরূপ 'উপদেষ্টা পরিষদ' নিযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করেছে বলে বিবেচিত হবে। নির্বাচনের পর ৩ (ক) এবং ৩ (খ) উপ ধারা অনুযায়ী এবং ৫৫ (ক) ধারা অনুসারে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে এই 'উপদেষ্টা পরিষদ' বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ ব্যবস্থা আগামী ১৫ বছর অথবা আগামী ৩টি জাতীয় নির্বাচনের সময় কালের মধ্যে যেটি আগে অতিক্রান্ত হয় সেই সময়কাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। উদেষ্টাদের কেউই নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। এ সংশোধনীর ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌছাবার জন্য বিষয়টি সর্বদলীয় বাছাই কমিটিতে প্রথমে আলোচনা হতে পারে। যদিও এরূপ বিবেচিত হয় যে, সংশোধনীর জন্য গণভোটের প্রয়োজন, তারও ব্যবস্থা করা যেতে পারে।"[৭২] এ ছাড়াও বাম ফ্রন্টের উক্ত প্রস্তাবে মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠিত করে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রন ও কর্তৃত্ব মুক্ত স্বাধীন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। ভোটারদের জন্য আইডি কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা এবং সফল প্রার্থীর ফলাফল নির্বাচন কমিশন কর্তৃক একত্রে প্রকাশ করা, ইত্যাদি ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ রেখা নিয়ে রাজনৈতিক দল সমূহের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সাপ্তাহিক বিচিত্রার ২৩ বর্ষের ১৯ সংখ্যায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বাদশ সংশোধনীর সময় পাঁচদল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পরবর্তী কয়েকটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রাখার দাবি তুলেছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির বিরোধীতার জন্য তা সংশোধনীতে সন্নিবেশিত হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটি আওয়ামী লীগ শুধু গ্রহণই করেনি, জামায়াতে ও জাপাকে ঘনিষ্ট সহযোগী করতে তৎপর হয়ে উঠে।[৭৩] সিপিবি'র নেতা মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম এক সেমিনারে বলেছেন, "তিন জোটের রূপ রেখা প্রণয়নের সময় একাধিকবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের শর্তটি রাখার প্রস্তাবটি শেখ হাসিনাই বাতিল করে দিয়েছিলেন।" জনাব সেলিমের মতে, "তখন আওয়ামীলীগের ধারণা ছিল নির্বাচনে তারাই জয়ী হবে। সুতরাং

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একবারের বেশী নির্বাচনের দরকার নেই।[৭৪]

এবার 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' প্রশ্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, পত্রিকাসমূহের সম্পাদকীয়, সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবীগণ যে বক্তব্য রাখেন তা তুলে ধরা হল ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে ঃ

আওয়ামী লীগ নেতা ও পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় চীপ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম বলেন, "জনগণের ভোটাধিকার রক্ষা ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন।"[৭৫]

আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য জোহরা তাজউদ্দিন বলেন, "আজকের ঘটনা প্রবাহের প্রেক্ষাপটে এবং সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত মাগুরা উপনির্বাচনের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, তত্ত্বাবধায়ক ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারই সুষ্ঠু নির্বাচনের একমাত্র পথ"[৭৬]

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান বলেন, বিএনপি'র আমলের সবক'টি উপনির্বাচনে সন্ত্রাস, ভোটচুরি, ভোট ডাকাতি, প্রশাসনকে প্রভাবিত করার মতো কর্মকান্ডই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছে"।[৭৭]

আজকের কাগজ ২৯ এপ্রিল (১৯৯৪) সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, নির্বাচনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং জনগণের পবিত্র আমানত ভোটাধিকার প্রয়োগে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ রহিত করার জন্য সর্বোপরি রাজনৈতিক দলসমূহ প্রকৃত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সহিষ্ণুতা অর্জন করা না পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান সাংবিধানিক ভাবে (বিধিবদ্ধ) করাটাই যুক্তিযুক্ত বলে আমরা মনে করি। এ ব্যাপারে জাতীয় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হোক এই আমাদের প্রত্যাশা।"[৭৮]

Dhaka University Institutional Repository

কলামিষ্ট ফকির ইলিয়াস এক নিবন্ধে উল্লেখ করেন, "গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হচ্ছে, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোটাধিকার প্রয়োগ, জনগণ যদি সুষ্ঠুভাবে তাদের ভোটই দিতে না পারে, তাহলে তারা জেনেশুনে গণতন্ত্রের স্বাপক্ষের শক্তিকে রায় দেবে কিভাবে? আর তা একমাত্র নিশ্চিত করতে পারেন একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার।"[৭৯]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিপক্ষে ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে অনেক বক্তব্য এবং মন্তব্য করলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিপক্ষে ও অনেক মন্তব্য করেছেন। বিএনপি সরকারের প্রাক্তন তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা বলেন, " তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি দুর্বল, অনির্বাচিত ও অস্থায়ী সরকার এ ধরণের ব্যবস্থায় ভোট কারচুপি সুবিধা হবে বলেই বিরোধী দল এ দাবি করেছে। বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি যৌক্তিক এবং গ্রহণ যোগ্য নয়, কেননা জনগণের নির্বাচিত বিএনপি সরকার সুষ্ঠু, অবাধ, নির্বাচনের গ্যারান্টি দিতে পারে।" [৮০]

বিএনপি দলীয় সংসদ ও পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া বলেন, "৯০তে বাংলাদেশে এবং সম্প্রতি পাকিস্তানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যে নির্বাচন হয়েছে সেটা একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে করতে হয়েছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য সংসদে সম্মিলিতিভাবে বিল আনতে হবে। যা নীতিগতভাবে সম্ভব নয়। Extra Constitutional বা সংবিধানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হবে বলে তিনি দাবি করেন।"[৮১]

বিএনপি'র মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমাবায় মন্ত্রী ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার আজকের কাগজের সাথে এক স্বাক্ষাৎকারে বলেন, " তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন নির্বাচন হলেই ভোট অবাধ, সুষ্ঠু হবে সে গ্যারান্টি কে দেবে? কারণ '৯১ এর নির্বাচন

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া সত্ত্বেও বিরোধী দলীয় নেত্রী অভিযোগ করেছিলেন সুক্ষ্ম কারচুপি'র। তিনি আরও বলেন, "নির্বাচিত সরকারের বদলে আমরা একটা 'নন-ইলেকটেড সরকারের অধীনে নির্বাচনে কে যাবে? তার চেয়ে আমরা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরো অবাধ সুষ্ঠতার গ্যারান্টির জন্য ইলেকশন কমিশনকেই শক্তিশালী করার ব্যাপারে আলোচনা করতে পারি।"[৮২] প্রধান নির্বাচন কমিশনারও নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তনের কথা বলেছেন, প্রধান নির্বাচন কশিনারের মতে, "বর্তমান পদ্ধতিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই শুধু মাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করে কিছু হবে না যদি নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন না হয়"।[৮৩]

গণফোরামের এক সমাবেশে গণফোরাম নেতা ডঃ কামাল হোসেন, "কেমলমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার নয়, সংবিধানিক ও আইনগত ভিত্তি দৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। সমাবেশের প্রস্তাবে বলা হয়ছে, "অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা থাকতে হবে। নির্বাচন কমিশনের জন্য পৃথক ও স্বাধীন সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা, নির্বাচন অপরাধের জন্য গুরুতর শাস্তি ও অপরাধীকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে। নির্বাচন পদ্ধতিতে কতিপয় প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ভোটারদের নিবন্ধীকরণ ও পরিচয় পত্র দান। নির্বাচনী ব্যয়ের সুযোগ সীমাবদ্ধ করা, ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। গণমাধ্যম ও ষড়যন্ত্রকে নিরপেক্ষ করা, বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা।"[৮৪]

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং রাজনৈতিক ভাষ্যকার অধ্যাপক জিল্লুর রহামন সিদ্দিকী অভিমত ব্যক্ত করেন যে, "The opposition may be wrony in thinking that Caretaker Government is the only answer to elections being rigged massively that it behaves the ruling party to suggest an alternative which will make sense". He maintained further that, "More talk of perfecting election rules when the EC is powerless to implement the rules, is idle talk."[85]

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাসস'র সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেন, "তত্ত্বাবধায়ক সরকার কখনোই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের বিকল্প হতে পারে না। '৯০তে নিরপেক্ষ সরকার গঠিত হয়েছিল একটি স্বৈরাচরী শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য। -------- নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আরও উন্নতি সাধনসহ সকল জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা এবং সমাধান সংসদেই হতে পারে। বর্তমান ব্যবস্থায় নির্বাচন সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনে। বর্তামন নির্বাচন কমিশনকে নিয়োগ করেছে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সে থেকে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছে। -------- বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর কখনই নির্বাচন কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ করেনি। গত তিন বছরে সারা দেশে ৪ হাজার ইউনিয়ন পরিষদ, ১শ মিউনিসিপ্যাল, ১৬টি জাতীয় সংসদের শূণ্য আসনে উপনির্বাচন ও ৪টি সিটি কোর্পরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সবগুলো নির্বাচন অবাধও নিরপেক্ষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ------- নির্বাচন ব্যবস্থাকে আরো আধুনিক ও উন্নত করতে যে কোন যুক্তি, পরামর্শ, সরকার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে"। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে দেশব্যাপী ভোটারদের জন্য পরিচয়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত নীতিগত ভাবে নেয়া হয়েছে। এতে ভোটারদের ভোট প্রদান নিশ্চিত ও পাশাপাশি নির্বাচন ব্যবস্থা আধুনিকায়ন হবে।"[৮৬] এছাড়াও তিনি নির্বাচন সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিস্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনীর ব্যাপারে সরকার চিন্তাভাবনা করেছে বলে জানান।

অতএব, উল্লেখিত জাতীয় নেতৃবৃন্দের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে একদিকে সরকার এবং অন্যদিকে বিরোধী দল সমূহ অবস্থান করেছে এবং উভয়ের মনোভাব বিপরীত মুখী। আর এই বিপরীত মূখী মনোভাবের ফলে দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি এক গভীর সংকটে উপনীত। এই সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ সমঝোতা এবং সাংবিধানিক গ্যারান্টি।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

খালেদা জিয়া সরকারের সংকট সমাধানের প্রচেষ্টা ঃ

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে "তত্ত্বাবধায়ক সরকারে'র অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিরোধী দলের সংসদ বর্জনকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে সেই সংকট নিরসনে বেশ কয়টি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যদিও এ সমস্ত উদ্যোগ কোনটাই ফলপ্রসু কিংবা রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করতে পারে নি, তবুও বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ সমস্ত উদ্যোগের অবদান কোন অংশেই কম নয়।

ক) সংসদ উপনেতার উদ্যোগ ঃ

১৯৯৪ সালের আগষ্টের প্রথম দিকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাজনৈতিক সংকট নিরসনে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে ছিলেন। সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ, কিউ, এম, বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির অপর দুই সদস্য হলেন, বিএনপি'র মহাসচিব ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার এবং চীফ হুইপ খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন।

এ কমিটির মাধ্যমে ২৪ আগষ্ট (১৯৯৪) সরকারি দলের পক্ষ থেকে বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেয়া হয়। ২৯ আগষ্ট (১৯৯৪) সংসদ উপ-নেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী টেলিফোনে বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদকে জানান যে, সরকারি দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে নীতিগতভাবে আলোচনায় রাজি আছে। ৩১ আগষ্ট (১৯৯৪) রাজনৈতিক সংকট নিয়ে সংসদ উপনেতা অধ্যাপক বি, চৌধুরী এবং বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদের মধ্যে আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দেড় ঘন্টা ব্যাপী বৈঠক হয়। উভয় নেতাই আলোচনা সন্তোষ জনক বলে দাবি করেন। কিন্তু এ দু'পক্ষের মধ্যে আর কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে ৭ সেপ্টেম্বর (১৯৯৪)

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ উপনেতা সংসদের অচলাবস্থা নিরসনের জন্য বিরোধী দলীয় উপনেতাকে একটি চিঠি দেন। বিরোধী দলীয় উপনেতা ১৬ সেপ্টেম্বর সেই চিঠির জবাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সুস্পষ্ট এজেন্ডা নিয়ে বিরোধী দল যে কোন সময় যে কোন স্থানে সরকারি দলের সঙ্গে বসতে প্রস্তুত রয়েছে বলে জানান। এরপর কমনওয়েলথ মহাসচিবের উদ্যোগ গ্রহণের পর ৪ অক্টোবর (১৯৯৪) এক পত্রের মাধ্যমে সংসদ উপনেতা বিরোধী দলীয় উপনেতাকে সংলাপের সময় তারিখ ও স্থানের বিষয়ে নাম আহবান করেন। কিন্তু উপনেতা পর্যায়ে আর কোন আলোচনা না হওয়ায় সংসদ উপনেতার নেতৃত্বে সংকট নিরসনের এ পর্যায়ের উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

খ) কমনওয়েলথ মহাসচিবের উদ্যোগ ঃ

১৭ সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) কমনওয়েলথ মহাসচিব এমেকা এনিয়াওকু প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে বর্তমান প্রশাসনের অধীনে বাংলাদেশে মুক্ত ও অবাধ নির্বাচন সম্ভব বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। এ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে কমনওয়েলথ মহাসচিব তিন দফা প্রস্তাব সুপারিশ করেছেন। তার সুপারিশ গুলো হচ্ছে ঃ

১। নির্বাচন কমিশনকে আরও শক্তিশালী করা।

২। সকল রাজনৈতিক দলের জন্য একটি নির্বাচনী আচরণ বিধি প্রণয়ন করা।

৩। ভবিষ্যত নির্বাচন পর্যবেক্ষণে কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক দলকে অনুমতি দান।

২৬ সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) কমনওয়েলথ সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, কমনওয়েলথ মহাসচিবের মধ্যস্থতায় রাজনৈতিক সংকট নিয়ে সংলাপে দুই নেত্রীর আনুষ্ঠানিক সম্মতির কথা ঘোষণা করা হয়। এ আনুষ্ঠানিক আলোচনায় সহায়তার জন্য মহাসচিবের একজন প্রতিনিধিকেও ঢাকায় পাঠানো হবে বলে ঘোষণায় বলা হয়। ২ অক্টোবর (১৯৯৪) আওয়ামী লীগ প্রধান ও বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা কমনওয়েলথ সৃষ্টিতে আন্তরিক নয়"[৮৭] এরপর ৪ অক্টোবরে সংসদউপনেতা বি. চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

কমনওয়েলথ মহাসচিবের তিনটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংলাপের আহ্বান জানিয়ে বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদের কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। ৫ অক্টোবর (১৯৯৪) কমনওয়েলথ মহাসচিব বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে মধ্যস্থতার জন্য অষ্ট্রেলিয়ার সাবেক গভর্নর জেনারেল স্যার নিনিয়ান ষ্টিফেনকে কমনওয়েলথ মহাসচিবের প্রতিনিধি ঘোষণা করে। ঘোষণায় আরও বলা হয় তিন সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করবেন স্যার নিনিয়ান ষ্টিফেন।

গ) স্যার নিনিয়ানের মধ্যস্থতায় সংলাপ ঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের উপায় খুঁজে বের করার লক্ষ্যে কমনওয়েলথ মহাসচিবের মনোনীত বিশেষ দুত (প্রতিনিধি) স্যার নিনিয়ান ষ্টিফেন ১৩ অক্টোবর (১৯৯৪) ঢাকায় আসেন। এদিকে একই দিন কমনওয়েলথ মহাসচিবের অগ্রবর্তী দুই কর্মকর্তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এক রিপোর্ট প্রস্তুত করেছেন। উক্ত রিপোর্টে বাংলাদেশের দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে "দুস্তর ব্যবধান রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। ১৪ অক্টোবর বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে জাতীয় সংসদের বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে ১৩ জন বিরোধী দলীয় নেতা কমনওয়েলথ মহাসচিবের বিশেষ দূত স্যার নিনয়ান ষ্টিফেনের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। ১৫ অক্টোবর সংসদ উপনেতা ডাঃ এ.কিউ. এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বিএনপি'র প্রতিনিধি দল স্যার নিনিয়ানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হন। উক্ত বৈঠকে সরকারি দলের নেতারা বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি প্রসঙ্গে স্যার ষ্টিফেনকে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নয় বরং গণতান্ত্রিক সরকারকে অস্থিতিশীল করে তোলার জন্যই এ দাবি করা হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

বহু প্রতিক্ষীত সংলাপ ২০ অক্টোবর (১৯৯৪) সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে সৌহাদ্য পূর্ণ পরিবেশে শুরু হয়। সংলাপের প্রথম দিনে বিএনপির পক্ষ থেকে ১৪ জন এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ১৫ জন সদস্য নিয়ে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপে সরকারী দলের নেতৃত্ব দেন সংসদ নেতা ডাঃ এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী এবং বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব করেন আওয়ামী লীগ নেতা ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ। সংলাপে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে সরকারি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে নয় বরং নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার মধ্যেই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা যায়"। আলোচনার টেবিলে সরকারি দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন শক্তিশালী করণ সংক্রান্ত সরকারি প্রস্তাবিত বিল উত্থাপন করা হয়। পক্ষান্তরে বিরোধী দল গুলোর পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি তোলা হয় এবং বৈঠকে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ রেখা' উত্থাপন করেন। স্যার নিনিয়ানের প্রচেষ্টায় প্রথম পর্বে ৫ দিন সংলাপ চলার পর সংলাপে অচলাবস্থা দেখা দেয় এবং সংলাপ ভেঙ্গে যায়। সংলাপ ভেঙ্গে যাওয়ায় সরকারি এবং বিরোধী দল একে অপরকে দায়ী করেন। বিরোধী দলের চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম এক বিবৃতিতে বলেন, "গত ৫ দিন ধরে বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদের নেতৃত্বে বিরোধী দল সুস্পষ্ট ভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছে। কিন্তু সরকারের এক গুয়েমি এবং অযৌক্তিক মনোভাবের কারণে সংলাপ ভেঙ্গে গেছে।[৮৮] পক্ষান্তরে সরকারী দলের চীপ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এক বিবৃতিতে বলেন, "তাদের জন্যই সংলাপ ভেঙ্গে গেছে। তাদের অনড় মনোভাবই এর জন্য দায়ী। আমাদের কথা ছিল স্বল্প পরিসরে আরো আলোচনা হবে। কিন্তু তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে না নেয়া হলে সংলাপ করবেনা বলে জানিয়ে দিয়ে কোন রকম আলোচনা ছাড়াই সংলাপ ভেঙ্গে গেছে বলে মন্তব্য করেন।" তিনি আরও বলেন আমরা মনে করি এখনও সংবিধান সম্মতভাবে সামাধান সম্ভব। কিন্তু আমরা এখন বিরোধী দলের মনোভাব যা বুঝেছি তাতে তারা এ সংকটের সমাধান চায়না। নির্বাচিত সরকার উৎখাত না করে তারা কোন কিছুই মেনে নেবে না। এ প্রস্তাব গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

যোগ্য নয় তারা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে লোক দেখানোর জন্য সংলাপে বসে ছিলো এবং (এক তরফাভাবে) সংলাপ ভেঙ্গে দিয়েছে"[৮৯]।

প্রথম দফা সংলাপ ভেঙ্গে যাওয়ার পরও স্যার নিনিয়ানের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ২৭ অক্টোবর (১৯৯৪) স্যার নিনিয়ান রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় দুই উপনেতার সাথে বৈঠকে মিলিত হন। প্রথম দিন চার ঘন্টা ব্যাপী আলোচনা চলার পর ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত মূলতবী হয়ে যায়। ২৯ অক্টোবর মুলতবী সভা পুনরায় শুরু হলে বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবে একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠনসহ কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্তৃত্ব প্রদানের কথা বলা হয়। কমনওয়েলথ সহ বিদেশী শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ টীম, পুলিশ, প্রশাসন এবং মিডিয়াকে নির্বাচন তদারকিতে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার জন্য একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন যা সরকার এবং বিরোধী দল মেনে চলতে বাধ্য থাকবে, ইত্যাদি রয়েছে। উক্ত প্রস্তাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে অগণতান্ত্রিক এবং সংবিধান পরিপন্থী বলে মন্তব্য করে। প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী বাদে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য মন্ত্রীদের নির্বাচনের পূর্বে পদত্যাগের বিধান করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়। বিরোধী দল এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এ জন্যে যে, এই প্রস্তাব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প হতে পারে না। বিরোধী দল অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রধানমন্ত্রীকে বহাল রেখে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। এ অচলাবস্থার মধ্যে কমনওয়েলথ মহাসচিবের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান ৩১ অক্টোবর (১৯৯৪) বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে অনুরোধ করেন যাতে সংলাপের স্বার্থে তখনই আন্দোলনের চূড়ান্ত কর্মসূচি না দেন। অন্যদিকে ১ নভেম্বর (১৯৯৪) বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা মানিক মিয়া এভিন্যুর জন সমাবেশ থেকে ঘোষণা করেন সরকার জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল না আনলে বিরোধী দল পদত্যাগ করতে বাধ্য হবে। কমনওয়েলথ বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ানের প্রচেষ্টায় যখন সংকট সমাধানের উপায় খোঁজ হচ্ছে তখন বিএনপি দলীয় সংসদ এবং তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রূপ রেখা ঘোষণা করেন। যা ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে সরকার দলীয় মনোভাবের পরিপন্থী যার ফলে ব্যারিষ্টার নাজমূল হুদা মন্ত্রী সভা থেকে অপসারিত হন। অন্তর্বর্তী সরকার গঠন নিয়ে নাজমুল হুদার প্রস্তাবটি ব্যাপকভাবে আলোচিত ও সমালোচিত হওয়ার কয়ণে প্রস্তাবটি এখানে তুলে ধরা হল ঃ

ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদার প্রস্তাব ঃ

৪ নভেম্বর (১৯৯৪) দৈনিক ইনকিলাবের সাথে এক সাক্ষাতকারে ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্পর্কে তার রূপ রেখা তুলে ধরেন। নাজমুল হুদার প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপঃ [৯০]

১। "বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার তার পূর্ণ মেয়াদ পালন করবে। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পদত্যাগের কোন প্রশ্নই উঠে না, কারণ জনগণের আস্থা এখনও খালেদা জিয়ার উপর;

২। মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসদ ভেঙ্গে যাবে এবং দেশের শাসনভার সুপ্রিম কোর্টের এপিলেট ডিভিশনের উপর ন্যস্ত হবে। প্রধান বিচারপতি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ও অন্য চার জন বিচারপতি কেবিনেট সদস্যের দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যেই একটি নির্বাচন কমিশন নিয়োগ দান করবেন এবং নব নিযুক্ত নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকান্ড অব্যাহত রাখবেন।

৪। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ হবে অনধিক ৯০ দিনের। সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার তারিখ থেকে ৪০ থেকে ৫০ দিনের মধ্যে যে কোন একটি দিনে কিংবা পর্যায়ক্রমে কয়েকটি দিনে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

৫। নবনিযুক্ত পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনেই প্রধান বিচারপতির অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এবং এপিলেট ডিভিশন তার স্বীয় দায়িত্বে পরিপূর্ণভাবে ফিরে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬। অন্তবর্তকালীন সরকারের দায়িত্ব এপিলেট ডিভিশনের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭। সকল দল মিলে সংবিধান সংশোধন করে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব ও তিনি করেন।"

এ প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার একদিন পর ৫ নভেম্বর ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা আজকের কাগজে তার রূপ রেখা সম্পর্কে বলেন, "আমার প্রস্তাব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন প্রস্তাব না, একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রস্তাব। এ প্রস্তাবে একটি নির্বাচিত সরকার পূর্ণ পাঁচ বছর মেয়াদে ক্ষমতায় থাকবে। নতুন সরকার না আসা পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হবে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের নেতৃত্বে। পাঁচ বছর মেয়াদান্তে আপনা আপনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে"।[৯১]

তথ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবে বিরোধীদল ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। সংলাপের মধ্যস্থতাকারী কমনওয়েলথ মহাসচিবের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান এবং কুটনৈতিকগণ তথ্যমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রস্তাব সম্পর্কে বিএনপি'র মনোভাব জানতে চেয়েছেন। ৮ নভেম্বর (১৯৯৪) রাজনৈতিক সংকট নিরসনে সরকারের পক্ষ থেকে তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। সরকারের এ প্রস্তাবে বলা হয়, "নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী বর্তমান মন্ত্রী পরিষদ ভেঙ্গে দেবেন এবং সংসদের রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে একটি জাতীয় সরকার গঠন করবেন। এ জাতীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, তিনি ছাড়া আরো চারজন সদস্য থাকবেন সরকারী দল থেকে। বিরোধী দলের মধ্যে থেকে প্রধান বিরোধী দল থেকে থাকবেন ৪ জন সদস্য, অন্যান্য বিরোধী দল থেকে থাকবেন ১ জন সদস্য; তারা নির্বাচন করবেন কিনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে পরবর্তী পর্যায়ে।"[৯২] কিন্তু বিরোধী দল এ প্রস্তাবও প্রত্যাখান করেন। পক্ষান্তরে সরকারী দল থেকে স্যার নিনিয়ানকে জানানো হয় যে, এটাই হচ্ছে তাদের সর্বশেষ প্রস্তাব, এর থেকে আরবেশী ছাড় দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ৯ নভেম্বর (১৯৯৪) বিএনপি'র সংসদীয় দলের সভায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা

Dhaka University Institutional Repository

করেন, "সংবিধানের বাইরে কোন কিছু বিএনপি মেনে নেবে না, করবে না। বিএনপি ক্ষমতা হারাতে পারে কিন্তু তার নীতি ও আদর্শচ্যুত হবে না।"[৯৩] ইতোমধ্যে সংকট নিরসনে নিনিয়ানের পাশাপাশি দাতাদেশ ও সংস্থা গুলোর কুটনীতিকগণ ও জোর প্রচেষ্টা চালান। কূটনীতিকগণও একটি প্রস্তাব নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। ১৩ নভেম্বর (১৯৯৪) দেশের দৈনিক পত্র পত্রিকায় সরকারী দল, বিরোধী দল ও কুটনৈতিকদের পক্ষ থেকে ৩টি প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। প্রস্তাব গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ [৯৪]

সরকারী দলের প্রস্তাব ঃ

সরকারী দলের এই প্রস্তাবটি ইতোপূর্বেকার দেয়া প্রস্তাবের সংশোধিত রূপ। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ ঃ

১। নির্বাচনী তফসীল ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী বর্তমান মন্ত্রী সভা ভেঙ্গে দেবেন এবং ক্ষুদ্র ১০ সদস্যের একটি মন্ত্রীসভা গঠন করবেন তার নেতৃত্বে।

২। মন্ত্রীসভায় উভয় পক্ষের ৪ জন করে মন্ত্রী থাকবেন, একজন অনির্বাচিত, নির্দলীয় মন্ত্রী হবেন, যিনি সকলের গ্রহণ যোগ্য হবেন। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী এক দশমাংশ অনির্বাচিত মন্ত্রীর হাতে স্বরাষ্ট্র সংস্থাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় থাকবে। মন্ত্রীসভায় বিন্যাস হবে প্রধানমন্ত্রী সরকারী দলের ৪ জন, বিরোধী দলের ৪ জন এবং একজন নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তি।

৩। প্রধানমন্ত্রীর হাতে কোন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় থাকবেনা।

৪। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার সময় এ মন্ত্রীসভা নীতি নির্ধারনী কোন কাজ করতে পারবে না।

৫। নির্দলীয় নিরপেক্ষ মন্ত্রী ছাড়া অন্যমন্ত্রীরা নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারবেন, তবে তার নিজ নির্বাচনী এলাকার বাইরে নির্বাচনী প্রচারণায় তারা অংশ নিতে পারবেন না। তবে প্রধানমন্ত্রী সর্বত্র নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬। নির্বাচন কমিশন এবং আচরণ বিধিকে আরও শক্তিশালী করা হবে।

বিরোধী দলের প্রস্তাব ঃ

১। বর্তমান রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে।

২। সংবিধানের ১৪১ (ক) ও ১৪১ (খ) জরুরী আইন বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি জরুরি আইন জারি করে সংবিধান সংশোধন না করেও এ ধরণের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে পরেন। কিন্তু সাংবিধানিক গ্যারান্টির জন্য এ ব্যাপারে সংবিধান সংশোধন করতে হবে।

৩। এ উপদেষ্টা মন্ডলী নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে কোন ভাবেই যুক্ত হবেন না।

৪। অন্যান্য বিষয়গুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ রেখায় ঘোষিত।

কূটনৈতিক উদ্যোগ ঃ

১। নির্বাচনী তফসীল ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন এবং মন্ত্রী সভা ভেঙ্গে দেবেন। সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের অন্য কোন আস্থাভাজন সাংসদ অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী হবেন।

২। উভয় পক্ষ থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকবেন। বাকী প্রস্তাব গুলো সরকারী প্রস্তাবের ৪ থেকে ৬ এর অনুরূপ হবে।

রাজনৈতিক সংকট সমাধানের উপায় হিসেবে এ তিনটি প্রস্তাবের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল সরকারী দল প্রধানমন্ত্রীকে বহাল রেখে (নির্বাহী কর্তৃত্ব বিহীন) অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে চায়। বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রীকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে নির্দলীয় উপদেষ্টার সমন্বয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে চায় এবং কূটনৈতিকদের প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির বদলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অন্য যে কোন (গ্রহণ যোগ্য) ব্যক্তির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করার কথা

Dhaka University Institutional Repository

বলা হয়। এর থেকে দেখা যাচ্ছে সরকার এবং বিরোধী দলের পার্থক্য খুব বেশি নয়। এ তিনটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে সংকট সমাধানের উপযুক্ত সময় ছিলো। যে কোন একটি পক্ষ তার অবস্থান থেকে সরে গিয়ে রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করতে পারতো। এরপরও সমঝোতা মূলক ফর্মূলার জন্য নিনিয়ানের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। স্যার নিনিয়ান দু'নেত্রীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। কূটনৈতিকরা সরকার আরও গ্রহণ যোগ্য প্রস্তাব দেয়ার অনুরোধ করে। পক্ষান্তরে স্যার নিনিয়ান সরকারি দলের প্রস্তাবের ভিত্তিতে বিরোধী দলের প্রস্তাবের অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু বিরোধী দল হঠাৎ করে তাদের অবস্থান থেকে সরে দাঁড়ায়। ১৭ নভেম্বর (১৯৯৪) সন্ধ্যায় বিরোধী দলীয় এমতা আব্দুস সামাদ আজাদ রাজনৈতিক সংকটের মধ্যস্থতাকারী স্যার নিনিয়ান ষ্টিফেনের করছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে তাদের নতুন প্রস্তাব হস্তান্তর করেন। বিরোধী দলের এ প্রস্তাবটি নিম্নরূপ ঃ

"প্রধান বিচারপতি অথবা অবসরপ্রাপ্ত কোন বিচারপতি অথবা গ্রহণযোগ্য কোন নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির নেতৃত্বে ১১ সদস্যের নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের কথা বলা হয়েছে। নিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রী ছাড়া মন্ত্রী সভার অন্য ১০ জন সদস্যের ৫ জন হবেন সংসদ নেত্রী এবং প্রধান মন্ত্রী মনোনীত নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তি এবং ৫ জন হবেন বিরোধী দলের নেত্রী কর্তৃক মনোনীত নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তি। এ মন্ত্রী সভার মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ১২০ দিন। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করা ছাড়া কোন মৌলিক নীতি নির্ধারণী কাজ এ মন্ত্রীসভা গ্রহন করতে পারবে না। নতুন নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নতুন সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। তিন মাস মেয়াদের জন্য এ বিধান করা হবে। এ জন্য সংবিধানের ১৩তম সংশোধনী আনতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন সদস্য কোন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

বিরোধী দলের ইতোপূর্বেকার প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যেতো- কিন্তু এ প্রস্তাবের ফলে দু'পক্ষের ব্যবধান আরও

Dhaka University Institutional Repository

বেড়ে যাওয়ার সম্ভবনা দেখা দেয়। তা সত্ত্বেও একই দিন সরকারি দল কুটনৈতিকদের আহ্বানে সাড়া দিতে তাদের সর্বশেষ প্রস্তাবের কিছু পরিবর্তন আনেন।

সরকারি দলের পরিবর্তিত প্রস্তাবটি হলো ঃ [৯৬]

১। প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতা থাকবেনা। তিনি হবে নাম মাত্র প্রধানমন্ত্রী।

২। সরকারি এবং বিরোধী দলের অন্তবর্তীকালীন সরকারের মন্ত্রীদের (প্রধানমন্ত্রী) হাতে কোন দফতর থাকবেনা, তারা হবেন দফতর বিহীন মন্ত্রী। একজন টেকনোক্র্যাট অদলীয় মন্ত্রী থাকবেন যার হাতে স্বরাষ্ট্র, তথ্য, সংস্থাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় থাকবে।

৩। প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্য মন্ত্রীরা নিজ নির্বাচনী এলাকার বাইরে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে পারবেন।

৪। স্পীকারের নেতৃত্বে উভয় পক্ষ থেকে ৫ জন করে সদস্য নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করণ এবং রাজনৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠিত হবে।"

বিরোধী দলের সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ রেখা ঘোষণার ১ দিন পর ১৮ নভেম্বর (১৯৯৪) চলমান ব্যাপক রাজনৈতিক সংকট সমাধানের উপায় খুজে বের করার জন্য ব্রিটিশ হাই কমিশনার, কানাডার হাই কমিশনার এবং মার্কিন রাষ্ট্রদুত বিরোধী দলীয় নেত্রীর সাথে দেখা করেন। কূটনৈতিক বৃন্দ বিরোধী দলীয় নেত্রীকে তার অবস্থান থেকে আর একটু সরে আসা যায় কিনা জিজ্ঞেস করলে বিরোধী দলীয় নেত্রী তাদের জানান, তিনি (বিরোধী দলীয় নেত্রী) ক্ষমতার ভাগাভাগিতে বিশ্বাস করেন না, তবে বিষয়টি যেহেতু রাজনৈতিক সেক্ষেত্রে একমাত্র সাংবিধানিক গ্যারান্টির মাধ্যমেই এর নিষ্পত্তি হওয়া উচিত বলে তিনি ব্যক্ত করেন। পরে কূটনৈতিক বৃন্দ সংকট সমাধানের মধ্যস্থতাকরী স্যার নিনিয়ানের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ বৈঠকে নিনিয়ানের মাধ্যমে সমঝোতার লক্ষ্যে তৃতীয় প্রস্তাব দেয়ার সম্ভাব্যতা নিয়ে মত বিনিময় করেন।

Dhaka University Institutional Repository

নিনিয়ানের সংলাপ প্রচেষ্টা ব্যর্থ ঃ

২০ নভেম্বর (১৯৯৪) কমনওয়েলথ মহাসচিবের বিশেষ দূত এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধানের মধ্যস্থতাকারী অষ্ট্রেলিয়ার সাবেক গভর্ণর জেনারেল স্যার নিনিয়ান ষ্টিফেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংলাপ প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কথা জানান। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে তিনি হতাশা ব্যক্ত করে সংলাপের সাফল্য না আসলেও রাজনৈতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব বলে মন্তব্য করেন। স্যার নিনিয়ান রাজনৈতিক সমঝোতার ব্যর্থতা প্রসঙ্গে আরও বলেন, "সংশ্লিষ্ট সবার সাথে বহু আলাপ আলোচনার পর আমি প্রস্তাব রেখেছিলাম। আমার বিশ্বাস, এ প্রস্তাবে একমত হয়ে সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করা হলে তাতে উভয় পক্ষের উদ্বেগের নিরসন হত; এতে চলতি অচলবস্থা সমধানের পথ সুগম হত"। তিনি আরও বলেন আমার বলতে আনন্দ হচ্ছে, এক পক্ষ অর্থাৎ সরকার পক্ষ আমার প্রস্তাব গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন"[৯৭]। স্যার নিনিয়ান এ সংবাদ সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে তার ৩৯ দিন অবস্থান কালে সংকট নিরসনের যে প্রচেষ্টা চালান তার অবসান ঘটে। নিনিয়ানের এ সংকট নিরসনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঘন অন্ধকার নেমে আসে। বিরোধী দল হরতাল অবরোধ ঘেরাও কর্মসূচির মাধ্যমে দাবি আদায়ে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন। স্যার নিনিয়ানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এ ধারনা জন্মে যে বাংলাদেশের এ সমস্যা সমাধানে রাজনীতিবিদরা এবং রাজনৈতিক দল সমুহ আন্তরিক নয়। নিনিয়ান তার সর্বশেষ সংবাদ সম্মেলনে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, "রাজনৈতিক সংকটের সমাধান এখনও সম্ভব"। তিনি সরকার এবং বিরোধী দলের বাইরে যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন সে প্রস্তাবে সরকারী দল ইতিবাচক সাড়া দিলেও বিরোধী দল ইতিবাচক সাড়া দেয়নি। বিরোধী দল অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কেবল মাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমেই সম্ভব বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন স্বাধীন এবং প্রভাব মুক্ত হলে ও সরকার আন্তরিক হলে যে কোন দলীয় সরকারের অধীনেও অবাধ নির্বাচন নিশ্চত করা যায়। যার প্রমান বিএনপি সরকারের অধীনে ৪টি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ও মাগুরা

Dhaka University Institutional Repository

বাদে জাতীয় সংসদের বাকি ১৫টি উপনির্বাচন। এ ১৫টি উপনির্বাচনে সরকারি দল লাভ করে ৬টি আসন, পক্ষান্তরে বিরোধী দল ৯টি আসন লাভ করে। সেখানে কমনওয়েলথ বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান সংকট নিরসনের জন্য নির্বাহী কর্তৃত্ব বিহীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেত্রীত্বে যে সর্বদলীয় সরকারের প্রস্তাব করেছিলেন তার মাধ্যমে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চয়ই নিশ্চিত করা যেত। তার ওপর সকল রাজনৈতিক দল মিলে নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী করণের মাধ্যমে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন, ভোটারদের আইডি কার্ড প্রদান, কঠোর রাজনৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন করলে নিরপেক্ষ নির্বাচন অবশ্যই আশা করা যায়। তাই বলা যায় বাংলাদেশের এ সংকট কেবল বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা। এ প্রসঙ্গে আহমেদ নূরে আলম সাপ্তাহিক বিচিত্রায় এক নিবন্ধে লিখেছেন, "তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়টি আসলে মূখ্য নয়- প্রধান হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়া। তাদের প্রধান টার্গেট খালেদা জিয়া। বেগম জিয়াকে তারা ক্ষমতায় দেখতে চান না। ক্ষমতায় বেগম জিয়া ছাড়া বিএনপি'র যে কোন ব্যক্তিকে তারা মেনে নেবেন। ফলে সংলাপ প্রক্রিয়ায় বিরোধীদের বক্তব্যে স্ববিরোধীতা লক্ষ্য করা যায়। তখন বিরোধী নেত্রীও স্ববিরোধী বক্তব্য রেখেছেন এবং এখনও রাখছেন। বিরোধী নেত্রী একবার বলেছেন, " তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সবাই হবেন নির্দলীয়" আবার বলেছেন, সরকার প্রধান প্রশ্নে সংলাপ কার্যকর হয়নি"। এর সহজ অর্থ এটা যে, অন্তর্বর্তী বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বেগম জিয়া না হলে সংলাপ কার্যকর হত"[৯৮]। সুতরাং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আন্তরিক হলে সংকট নিরসন কাল বিলম্ব হতো না। আহমেদ নূরে আলমের উক্ত নিবন্ধে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রসঙ্গে বিএনপি'র মহাসচিব ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদারের একটি বক্তব্য তুলে ধরেছেন, তিনি বলেন, "সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে বিএনপি সর্বদলীয় অর্ন্তবর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। বিরোধীদের প্রস্তাবিত সরকারে কোন জবাবদিহিতা থাকবেনা। বিএনপি'র প্রস্তাবিত সরকারের জনপ্রতিনিধিরা থাকবেন বলে এর জবাবদিহিতা থাকবে। নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত সর্বদলীয় সরকারের প্রস্তাবের প্রতি অনীহা প্রদর্শন করে বিরোধী দল নিজেদের প্রতি নিজেরাই অনাস্থা দিচ্ছে।"

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরও বলেন, "ক্ষমতাসীন দল হয়েও অন্তবর্তীকালীন সরকারের নির্বাচনকে আমরা প্রভাবিত করতে চাই না। আমরা দেশ বিদেশের নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের যেমন স্বাগত জানিয়েছি তেমনি মন্ত্রী সভার সদস্য হয়ে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ সমান সুযোগ ও অধিকার নিয়ে নির্বাচনী তৎপরতা পরিচালনা ও তদারকীতে অংশ নিন, এটাও চেয়েছি। আমাদের প্রস্তাবিত সরকার, দলীয় সরকার থাকছে না বলে নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠানের ওপর মন্ত্রী সভার কারোরই প্রভাব বিস্তারের সুযোগ নেই। ফলে চির্নাচনে কারচুপির সম্ভাবনা ও দুর হচ্ছে।"[৯৯] সুতরাং অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন যেখানে সকলের প্রত্যাশা, সে প্রত্যাশা পূরণ যেহেতু সর্বদলীয় সরকারের সামনে সম্ভব, সেহেতু বিএনপি এবং স্যার নিনিয়ানের প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংকট সমাধান হতে পারতো।

কমনওয়েলথ মহাসচিবের পুনঃ উদ্যোগ ঃ

স্যার নিনিয়ানের সংলাপ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর কমনওয়েলথ মহাসচিব এমেকা এনিয়াত্তকু বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে পুনঃউদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২৫ নভেম্বর (১৯৯৪) মহাসচিব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার কাছে ফ্যাক্স বার্তায় উল্লেখ করেছেন যে, "বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট একমাত্র আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই নিরসন হওয়া উচিত। সংঘাত এবং সহিংসতা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই বিপন্ন করবে।"[১০০] এ দিকে ৬ ডিসেম্বর বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ২৭ ডিসেম্বরের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে না নিলে ২৮ ডিসেম্বর বিরোধীদল সমূহ এক যোগে পদত্যাগ করবে। একই সাথে বিরোধী দলীয় নেত্রী ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘেরাও, পদযাত্রা, রাজপথ রেলপথ, নৌপথ অবরোধ সহ ২৮ ডিসেম্বর ঢাকায় মহা সম্মেলন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। বিরোধী দল পদত্যাগের আলটিমেটাম দেয়ায় কমনওয়েলথ মহাসচিব উদ্বেগ প্রকাশ করে ১৭ ডিসেম্বর এমেকা এনিয়াত্তকু বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশ সমূহের বাংলাদেশ দুতাবাস সমূহের কাছে

Dhaka University Institutional Repository

এক ফ্যাক্স বার্তা পাঠান। মহাসচিব উক্ত বার্তায় বলেন, "বিরোধী দল সংসদ থেকে পদত্যাগ করলে দেশের রাজনৈতিক সংকট সংঘাতের রূপ নেবে। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বিপন্ন হতে পারে।"[১০১] উক্ত বার্তায় এমেকা পুনরায় স্থগিত সংলাপ শুরু করার অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু কমনওয়েলথ মহাসচিবের এ আহবানে সরকার কিংবা বিরোধীদল কোন সাড়া দেয়নি।

বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পূর্ণাঙ্গ রূপ রেখা ঃ

বিরোধী দলের সংসদ থেকে পদত্যাগের পূর্বে মানিক মিয়া এভ্যিনিউর জনসমাবেশ থেকে আওয়ামী লীগ নেত্রী এবং সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সর্বশেষ রূপ রেখা ঘোষণা করেন। উক্ত রূপ রেখায় বলা হয়েছে[১০২]ঃ

১। "বর্তমান প্রধামন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে।"

২। সংসদ বাতিল করতে হবে এবং অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন দিতে হবে।

৩। রাষ্ট্রপতি একটি অন্তর্বর্তীকালীন, নির্দলীয়, নিরপেক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করার লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি অথবা আপীল বিভাগের একজন গ্রহণযোগ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা একজন নির্দলীয়, গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন এবং সে প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের ৫৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে তার কার্য পরিচালনা করবেন।

৪। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেননা এবং কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন এবং নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এমন ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রী সভা গঠন করবেন।

৫। এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মূল দায়িত্ব হবে একটি অবাধ, সুষ্ঠু নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা এবং সংবিধানে প্রদত্ত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়া শুধু মাত্র জরুরি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা।

Dhaka University Institutional Repository

৬। সংসদ নির্বাচনের অব্যবহিত পর সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ৩ দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অবলুপ্ত হবে।

৭। আগামী সাধারণ নির্বাচনের পর গঠিত নতুন সংসদ একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনীর মতো একটি সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে উপরোক্ত ব্যবস্থাকে আইন সম্মত করবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে আরও অন্তত তিনটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকে সংবিধানে সন্নিবেশিত করবে।" বিরোধী দলের এ রূপ রেখা ঘোষণায় সরকারী দলের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রস্তাব থেকে আবারও ব্যবধান সৃষ্টি হলো। ইতোমধ্যে বিরোধী দল সংসদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণার আলটিমেটামের ১দিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী পূর্ণ মেয়াদ ক্ষমতায় থাকার পর বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোর আওতায় পদত্যাগে সম্মত হয়েছেন। বহুল প্রচারিত দৈনিক আজকের কাগজে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, "মৌখিক ভাবে বিএনপি যে প্রস্তাব দিয়েছে তাতে নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র দাখিলের পর প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের কথা বলা হয়েছে। প্রধামন্ত্রী পদত্যাগের পর রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। উভয় পক্ষ থেকে ৫ জন মনোনীত প্রতিনিধি নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে। যারা অবশ্যই সাংসদ হবেন। সূত্র মতে এ প্রস্তাবের জন্য কোন সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হবে না। যারা অবশ্যই সংসদ কার্যপ্রণালী বিধির ১৪৭ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মাধ্যমে এটা অনুমোদিত হবে সর্বসম্মত ভাবে।[১০৩] উক্ত প্রতিবেদনে অবশ্য বলা হয় বিরোধী দল এ প্রস্তাব লিখিত আকারে চায়। কিন্তু এর ১ দিন পর ২৮ ডিসেম্বর (১৯৯৪) বিরোধী দল নতুন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ রেখা ঘোষণা করে সংসদ থেকে পদত্যাগ করলে রাজনৈতিক সংকট আরও ঘনিভূত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দলের সংসদ থেকে পদত্যাগ ঃ

বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নেয়ার ইতোপূর্বে সরকারকে যে সময়সীমা বেধে দিয়েছিল সে সময়সীমা অতিক্রম ১ দিন পর ২৮ ডিসেম্বর (১৯৯৪) রাত সোয়া ৯ টায় আওয়ামী লীগ নেত্রী এবং জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পদত্যাগ পত্র জমা দেন। উক্ত তিনটি দল ছাড়াও পদত্যাগ পত্র জমাদেন এনডিপি'র সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী। ঐ দিন মোট ১৪৫ জন সাংসদ পদত্যাগ পত্র জমাদেন। আওয়ামী লীগ ২ জন সাংসদ পরবর্তীতে তাদের পদত্যাগ পত্র জমাদেন। এর ফলে পদত্যাগী সাংসদের সংখ্যা দাড়ায় ১৪৭ জন। উল্লেখ্য যে বিরোধী দলীয় সাংসদগণ ১৯৯৪ সালের ১ মার্চ জাতীয় সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেন এবং মাগুরা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে তাদের ওয়াক আউট দীর্ঘস্থায়ী বয়কটে পরিণত হয় এবং দীর্ঘ ৯ মাস ২৮ দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে সংসদ বয়কটের পর সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। বিরোধী দল পদত্যাগের প্রধান কারণ হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি না মানাকে উল্লেখ করেছেন। জাতীয় সংসদ থেকে বিরোধী দলের সাংসদদের পদত্যাগকে জাতির জন্য দূর্ভাগ্যজনক হিসেবে আখ্যায়িত করে বিএনপির মহাসচিব ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার বলেন, "তাদের পদত্যাগ রোধের জন্য আমরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারেও রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু মুহূর্তে মুহূর্তে প্রস্তাব বদল করে তারা পদত্যাগ করে প্রমান করেছে, তারা গণতন্ত্র ধ্বংস করতে চায়।"[১০৮] বিরোধী দলের জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগের ১ দিন পর ২৯ ডিসেম্বর (১৯৯৪) মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরের এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলীয় সাংসদদের উদ্দেশ্যে বলেন, "নির্বাচনের ৩০ দিন আগে আমি মন্ত্রীসভা সহ পদত্যাগ করবো। আপনার সিদ্ধান্ত পাল্টান। প্রধামন্ত্রী আরও বলেন, "আপনারা যা করেছেন তা ঠিক নয়। আপনারা চিন্তাভাবনা করে দেখুন এখনও সময় আছে। আপনারা চাইলে এখন ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন। আমরা পদত্যাগ করে নির্বাচন করতে রাজি আছি।" [১০৫]

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দল জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করায় উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে ১ জানুয়ারী (১৯৯৫) জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বেতারও টেলিভিশন ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা করেন, "গণতন্ত্র, সংবিধান প্রক্রিয়ায় সমুন্নত রাখতে আমরা সচেষ্ট থাকবো। গণতন্ত্র সংবিধানেও সমৃদ্ধিই হচ্ছে আমাদের প্রথম এবং শেষ কথা।" প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবির প্রেক্ষিতে ইতোপূর্বেকার বক্তব্য পুনরুল্লেখ করে বলেন, "গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা এবং সমঝোতার স্বার্থে একটি নির্বাচিত সরকার হওয়া সত্ত্বেও আমরা প্রস্তাব দিয়েছি যে, আমি এবং আমার সরকার পূর্ণ মেয়াদ শেষে আগামী সাধারণ নির্বাচনের ৩০ দিন আগে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব থেকে সরে দাড়াবো, কিন্তু তারা আমাদের সে প্রস্তাবও মানতে রাজি হয়নি। যে বিষয় নিয়ে বিরোধীদলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংসদ ত্যাগ করেছেন, তা নিষ্পত্তির জন্য আমাদের আন্তরিকতার অভাব ছিলো না এবং এখনো নেই। তারা যা চেয়েছিলো সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে আমরা তার কোনটাই করতে বাকি রাখিনি"। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "নির্বাচন প্রক্রিয়াকে অধিকতর সুষ্ঠু এবং অবাধ করার লক্ষ্যে আমরা জাতীয় সংসদে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) বিল '৯৪ এবং ভোটার তালিকা (সংশোধন) বিল ১৯৯৪ পাস করেছি। এ বিল দু'টি পাসের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে এমনভাবে শক্তিশালী করা হয়েছে, যে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে কমিশনই এখন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোন দল, ব্যক্তি বা প্রশাসনের প্রভাব বিস্তারের এখন আর বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। জাল ভোট বন্ধের জন্যে ভোটারদের পরিচয়পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ফলে ভোটাররা নিজেদের ভোট নিজেরাই দেয়ার নিশ্চয়তা পাবেন।" নির্বাচনের ৩০ দিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের ঘোষণা সত্ত্বেও বিরোধীদল প্রধানমন্ত্রীর আহবানে সাড়া দেয়নি। ফলে বিরোধী দলের পদত্যাগের কারণে রাজনৈতিক সংকটের সমাধান হয়নি বরং আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি এবং বিরোধী দলের গণপদত্যাগ পরবর্তীতে রাজনৈতিক সংকটকালে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ১০ জানুয়ারী (১৯৯৫) আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে উপদেষ্টা মন্ডলী গঠনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "If he (the president of the republic) is at all asked by both Khaleda Zia and Sheikh Hassina to assume powers to hold election's, he (the president) can not. The constitution has to be amended and that too after holding a referendum in favour of their decession to change the basic character of the Bangladesh countitution.[106]

সংসদ থেকে পদত্যাগ সম্পর্কে রীটপিটিশন ঃ

বিরোধী দলের ১৪৭ জন সংস্যদের গণপদত্যাগকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দু'টি রীট পিটিশন দায়ের করা হয়। উক্ত দুটি পিটিশনের প্রেক্ষিতে আদালত পরস্পর বিরোধী আদেশ প্রদান করেন। এ্যাডভোকেট তওফিক এর এক রীট পিটিশনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি হামিদুল হকের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ ১৮ জানুয়ারী (১৯৯৫) স্পীকারকে ১০ দিন বিরোধী দলের সদস্যদের পদত্যাগ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত না দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ডিভিশন বেঞ্চ বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা, জাতীয় পার্টি সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা মওদুদ আহম্মেদ এবং জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ওপর কারণ দর্শাও নোটিশে বিরোধী দলের সাংসদদের একযোগে পদত্যাগ কেন অবৈধ, সংবিধান পরিপন্থী এবং বে-আইনী ঘোষিত হবে না, পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

অপর দিকে একই দিন বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের পদত্যাগ সম্পর্কে স্পীকার কর্তৃক সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা না নেয়ায়

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাডভোকেট আলাউদ্দিন কর্তৃক দায়েরকৃত অপর এক রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টে হাইকোর্ট বেঞ্চ জাতীয় সংসদের স্পীকার এবং সংসদ সচিবের ওপর কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করেন। স্পীকারের ওপর এ মর্মে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করা হয় যে, কেন স্পীকার বিরোধী দলের পদত্যাগ পত্র সম্পর্কে সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন না তা জানাতে বলা হয়েছে। সংসদ সচিবের ওপরও এই মর্মে নোটিশ জারি করা হয়েছে যে কেন বিরোধী দলের পদত্যাগ সম্পর্কে অবিলম্বে গেজেটে প্রকাশ করা হবে না।

বিরোধী দলের গণপদত্যাগ সম্পর্কে উক্ত দু'টি রীটের পরস্পর বিরোধী কারণ দর্শাও নোটিশের প্রেক্ষিতে উক্ত দু'টি রীট আবেদন শুনানির জন্য প্রধান বিচারপতি ৩ জন বিচারপতির সমন্বয়ে বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন করেন। এ তিন জন বিচারপতি হলেন, বিচারপতি মাহমুদুর রহমান, বিচারপতি কাজী এবাদুল হক এবং বিচারপতি এম,এ, করীম। পদত্যাগ সম্পর্কিত দুইটি রীটের শুনানি উক্ত বৃহত্তর বেঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ছ'সপ্তাহের বেশী সময় ধরে ১৪৭ জন সংসদ সদস্যের পদত্যাগ সম্পর্কে দায়েরকৃত দুটি রীটের শুনানি শেষে ২৩ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৫) দু'টি পৃথক রীট আবেদনই আদালত খারিজ করে দেয়। তিনি সদস্য বিশিষ্ট সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বেঞ্চ সর্বসম্মতি ক্রমে দুইটি রীটের রায় প্রদান কালে বলেন, "মামলা দুইটির বিচার্য বিষয় সম্পর্কে শুনানি গ্রহণের এখতিয়ার আদালতের আছে। কিন্তু উভয় রীটের আবেদনকারীদের উক্ত মামলা দায়ের করার জন্য কোন আইনগত অধিকার বা ভিত্তি (লোকাস ষ্ট্যান্ডি) না থাকায় মামলা দু'টি গ্রহণযোগ্য নয়।"[১০৭] এছাড়া আদালত সংবিধানের ১২৩ (৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদের শূণ্য আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যে বাধ্যতামূলক ৯০ দিনের যে সময় সীমা রয়েছে তা থেকে মামলা চলাকালীন সময়কে বাদ দেয়ার জন্যেও নির্দেশ দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পদত্যাগ সম্পর্কে স্পীকারের সিদ্ধান্ত ঃ

পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১৪৭ জন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যের গত ২৮ ডিসেম্বর (১৯৯৪) গণপদত্যাগের প্রক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রীট আবেদন দু'টি হাইকোর্ট বেঞ্চ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৫) খারিজ হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী পদত্যাগ সম্পর্কে তার রুলিং দেন। স্পীকার তার রুলিং এ পদত্যাগ পত্র সমূহ গ্রহণ যোগ্য নয় বলে উল্লেখ করেন। বিরোধী দলীয় সংসদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ না প্রসঙ্গে স্পীকার তার রুলিং এ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। স্পীকার দীর্ঘ ২৯ পৃষ্ঠার রুলিং এ বলেছেন, "গত ২৮শে ডিসেম্বর আমার কাছে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং জামায়াতের সংসদীয় দলের নেতা মহিউর রহমান নিজামী তিনটি 'ফোল্ডার' দেন। তারা আমাকে জানান যে, কার্যপ্রণালী বিধির ১৭৭ ধারা অনুযায়ী এ গুলো পরীক্ষা করতে হবে। "স্পীকার তার রুলিং এ বলেন, জামায়াতের সদস্যদের নাম ধরে যখন তিনি ডাকেন তখন কেউই উপস্থিত ছিলেন না। একমাত্র সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ছাড়া কেউই ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে পদত্যাগ পত্র দেননি। স্পীকার তার সিদ্ধান্তে বলেন, "আওয়ামী লীগের পদত্যাগ গুলোর মধ্যে মোস্তাফিজুর রহমান ২৮ ডিসেম্বর তারিখে দেয়া একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, তিনি কোন পদত্যাগ পত্র পেশ করেননি। আখতারুজ্জামান এখন পলাতক রয়েছেন। এ জন্য এ দু'টি পদত্যাগ পত্র গ্রহণ যোগ্য নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। স্পীকার এই ভাবে মেজর (অবঃ) মাহমুদুল হাসানের পদত্যাগ পত্র ও গ্রহণ যোগ্য নয় বলে উল্লেখ করেন। স্পীকার পদত্যাগ পত্র গুলো দু'টি বিষয়ের উপর নিস্পত্তি করেছেন বলে তার রুলিং এ উল্লেখ করেছেন।

এর একটি হলো-পদত্যাগ পত্র গুলো আইন সম্মত হয়েছে কি না?
অন্যটি হলো- একযোগে পদত্যাগ বিধি সম্মত কি না?

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রেক্ষিতে স্পীকার পাকিস্তান, জাপান, কানাডা, শ্রীলঙ্কার উদাহরণ দেন এবং বলেন "একটি পদত্যাগ পত্র বৈধ কিনা তা নির্ধারণ করতে গেলে প্রথমে দেখতে হবে, পদত্যাগের স্বাক্ষর যথাযথ কিনা? পদত্যাগী সাংসদ এটা স্বহস্তে লিখেছেন কিনা? এবং তাতে কোন কারণ উল্লেখ করা হয়েছে কিনা? স্পীকার বলেন," শেখ হাসিনা, মিজানুর রহমার চৌধুরী, মতিউর রহমান নিজামী এবং সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী ছাড়া কেউই ব্যক্তিগতভাবে পদত্যাগ পত্র আমার হাতে দেননি। এরশাদের পদত্যাগপত্র যথাযথভাবে জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এসেছে। কাজেই এ ৫ জন স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বাকি ১৩৯ জনের স্বাক্ষর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দাবি রাখে। এগুলো মিলিয়ে দেখে স্পীকার ১২১ টি সঠিক ভাবে স্বাক্ষরিত বলে বিবেচিত করেছেন। কিন্তু সংসদ সচিবালয় থেকে ১৮ জনের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে তাদের পদত্যাগ পত্রগুলো স্বেচ্ছায় বলে জেনেছেন এরপর স্পীকার কার্যপ্রণালী বিধির ১৭৭ ধারা উল্লেখ করে বলেন," ১৪১ জন সংসদ তাদের পদত্যাগ পত্রে" নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি না মানায় পদত্যাগ করেছেন বলে উল্লেখ করেন। এরশাদ সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং দবিরুল ইসলাম কিছু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করলেও আমি আমার ওপর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কারণ ছাড়াই এ তিনটি পদত্যাগপত্র দেয়া হয়েছে বলে মনে করছি। কাজেই এ তিনটি পদত্যাগ পত্র এ বিচারে আমি গ্রহণ করছি। বাকি গুলো গ্রহণ যোগ্য নয়"। কিন্তু সংসদ থেকে এক যোগে পদত্যাগের সংবিধান সম্মত না হওয়ায় স্পীকার শেষ পর্যন্ত ঐ তিনটি পদত্যাগ পত্রও গ্রহণ করেননি। স্পীকার তার রুলিং এ একযোগে পদত্যাগের সাংবিধানিক প্রশ্ন নিষ্পত্তি করেন। স্পীকার বিরোধী দলের দীর্ঘ আন্দোলন এবং সংসদ বর্জনের পটভূমি ব্যাখ্যা করে বলেন,"এটা আমাদের সকলেরই জানা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা আমাদের সংবিধানে নেই, কোন গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানে নেই। '৯১ এর ২৭ ফেব্রুয়ারী নির্বাচনে কোন প্রার্থী কোনো দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলেনি। যদি তাই হয় তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি কেবল বে-আইনী নয়, যা হাইকোর্ট বলেছে, এ দাবিতে কোন সাংসদের পদত্যাগের

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার নেই। তাহলে তা জনগণের কাছে করা শপথের বরখেলাপ হবে।" স্পীকার আরও বলেন, "সংসদ থেকে পদত্যাগের অনুচ্ছেদকে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। তাহলে দেশের পরবর্তী সংসদগুলোকে একই সংকটে পড়তে হবে।"[১০৮]

স্পীকার কর্তৃক বিরোধী দলের গণপদত্যাগ গৃহীত না হওয়ায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, "বিরোধী দলের ১৪৭ জন সাংসদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ না করার কোন এখতিয়ার স্পীকারের নেই। সাংবিধানিক ভাবেই পদত্যাগ করার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করে। এ স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার সংবিধান কাউকে দেয়নি"।[১০৯] স্পীকারের রুলিং সম্পর্কে সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকার শামীম আহম্মেদ এক নিবন্ধে উল্লেখ করেন,"Speaker Sheikh Razzak Ali however defended his ruling sying that, What he had done was for the interest of democracy, "My Conscience is clear—my ruling is legal and constitutional."[১১০] কাজেই স্পীকার তার রুলিং গণতন্ত্রের স্বার্থে আইন সম্মত এবং সাংবিধানিক ভাবেই দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পদত্যাগ সম্পর্কে স্পীকারের সিদ্ধান্তের পর বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের সংসদে ফিরে এসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকটের সমাধানের আহবান জানান। প্রয়োজনে তিনি বিরোধী দলীয় নেত্রীর সঙ্গেও আলোচনায় বসতে রাজি আছেন বলে জানান। পঞ্চম জাতীয় সংসদের অষ্টাদশ অধিবেশনের সমাপনী বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "সংসদ থেকে পদত্যাগ করে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যাবে না"।

বিরোধী দলের পদত্যাগ পরবর্তী রাজনৈতিক সংকট ঃ

স্পীকার কর্তৃক বিরোধী দলের পদত্যাগ পত্র গৃহীত না হওয়া সত্ত্বে ও রাজনৈতিক সংকটের কোনো সমাধান হয়নি। ১৮ এপ্রিল (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাজনৈতিক সংকট নিয়ে বিরোধী দলের সাথে আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করার ১ দিন পর স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেত্রীর শীর্ষ বৈঠকের প্রস্তাব

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। স্পীকার অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গণতন্ত্র এবং দেশের স্বার্থে এ রাজনৈতিক সংকট সমাধান করা উচিত। ২২ এপ্রিল (১৯৯৫) আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিলেই আলোচনা হতে পারে। সুতরাং বিরোধী দল শর্ত আরোপ করায় স্পীকারের উদ্যোগ সফল হয়নি। প্রশ্ন হল বিরোধী দলের দাবি অনুযায়ী এবং বিরোধী দলের প্রস্তাবিত ফর্মূলা অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক লক্ষ্যে উভয়কেই কিছু না কিছু ছাড় দিতে হয় তাহলেই সংকটের সমাধান সম্ভব অন্যথায় নয়। এরপর প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনের ৩০ দিন আগে পদত্যাগের ঘোষণা কে প্রত্যাখান করে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ২৮ এপ্রিল (১৯৯৫) চট্টগ্রামের এক জনসভায় বলেন, "Begum Zia must step down 90 day's before the polls by dissolving parliament according to the constitution."[১১১]

সরকার এবং বিরোধী দলের বিবৃতি এবং পাল্টা বিবৃতি ও বিরোধী দলের হরতাল আন্দোলনের মধ্যে সময় অতিবাহিত হতে থাকে। এর মধ্যেই ১৯ জুন (১৯৯৫) বিরোধী দলের ১৪০ জন সংসদ সদস্যের জাতীয় সংসদের বৈঠকে অনুস্থিত একাধিক্রমে ৯০ দিন পূর্ণ হয়।

১৯ জুন (১৯৯৫) বিরোধী দলের সাংসদের জাতীয় সংসদে অনুপস্থিত একাদিক্রমে ৯০ দিন পূর্ণ হয়। ১৯৯৪ সালের ১ মার্চ বিরোধী দলের সদস্যগণ জাতীয় সংসদের অধিবেশন থেকে 'ওয়াক আউট' করেন। এর পর তত্তাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচির পাশাপাশি সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখেন। বিরোধী দলীয় সাংসদের এই সংসদ বয়কট তথা অনুপস্থিতি একাধিক্রমে ৯০ দিন পূর্ণ হলে, বিরোধী দলীয় সদস্যদের অনুপস্থিতির ৯০তম দিবসে বিএনপি দলীয় সাংসদ ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা জাতীয় সংসদের অধিবেশনে 'পয়েন্ট অব অর্ডারে' দাড়িয়ে, কার্যপ্রনালী বিধির ১৭৯ অনুযায়ী অনুপস্থিত সদস্যদের পক্ষে একটি ছুটির দরখাস্ত করেন। ছুটির দরখাস্ত প্রসংগে জাতীয় সংসদে ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা বলেন, "সংবিধানের ৬৭ (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী টানা ৯০

Dhaka University Institutional Repository

কর্ম দিবস অনুপস্থিত থাকলে তাদের আসন শূণ্য হয়ে যাবে। যেহেতু একটি বিশেষ অবস্থার কারণে তারা সংসদে আসতে পারছেনা তাই কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী আমি ছুটির আবেদন করছি।"[১১২] কিন্তু ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদার এ ছুটির আবেদনটি কার্যপ্রনালী বিধির শর্ত পূরণ না হওয়ায় স্পীকার শেখ য়াজ্জাক আলী ২২ জুনের সংসদের কার্য দিবসে নাকচ করে দেন। বিএনপি'র মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ব্যারিষ্টার সালাম তালুকদার এবং সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী ব্যারিষ্টার আমিনুল হক অবশ্য অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বর্জনের বিষয়টি যেহেতু সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে নিস্পত্তির অপেক্ষায় আছে, সেহেতু এ বিষয়ে এখনও কোন সিদ্ধান্ত না দেয়ার অনুরোধ করেন।

বিএনপি'র নেতৃস্থানীয়দের পক্ষ থেকে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের অনুপস্থিতির বিষয়টি ব্যাখার জন্য সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের পরামর্শের জন্য পাঠানোর কথা বলেছেন। স্পীকার এ ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নিতে আগ্রহী নন। অবশেষে বিএনপির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জুলাই (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিরোধী দলের অনুপস্থিত সংসদ সদস্যদের কি হবে এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যা চাওয়ার জন্যে রাষ্ট্রপতিকে সুপারিশ করেছেন। সুবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্টপতি তাহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শ দান করিয়াছেন কিনা এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবে না।"[১১৩]

Dhaka University Institutional Repository

সুপ্রীম কোর্টে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স ঃ

প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস বিরোধী দলের অনুপস্থিত সংসদ সদস্যদের আসন শূণ্য হবে কিনা, এ ব্যাপারে ৪ জুলাই (১৯৯৫) সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরামর্শ চেয়েছেন, রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স লেটারটি ঐ দিনই বিকালে বিশেষ বাহক মারফত প্রধান বিচারপতির বাসভবনে পাঠানো হয়। প্রধান বিচারপতি এটি এম আফজল ঐ দিন ৪টা ১০ মিঃ রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের বিষয়টি জাতীয় সংসদে অবহিত করেন এবং সুপ্রীম কোর্টের জবাব না পাওয়া পর্যন্ত স্পীকারকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখার অনুরোধ করেন। স্পীকার আইন মন্ত্রীর প্রস্তাব ভোটে দিলে সংসদ কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়। ফলে সুপ্রিম কোর্টের জবাব দানের পূর্ব পর্যন্ত স্পীকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত থাকে।

রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ (ব্যাখ্যা পরে দেয়া আছে) অনুযায়ী তার রেফারেন্স লেটারে ৪টি প্রশ্নের মাধ্যমে যা জানতে চেয়েছেন সেগুলো হলো ঃ [১১৪]

১) সকল দলের একজন মন্ত্রীর বক্তব্যে আপত্তি জানিয়ে সকল বিরোধী দলের ওয়াক আউট এবং পরবর্তীতে সংসদে ফিরে না আসার সময় কাল কি সংসদের অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিতি বিবেচিত হবে, যার ফলে সংবিধানের ৬৭(১) (খ) অনুযায়ী ঐ আসন গুলো শূণ্য হয়ে যাবে?

২) সকল বিরোধী সাংসদদের সংসদ বয়কট কি সংসদের অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিতি বলে বিবেচিত হবে যার ফলে সংবিধানের ৬৭(১) (খ) অনুযায়ী সংসদে তাদের আসন গুলো শূণ্য হয়ে যাবে?

৩) একাধিক্রমে ৯০টি কার্য দিবস গণনায় ক্ষেত্রে সংবিধানের ৬৭(১) (খ) অনুচেছদের অর্থের সঙ্গে ১৫২ (১) অনুচেছদে বর্ণিত অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়কে যুক্ত করা হবে না কি বাদ দেয়া যাবে?

৪) অনুপস্থিতির সময় গণনা ও নির্ধারণের যথাযথ অধিকার স্পীকার ও সংসদের রয়েছে কিনা?

Dhaka University Institutional Repository

৬ জুলাই (১৯৯৫) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির পাঠান রেফারেন্সের ব্যাপারে শুনানি ও জবাব দেয়ার জন্য এটর্নী জেনারেল এর সহায়তায় পদ্ধতি নির্ধারণ করেন এবং রেফারেন্সের ওপর মতামত রাখার জন্য ৭ জন বিশিষ্ট আইনজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানান। আমন্ত্রিত আইনজীবীগণ হলেন, এটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট আমিনুল হক, সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী সমিতির সভাপতি টিএইচ খান, এডভোকেট এসআরপাল, ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহম্মেদ, ডঃ কামাল হোসেন, খন্দকার মাহবুব উদ্দিন এবং ব্যারিষ্টার রফিকুল হক। এছাড়াও সরকারি নিযুক্ত কৌশলি ব্যারিষ্টার আশরারুল হোসেন। ঐ দিন প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির পাঠান এ রেফারেন্সের ওপর শুনানির জন্য গ্রহণ করে এর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "রাজনৈতিক ঝগড়া মেটানোর জায়গা আদালত নয়, এগুলো রাজনৈতিক দলের বিষয়, আমাদের কাজ শুধু আইনের ব্যাখ্যা দেয়া"।[১১৫]

উক্ত রেফারেন্সটির শুনানি ও জবাব দেয়ার জন্য প্রধান বিচারপতি এটিএম আফজালের নেতৃত্বে আপীল বিভাগের অন্যান্য প্যানেল বিচারপতিগণ হলেন, বিচারপতি মোস্তফা কামাল, বিচায়পতি লতিফুর রহমান, বিচারপতি আব্দুর রউফ ও বিচারপতি ইসমাইল উদ্দীন সরকার।

১৬ জুলাই (১৯৯৪) রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের ওপর শুনানী শুরু হয় এবং এ শুনানি চলে ২৪ জুলাই পর্যন্ত। ছয় দিন ব্যাপী শুনানীতে সুপ্রীম কোর্টে মনোনীত ৭ জন আইনজ্ঞের মধ্যে ৬ জন আইনজ্ঞ তাদের বক্তব্য পেশ করেন। এটর্নী জেনারেল এডভোকেট আমিনুল হকের ১৩ জুলাই আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি বক্তব্য রাখতে পারেননি। ব্যারিষ্টার আশরারুল হক সরকারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন। সুপ্রীম কোর্টের মনোনিত ৬ জন আইনজীবী ছাড়াও স্বপ্রনোদিত হয়ে ৫ জন আইনজীবী রেফোরেন্সের ওপর বক্তব্য রাখেন, এরা হলেন, ডঃ এম জহির, এ্যাডভোকেট মাকসুদুর রহমান, এ্যাডভোকেট শুধাংশু শেখর হালদার, এ্যাডভোকেট ইয়ার আহমেদ এবং এ্যাডভোকেট এবিএম নূরুল ইসলাম।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের ওপর অনুষ্ঠিত শুনানীতে অংশ গ্রহণকারী সরকার মনোনীত আইনজীবী, সুপ্রীম কোর্টের মনোনীত ৬ জন এমিকিউরে, স্বপ্রনোদিত আইনজীবীগণ ও প্যানেল বিচারপতিদের মূল বক্তব্য তুলে ধরা হল ঃ

ব্যারিষ্টার আশরারুল হোসেন ঃ

রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের শুনানির ১ম দিনের শুরুতে এবং শুনানীর দ্বিতীয় দিনে (১৬ ও ১৭ জুলাই, ১৯৯৫) সরকার পক্ষের নিয়োজিত কৌশলী ব্যারিষ্টার আশরারুল হোসেন যে বক্তব্য রাখেন তার সংক্ষিপ্ত রূপ হল ঃ[১১৬]

- অনুপস্থিতি আর বর্জন এক নয়। সংসদ বর্জন সংসদে অনুপস্থিতি বলে গণ্য হবে না;
- রাষ্ট্রপতির পাঠানো রেফারেন্সে আইনের প্রশ্ন রয়েছে। তাই সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইনের প্রশ্ন জড়িত থাকায় রেফারেন্সটি বিবেচনা যোগ্য;
- রাষ্ট্রপতি পাঠানো ৪টি প্রশ্নের সবগুলোতে ৩/৪ রকমের ব্যাখ্যা আছে, কোর্ট তার মতামত বলবে।
- টানা ৯০ দিন মানে, অধিবেশন শুরু হয়ে বিরামহীনভাবে চলবে।
- অনুপস্থিত বর্জন ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যাখ্যা দেয়ার এখতিয়ার সুপ্রীমকোর্টের।

এ্যাডভোকেট এস.আর.পাল ঃ

শুনানীর ১ম এবং দ্বিতীয় দিনে (১৬ ও ১৭ জুলাই, ১৯৯৫) কোর্ট মনোনীত আইনজীবীদের মধ্যে এ্যাডভোকেট এস.আর.পালের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হল ঃ[১১৭]

- এ রেফারেন্স রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূর্ণ কিনা দেখতে হবে;
- যদিও রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সে রাজনৈতিক বিষয় আছে কিন্তু এর সঙ্গে আইনের ব্যাখ্যা জড়িত থাকে, তাই এ রেফারেন্সে সুপ্রীম কোর্ট মতামত দিতে পারে;

Dhaka University Institutional Repository

• তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিরোধী দল সংসদ বর্জন এটা সংবিধানের ৬৭ (১) (খ) অনুযায়ী অনুপস্থিত হবেনা;

• টানা ৯০ দিন এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক;

• অনুপস্থিতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার সংসদের।

ড. কামাল হোসেন ঃ

প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. কামাল হোসেনের শুনানীর ১ম এবং ৪র্থ দিনের (১৬ ও ১৯ জুলাই, ১৯৯৫) প্রদত্ত বক্তব্যের সারমর্ম তুলে ধরা হল ঃ[১১৮]

• রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের ব্যাপারে মতামত দেয়া না দেয়ার অধিকার সুপ্রিম কোর্টের আছে।

• সংসদে বিরোধী দলের আসন শূন্য হবে কিনা, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ স্পীকার;

• স্পীকার সংসদ কর্তৃক সিদ্ধান্তের আগেই সুপ্রিম কোর্টের মতামতের জন্য পাঠানো সঠিক হয়নি;

• সংসদের ব্যাপারে নির্বাহী বিভাগের মতামত চাওয়া যৌক্তিক নয়। এতে তিনটি বিভাগীয় স্বাতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হয়;

• কোনটা বয়কট এবং কোনটা ওয়াকআউট সে ব্যাপারে রেফারেন্সে পর্যাপ্ত তথ্য নেই;

• রেফারেন্সটি মতামত দেয়ার বিবেচনা যোগ্য নয়।

তিনি আরও বলেন, সংবিধান সত্যিকারভাবে সংকটের মুখে। আদালত একটি রেফারেন্সের ব্যাপারে পরামর্শ দিবেন কিনা, এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার আছে। তিনি রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সটি ফেরৎ পাঠানোর পক্ষে ৫টি যুক্তি দেখান, এগুলো হলোঃ

- এ বিষয়টি কার্যপ্রনালী বিধি অনুযায়ী স্পীকার সিদ্ধান্ত নেবেন;
- স্পীকারের কাজে হস্তক্ষেপ;
- ক্ষমতার পৃথকীকরণের সুস্পষ্ট লংঘন;
- এ সংক্রান্ত একটি মামলার ক্ষতি করবে; ও
- আদালতের মর্যাদাহানি করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ ঃ

শুনানীর ১ম, ৩য় এবং ৪র্থ দিবসে (১৬, ১৮ এবং জুলাই ১৯৯৫) ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ যে বক্তব্য রাখেন তা সংক্ষিপ্ত তুলে ধরা হল ঃ[১১৯]

- এটা একটা ব্যতিক্রম ধর্মী রেফারেন্স;
- বিরোধী দলের মতামতের জন্য নোটিশ দেয়া প্রয়োজন। তারা আসবে কিনা সেটা তাদের বিষয়;
- রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সে তথ্যের ফাঁক আছে;
- রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের ৪টি প্রশ্ন বিমূর্ত;
- সংসদের সিদ্ধান্তের পূর্বে সুপ্রিম কোর্টের মতামত দেয়া ঠিক নয়;
- রেফারেন্সের প্রথম দু'টি প্রশ্ন আইনগত ও তথ্যগত; তথ্যগত বিষয়ে মতামত দেয়ার কোন এখতিয়ার আদালতের নেই;
- রেফারেন্সে তথ্যগত ত্রুটির কারণে এ দু'টো প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব না;
- বয়কট, ওয়াক আউটের যে অর্থই দেয়া হোক তা অনুপস্থিত;
- একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক দিবসে কেবল অধিবেশন দিবস গুলোই ধরতে হবে;
- আসন শূন্য হবে কিনা, অনুপস্থিতি কিভাবে গণনা হবে সেটা স্পীকারের বিষয়।

টি এইচ খান ঃ

শুনানির ২য় এবং ৩য় দিবসে (১৭ ও ১৮ জুলাই, ১৯৯৫) সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাডভোকেট টি. এইচ খান শুনানিতে অংশ গ্রহণ করে যে বক্তব্য রাখেন তা হল ঃ[১২০]

- আইনের ব্যাখ্যা দেয়ার এখতিয়ার সুপ্রীম কোর্টের;
- বয়কট হলো প্রতিবাদ, আর অনুপস্থিতি হলো প্রতিবাদহীন, দু'টো এক জিনিষ নয়;

Dhaka University Institutional Repository

• ক্ষমতায় না গেলেই সংসদ বর্জন করতে হবে এমন নজির পৃথিবীর কোথাও নেই।

• একযোগে সংসদ বর্জনের কথা সংবিধান প্রণেতারা চিন্তা করেননি;

• কেউ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং সংবিধানকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে না।

• ওয়াক আউট বা বর্জন অনুপস্থিত বলে গণ্য হবে না।

খন্দকার মাহবুব উদ্দিন ঃ

শুনানির ৪র্থ এবং ৫ম দিবসে (১৯ ও ২০ জুলাই, ১৯৯৫) আলোচনায় অংশ নিয়ে এ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দিন যে বক্তব্য রাখেন তা হল ঃ[১২১]

• রেফারেন্সে কোন তথ্যগত ত্রুটি নেই;

• যে দিন বলেছে দাবি না মানলে সংসদে যাবেনা সে দিনই 'ওয়াক আউট' বয়কটে রূপ নিয়েছে;

• একাধিক্রমে মানে হলো একটি বৈঠক দিবস থেকে পরবর্তী বৈঠক দিবসের যোগসূত্র গণনা থেকে মাঝখানের দিন গুলো (অধিবেশন বিহীন) বাদ যাবে;

• অনুপস্থিতি গণনা কে করবে, কে আসন শূন্য করবে কার্যপ্রানালী বিধির ১৭৮ ও ১৮০ তে তা বলা আছে;

• রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেয়া সুপ্রিম কোর্টের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব; কোর্ট সে দায়িত্ব এড়াতে পারে না;

• একটি রেফারেন্সে রাজনৈতিক বিষয় থাকলেই উত্তর দেয়া যাবে না এ ধারণা ঠিক না;

• আসন শুন্য হবে কিনা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার এখতিয়ার স্পীকারের।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যারিষ্টার রফিকুল হক ঃ

রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত এমিকাস কিউরিদের মধ্যে শেষ ব্যক্তি হিসেবে শুনানির ৫ম এবং ৬ষ্ঠ দিবসে (২০ ও ২৩ জুলাই) যে বক্তব্য রাখেন তার সংক্ষিপ্ত রূপ হল ঃ[১২২]

• সুপ্রিম কোর্ট তার মতামত রেজিষ্ট্রারের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবেন; এটা কোন গোপন বিষয় নয়, রাষ্ট্রপতি পাঠের পর এটা সর্বত্র প্রকাশ করা যাবে;

• রাষ্ট্রপতি তার রেফারেন্সে যে তথ্য দিয়েছেন তা সত্য ধরে নিতে হবে এবং তার ওপর আপিল বিভাগের মতামত দেয়া উচিত;

• আমাদের সংবিধান অনুযায়ী এটা সুপ্রিম কোর্টের একটি এখতিয়ার ভুক্ত বিষয়;

• বয়কট এবং ওয়াক/আউট সম্পর্কে বিভিন্ন ডিকশনারীর অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেন, এর যে নামেই হোকনা কেন বিরোধী দল সংসদে অনুপস্থিত এটাই হলো সত্য।

• বর্তমান গণতান্ত্রিক কাঠামোয় রাষ্ট্রপতি যে সব রেফারেন্স পাঠাবেন, তাতে রাজনৈতিক বিষয় থাকবেই;

• একাধিক্রমে ৯০ দিনের মানে হলো পরপর ৯০টি বৈঠক;

• ৮৯ দিন পর্যন্ত অনুপস্থিতি থাকার জন্য কারো অনুমতি লাগে না, আবার ৯০ দিনের পর গিয়ে অনুমতি চেয়েও কোন লাভ হবেনা;

• গণতন্ত্রের শেষ বিচারক জনগণ, জনগণই রায় দিয়ে পরবর্তীতে ঠিক করবে তাদের অনুপস্থিতি কি ছিলো।

ব্যারিষ্টার রফিকুল হক শুনানির দ্বিতীয় দিবসে (১৭ জুলাই, ১৯৯৫) সংসদ সদস্যগণের অনুপস্থিতি সম্পর্কে এবং রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা মূলক এখতিয়ার সম্পর্কে বাংলাদেশ সাংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলীর একটি তালিকা আদালতে পেশ করেছেন। সেই জন্যে আজকের কাগজ ১৮ জুলাই ১৯৯৫ সংখ্যার তালিকা দু'টোর বাংলারূপ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

সংসদে অনুপস্থিতির জন্য আসন শূন্য হওয়া ও সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার বিভিন্ন দেশের সংবিধানে যা আছে ঃ

সারণী ঃ ৫.৩

সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা মূলক এখতিয়ার ঃ

বাংলাদেশে সংবিধান ১০৬ অনুচ্ছেদ	ভারতে সংবিধান	পাকিস্তানের	শ্রীলংকার সংবিধান	ভারত শাসন আইন ১৯৩৫	মালয়েশিয়ার সংবিধান
"যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিয়মান হয় যে, আইনের এইরূপ কোন প্রশ্ন উথাপিত হইয়াছে বা উথাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, যাহা এমন ধরণেরও এমন জনগুরুত্ব সম্পর্কে যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্সপিডিয়েন্ট তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি আপিল বিভাগের বিচেনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিভাগ স্বীয় বিচেনায় উপযুক্ত তদানির পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।"	১৪৩ (১) অনুচ্ছেদ যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিয়মনান হয় যে, আইনের বা ঘটনায় এইরূপ কোন প্রশ্ন উথাপিত হইয়াছে বা উথাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, যাহা এমন ধরণেরও এমন জনগুরুত্ব সম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন (এক্সিপিডিয়েন্ট) তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি উক্ত আদালতে বিবেচনায় জন্যে প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং আদালত স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত তদানির পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। (যে রিপোর্ট)	১৮৬ অনুচ্ছেদ (১) যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতি এইরূপ বিবেচনা করেন যে, আইনের কোন প্রশ্ন যা তিনি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বলে বিবেচনা করেন, সেই সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের মতামত কাম্য (ডিজায়্যারেবল), তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি বিবেচনায় জন্যে সুপ্রিম কোর্টে প্রেরণ করিতে পারিবেন। (২) (২) সুপ্রিম কোর্ট উত্তররূপে প্রেরিত প্রশ্ন বিবেচনা করিবেন এবং প্রশ্নটি সম্পর্কে স্বীয় মতামত রাষ্ট্রপতিকে জ্ঞাপন করিবেন। (শ্যাল কমনসিভায় এ্যান্ড রিপোর্ট)।	(১) যদি কোন সময়ে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আইনের বা ঘটনায় এইরূপ কোনো প্রশ্ন উথাপিত হইয়াছে বা উথাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। যা এমন ধরণেরও এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন (এক্সিপিডিয়েন্ট), তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি উক্ত আদালতের বিচেনার জন্যে প্রেরন করিতে পারিবেন এবং উক্ত আদালত স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানির পর উক্ত রেফারেন্সে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অথবা রাষ্ট্রপতি যেইরূপ বর্ধিত করেন সেই সময়ের মধ্যে প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। (৪) এই অনুচ্ছেদের প্যারাগ্রাফ (১) এর আওতায় সকল ফার্য বিবরণী আদালত বিশেষ কারণে অন্যরূপ নির্দেশ প্রদান না করিলে, গোপনে রক্ষিত হইবে।	২১৩ অনুচ্ছেদ ১) যদি কোন সময়ে গভর্ণর জেনারেলের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আইনের এইরূপ কোন প্রশ্ন উথাপিত হইয়াছে বা উথাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে যাহা এমন ধরণেরও এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে ফেডায়েল আদালতের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন (এক্সিপিডিয়েন্ট) তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি উক্ত আদালতের বিবেচনার জন্যে প্রেরণ করিতে পারবেন এবং উক্ত আদালত তাহাদের বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানির পর গভর্ণর জেনারেলকে উক্ত বিষয়ে জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। (২) এ ধারায় আওতায় উন্মুক্ত আদালতে উত্তরূপ প্রশ্ন সম্পর্কিত শুনানিতে উপস্থিত বিচারকদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রদত্ত কোন মতামত জ্ঞাপন করা যাইবে না। কিন্তু এই উপধারায় কোন কিছুই কোন বিচারক একমত না হইলে তাহলে ভিন্নমত প্রদান থেকে বিরত করিতে পারিবেন।	১৩০ অনুচ্ছেদ • ইয়াং ডি-পায়ট্যান্স এবং এ সংবিধানের কোন কোনো বিধান বলবৎ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন উথাপিত হইয়াছে বা উথাপনের সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলে প্রশ্নটি ফেডায়েল আদালতের বিবেচনার জন্যে প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং ফেডায়েল আদালত উক্ত রূপে প্রেরিত যে, কোনো সম্পর্কে উন্মুক্ত আদালতে স্বীয় মতামত ঘোষণা করিবেন। (শ্যাল প্রোনাউন্স) • ইয়াং ডি-পায়ট্যান্স এবং ফেডায়েশনের সর্বময় ক্ষমতায় অধিকারী (সুপ্রিম হেড)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৫.৪
আসন শূন্য হওয়া সম্পর্কিত

বাংলাদেশের সংবিধান	ভারতের সংবিধান (১৯৫০)	পাকিস্তানের সংবিধান (১৯৭৩)	মালদ্বীপের সংবিধান	শ্রীলংকার সংবিধান	নেপালের সংবিধান	মালয়েশিয়ার সংবিধান	ভারত শাসন আইন ১৯৩৫
৭(১) (খ) অনুচ্ছেদ (১) কোনো সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হইবে, যদি (ক) ..... (খ) সংসদের অনুমতি না লইয়া তিনি একাধিক্রমে নব্বই বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকেন।	১০১ (৪) অনুচ্ছেদ যদি সংসদের যে কোনো কক্ষের কোনো সদস্য সংসদের অনুমতি ব্যতীত ৬০ দিনের জন্যে সংসদের সকল বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন। তাহা হইলে সংসদ উক্ত সংসদ সদস্যের আসন শূন্য ঘোষণা করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৬০ দিনের সময় গণার ক্ষেত্রে একাদিক্রমে ৪ দিনের বেশি সংসদের অধিবেশন মুলতবি বা স্থগিত থাকিলে উক্ত মধ্যবর্তী সময়কালকে গণনা করা যাইবে না। ১৯০ (৪) অনুচ্ছেদ যদি কোনো রাজ্যের আইন সভার কোনো সদস্য আইন সভার অনুমতি ব্যতিরেকে ৬০ দিন সময়কালে সকল বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে আইন সভা উক্ত সদস্যের আসন শূন্য ঘোষণা করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৬০ দিন সময়কাল গণনায় ক্ষেত্রে আইনসভায় অধিবেশন চার দিনের বেশি সময়কাল পর্যন্ত মুলতবি বা স্থগিত থাকিলে মধ্যবর্তী উক্ত সময়কালকে গণনা করা যাইবে না।	৬৪ অনুচ্ছেদ (১) ..... (২) সংসদ কোন সংসদ সদস্যের আসন শূন্য ঘোষণা করিতে পারিবেন যদি তিনি সংসদের অনুমতি না লইয়া একাদিক্রমে ৪০ বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকেন।	৬৫ অনুচ্ছেদ যদি জন মজলিশের কোনো সদস্য মজলিশের সভাপতির অনুমতি ব্যতিরেকে একাদিক্রমে দুটি অধিবেশনে মজলিশে উপস্থিত হতে অপরাগ হন, তাহা হইলে তিনি সদস্য পদ হারাইবেন।	৬৬ অনুচ্ছেদ কোনো সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হইবে (চ) যদি তিনি প্রথমেই সংসদের অনুমতি না লইয়া অবিরাম (কনটিনিউয়াস) তিন মাস সংসদের বৈঠকে নিজেকে অনুপস্থিত রাখেন।	৩৮ অনুচ্ছেদ (১) জাতীয় পঞ্চায়েতের কোন সদস্যের আসন নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে শূন্য হইবে। (ঘ) যদি তিন পঞ্চায়েতের অনুমতি ব্যতিরেকে অবিরাম একমাস জাতীয় পঞ্চায়েতের বৈঠকে নিজেকে অনুপস্থিত রাখেন।	৪৬ অনুচ্ছেদ (২) কোনো সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হইবে- (ঘ) যদি প্রত্যেক মাসে সংসদের (অথবা কোনো সংসদীয় কমিটির যে কোন কমিটির যে কমিটির তিনি সদস্য) বৈঠকে হইয়াছে, এইরূপ একাদিক্রমে দুইমাস তিনি স্পীকারের অনুমতি না লইয়া অনুরূপ সকল বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন।	৬৮ অনুচ্ছেদ (৪) যদি কোনো সংসদ (চেম্বার) সদস্য সংসদের অনুমতি না লইয়া ৬০ দিন সংসদের সকল বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে সংসদ উক্ত সংসদ সদস্যের আসন শূন্য ঘোষণা করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ৬০ দিন সময়কাল গণনায় ক্ষেত্রে সংসদের অধিবেশন চার দিনের বেশি সময় স্থগিত বা মুলতবি থাকিলে মধ্যবর্তী উক্ত সময়কালকে গণনা করা যাইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

এবার রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের সময় বিচারপতিদের প্রশ্ন ও অবজারবেশনের উপর আলোকপাত করা হল ঃ

প্রধান বিচারপতি এটি এম আফজল ঃ

শুনানির সময় মনোনীত আইনজ্ঞের প্রধান বিচারপতি শুনানির দ্বিতীয় তৃতীয় ও সপ্তম দিনের মন্তব্যের অংশ বিশেষ তুলে ধরা হল ঃ [১২৩]

- আদালত কোন অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যাবেনা, শুধু রেফারেন্সের মধ্যেই থাকবে;
- পদত্যাগ পত্র গ্রহণ না করে স্পীকার কি বিরোধী দলকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন; অনুপস্থিতি নয় বললে বিরোধী দল ফিরে আসবে এ গ্যারান্টি কোথায়?
- একজন নির্বাচিত সংসদকে কি আমরা নির্দেশ দিতে পারি সংসদে ফিরে যাও;
- কোর্ট নির্দেশ দিয়ে সব কিছু ঠিকঠাক করতে পারে না;
- রাষ্ট্রপতি একটা রেফারেন্স পাঠিয়েছেন কোন কিছু না বলে এটা ফেরৎ পাঠানোর হবে **Miss Conduct,** অক্ষমতার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে।

বিচারপতি মোস্তফা কামাল ঃ

শুনানির দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম দিবসে সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগের সিনিয়র বিচারপতি ও রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের শুনানির প্যানেল বিচারপতিদের মধ্যে অন্যতম বিচারপতি মোস্তফা কামাল আইনজীবীদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে যে মন্তব্য করেন তা নিম্নে দেয়া হল ঃ

- অধিবেশনে বসে নাওয়া-খাওয়া নামাজ সব কিছু বাদ দিয়ে ৯০ দিন বিরামহীভাবে চলবে, তাতে অনুপস্থিত থাকলেই ৬৭ (১) (খ) আকৃষ্ট হবে, এমন অবাস্তব ধারণা থেকে সংবিধান তৈরী হয়নি;
- পদত্যাগের ব্যাপারে যদি স্পীকার সিদ্ধান্ত দিতে পারেন, অনুপস্থিতির ব্যাপারে পারবেনা না কেন?

Dhaka University Institutional Repository

- ১০৬ এ সুপ্রীম কোর্টের মতামত মানতে রাষ্ট্রপতি বা স্পীকার বাধ্য নন;
- অনুপস্থিতি গণতন্ত্রের পক্ষে না-বিপক্ষে এটা রাজনৈতিক বিষয়। ৯০ দিন অনুপস্থিত থাকলে এলাকায় যেতে হবে নতুন ম্যান্ডেটের জন্য এটাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া;
- সংসদে না এসে বেতন ভাতা নিয়েও যদি আসন শূণ্য হয় সেটা কি গণতন্ত্রের জন্যে লাভজনক।
- রেফারেন্স সংবিধানের ১০৬ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নয়, আদালতের এখতিয়ার।

বিচারপতি আবদুর রউফ ঃ

শুনানির দ্বিতীয় দিবসে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স, নিষ্পত্তির প্যানেল বিচারপতি আবদুর রউফ যে মন্তব্য করেন তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হল ঃ ১২৫

- রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কতো কমানো যায় এটাই ছিলো দ্বাদশ সংশোধনীর লক্ষ্য।
- সংবিধানে ৫৭ (২) অনুচ্ছেদ ছাড়া সংসদ ভাঙ্গার আর কোন সুযোগ আছে?

বিচারপতি ইসমাইল উদ্দিন সরকার ঃ

শুনানি চলাকালীন দ্বিতীয় দিবসে প্যানেল বিচারপতিদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ বিচারপতি ইসমাইল উদ্দিন সরকার মন্তব্য করেন, যে সাংসদদের যে হিসেবে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স আছে তাতে দেখা যাচেছ

এমপি ৩৩১ জন, সংবিধানে তো ৩০০ জন এমপির কথা বলা হয়েছে।"[১২৬] রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের ওপর শুনানীর জন্য কোর্ট মনোনীত আইনজ্ঞদের বক্তব্য ও প্যানেল বিচারপতিদের প্রশ্ন, মন্তব্য ও অবজারভেশনের পর কোর্ট উক্ত রেফারেন্সের ওপর বক্তব্য দানে ইচছুক

Dhaka University Institutional Repository

সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবীদের মতামত আহবান করেন। কোর্টের এ আহবানে সাড়া দিয়ে স্বপ্রনোদিত হয়ে যে ৫ জন আইনজীবী বক্তব্য রাখেন তাদের বক্তব্য ও তুলে ধরা হলো ঃ[১২৭]

ডঃ জহির স্বপ্রনোদিত বক্তাদের প্রথমেই তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলের সাংসদরা সংসদ থেকে পদত্যাগ করেছেন, এখন তারা আর সাংসদ নন, কাজেই তাদের সংসদে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। বিরোধী দলের পদত্যাগ পত্র নাকচ করে স্পীকার এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ করেছেন। পদত্যাগ একজন সাংসদের অধিকার এই অধিকার খর্ব করার অনুমতি সংবিধান স্পীকারকে দেয়নি।"

এ্যাডভোকেট মাকসুদুর রহমান, বলেন, "ওয়াক আউট ও বয়কট অনুপস্থিত হবে। একাদিক্রমে ৯০ দিন গণনায় অধিবেশহীন দিনগুলো বাদ যাবে এবং আসন শূণ্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের এখতিয়ার স্পীকারের"।

এ্যাডভোকেট শুধাংশু শেখর হালদার বলেন, "সংসদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অধিকার রাষ্ট্রপতিকে দেয়া হয়নি। সুপ্রীমকোর্টকে আমরা বঙ্গভবনের অংশ করতে পারিনা। তাই এ রেফারেন্সটি ফেরৎ পাঠাতে হবে।"

এ্যাডভোকেট ইয়ার আহমেদ- স্বপ্রোনোদিত হয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, "রাষ্ট্রপতি যখন একটি রেফারেন্স পাঠিয়েছেন তখন সংশ্লিষ্ট সবগুলো বিষয়ের জবাব দেয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, বিরোধী দলকে সংসদে ফিরে যাওয়ার জন্যে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ দেয়া উচিত। একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সরকারকে পয়ামর্শ দেয়া উচিত।"

এবিএম নুরুল ইসলাম- প্রধান বিচারপতির আহবানে স্বপ্রনোদিত বক্তাদের মধ্যে সর্বশেষ বক্তা হিসেবে তিনি বলেন, "সংবিধানের ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদে যে আইনগত পরামর্শ, কিন্তু রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সে কোন আইনগত প্রশ্ন করা হয়নি। কারণ ওয়াক আউট বয়কট কোন আইনের বিষয় নয়। তাছাড়া ৯০দিন গোনায় রাষ্ট্রপতি কে?"

১৬ জুলাই (১৯৯৫) সরকার পক্ষের কৌশলী ব্যারিষ্টার আশরারুল হোসেনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের শুনানি শুরু হয়ে ছিলো। ২৩ জুলাই শুনানির সমাপ্তি দিবসে ব্যারিষ্টার আশরায়ুল হোসেন তার সমাপ্তি বক্তৃতায় বলেন, "এমিকাস কিউরেদের যে ভূমিকা পালন করা উচিত ছিলো তা তারা করেননি। তিনি বলেন "ড. কামাল হোসেন রেফারেন্স ফেরৎ পাঠানো সম্পর্কিত যে বক্তব্য রেখেছেন তা আমাদের সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদের সাথে সমাঞ্জস্য পূর্ণ নয়।" "আদালত স্ব-আরোপিত বিধি নিষেধ আরোপ করা উচিত নয়"। বিচারপতি মোস্তফা কামালের প্রশ্নের উত্তরে ব্যারিষ্টার আশরারুল হোসেন বলেন,"সংবিধানের ব্যাখ্যা দেয়ার এখতিয়ার আদালতেরই সবচেয়ে বেশী। আইনের ব্যাখ্যা এবং উপদেশ প্রদানের ক্ষমতা সংসদের নেই, এটা সুপ্রীম কোর্টের আছে"[১২৮]। তিনি ওয়াক আউট, বয়কট, অনুপস্থিত নয় বলে তার অভিমত ব্যক্ত করেন। ব্যারিষ্টার হোসেনের সমাপণী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুনানি সমাপ্তি হয়।

২৭ জুলাই (১৯৯৫) (শুনানি সমাপ্তির ১ দিন পর) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে সুপ্রীম কোর্টের প্যানেল বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের জবাব পাঠিয়েছেন। উক্ত জবাবের কপি ঐ দিন সকাল ১০:২৫ মিনিটে সুপ্রীম কোর্টের রেজিষ্টার রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তর করেন। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের জবাবে বিচারপতিগণ যে উত্তর দিয়েছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত কর হল ঃ [১২৯]

প্রধান বিচারপতি এটি এম আফজল ঃ

প্রধান বিচারপতি তার মতামতে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন,"সংবিধানের ১০৬ বিস্তর ক্ষেত্র দিয়েছে। এটা অবশ্যই রাষ্ট্রপতি যিনি আইনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে কিনা দেখবেন। যা নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

কোন সংশয় বা প্রশ্ন করা যাবেনা। রেফারেন্সের প্রয়োজনীয়তা উদ্দেশ্য রাজনৈতিক বা অন্য কিছু কিনা এ নিয়ে কোন মাথা ঘামাতে পারেনা। প্রধান বিচারপতি এও উল্লেখ করেন যে,"মতামত দিতে কোর্ট বাধ্য নয় উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে কোর্ট জবাব দান করতে অপারগতা প্রকাশ করতে পারে"। তিনি বিভিন্ন দেশের উদাহরণ থেকে কয়েকটি নীতি নির্ধারণ করেন; এ গুলো হলো ঃ

১। রেফারেন্সের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা এবং ধরন দেখা গ্রহণ যোগ্য নয়;

২। রেফারেন্সে যে সব তথ্য দেয়া হয়েছে তা সত্য বলে ধরে নিতে হবে। সত্য-সত্য না মিথ্যা তা যাচাই করা যাবেন;

৩। রাষ্ট্রপতি সুপ্রীমকোর্টের মতামত গ্রহণে বাধ্য নয়, কিন্তু এ ধরনের মতামত সব সময়ই উপযুক্ত মর্যাদা পায়;

৪। এ মতামত কোনো আদালতের ওপর ও বাধ্যবাধক নয়;

৫। যদি ও উপদেষ্টা মতামত আইন নয়, এজন্যে হাইকোর্ট ও এটা মানতে বাধ্য নয়। কিন্তু এ মতামত সবসময়ই উপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মান পায়;

প্রধান বিচারপতি আরও উল্লেখ করেন যে, "রেফারেন্সে এমন কোনো বিষয় নেই, যা সংসদের একান্ত নিজস্ব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। তবে এটা সত্য যে, যে সব প্রশ্ন গুলো আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, সে বিষয়ে স্পীকার সংসদে সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন। আমরা এটা জানিনা এবং এ ব্যাপারে আমরা তদন্ত করতে পারিনা, কোন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সটি পাঠিয়েছেন"। ড. কামাল হোসেন এবং ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদের যুক্তি অনুযায়ী কোনো মতামত না দিয়ে রেফারেন্সটি ফেরৎ পাঠানো সম্পর্কে প্রধান বিচারপতি তাদের যুক্তি গ্রহণ না করে বলেন, "এরকম কোন চর্চা নেই যে, আদালত রাজনৈতিক বিষয় জড়িত আছে শুধু এ কারণে রেফারেন্সের জবাব প্রত্যাখাণ করেছে। এ জন্যে আরও যুক্তিপূর্ণ কারণ দরকার বিধায় কোর্টের ওপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা সাংবিধানিক"। তবে তিনি একথা উল্লেখ করেছেন যে, "রাজনৈতিক প্রশ্ন এলে আমরা সম্মানের সঙ্গে তা ফেরৎ পাঠাবো"।

Dhaka University Institutional Repository

"এক ও দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর হবে হ্যাঁ সূচক তবে তা হবে একাদিক্রমে ৯০ দিন গণনার সাপেক্ষে"।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "অধিবেশনের সমাপ্তি থেকে আরেকটি অধিবেশনের শুরু পর্যন্ত সময় একাদিক্রমে ৯০ বৈঠক দিবস গণনা থেকে বাদ যাবে।" এবং
চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "স্পীকার অনুপস্থিতির সময় গণনা করবেন"। প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির একাদিক্রমে ৯০দিন অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে তার আসন শূণ্য হয়ে যাবে। স্পীকার বা কারোরই কোন ভূমিকার কথা বলা হয়নি। প্রধান বিচারপতি আরও বলেন," দীর্ঘ সময় ওয়াক আউট এবং বয়কটের আমরা যে অর্থই করিনা কেন তা সংবিধানের ৬৭ (১) (খ) অনুযায়ী আসন শূণ্য হবে।"
বিচারপতি মোস্তফা কামাল ঃ

রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের মতামত দানকারী প্যানেল বিচারপতিদের অন্যতম বিচারপতি মোস্তফা কামাল তার মতামতে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেন। তাছাড়াও তিনি যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত করেন তা হল, "কার্যপ্রনালী বিধির ১৮০ অনুযায়ী সংসদ সচিব যে কাজ করেন তা দাপ্তরিক, স্পীকারের ভূমিকা হলো অবহিত মূলক।" তিনি আরও বলেন, "সকল লিখিত সংবিধানেই অনুপস্থিতির সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে তা যে কোন কারণেই হোক না সেজন্যে উপনির্বাচনের বিধান রেখে ছিলেন। যাতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কার্যকর থাকে। ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে অনুপস্থিতির ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। তা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করবে। তিনি সংবিধানের ৬৭ (১) (খ) প্রসংগে বলে, "বিনা অনুমতিতে টানা ৮৯ দিন পর্যন্ত অনুপস্থিত থাকা যায়। সেটা অনুপস্থিতির জন্যেই হোক বা একযোগে পদত্যাগের কারণেই হোক। কিন্তু যখনই অনুমোদিত সময় পেরিয়ে যায় তখনই ৬৭ (১) (খ) এর গিলোটিন প্রয়োগ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বিচারপতি লতিফুর রহমান ঃ

প্যানেল বিচারপতিদের অপর বিচারপতি লতিফুর রহমান। চারটি প্রশ্নেরই প্রধান বিচারপতির অনুকরণে হলেও মতামতের শেষ পর্যায়ে কিছু নিজস্ব মতামত রেখে বলেন, "এটা খুবই দূর্ভাগ্যজনক যে, '৯১ এর ২৭ ফেব্রুয়ারী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের অধীনে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংসদ সব বিরোধী দল ছাড়া কাজ করছে। এটা কি সংসদীয় গণতন্ত্র? গণতন্ত্র সম্পর্কে তিনি বলে, আমরা সকলেই দেশের উন্নতি আমাদের জন্যে আমাদের সন্তানদের জন্যে করতে চাই। আমরা কি গণতন্ত্রে মূল স্পীরিট ভুলে যাচ্ছি না? গণতন্ত্রের জন্যে নির্বাচন প্রয়োজন। কিন্তু নির্বাচন গণতন্ত্র নিশ্চিত করে না। রাজনৈতিক গণতন্ত্র কখনোই কাজ করেনা। যতক্ষণ আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা না করি। আমি শুধু আশা করবো যে বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলগুলো পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার অভ্যাস গড়ে তুলবে। যাতে আমাদের দেশে সত্যিকার গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠে।

বিচারপতি আব্দুর রউফ এবং বিচারপতি ইসমাইল উদ্দিন সরকার ঃ

বিচারপতি আব্দুর রউফ এবং বিচারপতি ইসমাইল উদ্দিন সরকার রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের ৪টি প্রশ্নেই প্রধান বিচারপতির দেয়া মতামতের সঙ্গে একমত পোষণ করেন।

সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের জবাব দেয়ার ১ দিন পর জাতীয় সংসদের স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী ২৮ জুলাই (১৯৯৫) জাতীয় সংসদে জানান, "বিরোধী দলের সদস্যদের যারা ৯০ দিনের বেশী অনুপস্থিত ছিলেন, তাদের আসন গুলো ২০ জুন (১৯৯৫) থেকে শূন্য হয়ে যাবে।" এবং এ ব্যাপারে হিসেব নিকেশ করার পর অনতিবিলম্বে গেজেট প্রকাশ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। স্পীকার সুপ্রিম কোর্টের মতামত প্রসংগে বলেন, "যদিও সুপ্রীম কোর্টের মতামত কারো জন্য বাধ্যবাধকতা মূলক নয়, কিন্তু সকলের এটা মানা উচিত। অবশ্যই মানা উচিত"।[১৩০]

Dhaka University Institutional Repository

৩০ জুলাই (১৯৯৫) সংসদ সচিবালয়ের সচিবের স্বাক্ষরিত দু'টি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংসদের অনুমতি ব্যতীত একাদিক্রমে ৯০ দিন অনুপস্থিত থাকার কারণে বিরোধী দলের ১৪২ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ৮৭ জনের আসন ২০ জুন (১৯৯৫) থেকে শূন্য ঘোষণা করেন। অনুপস্থিত বাকি ৫৫ জন সংসদ সদস্যের হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর থাকায় কারনে তাদের আসন শূন্য ঘোষণা না করে তাদেরকে প্রথমে চিঠি দেয়া হয় যে, তারা সংসদে উপস্থিত ছিলেন কিনা? কিন্তু উক্ত ৫৫ জন সাংসদ কোনো ইতিবাচক সাড়া না দেয়ায় তাদের আসন ও শূন্য ঘোষনা করা হয়। এ ১৪২ জন সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হওয়া প্রসংগে কার্যপ্রনালী বিধির ১১৮ (৩) বিধির শর্তানুযায়ী ডেপুটি স্পীকার হুমায়ুন খান পন্নী ৬ সেপ্টেম্বর (১৯৯৫) জাতীয় সংসদকে অবহিত করেন যে, ১লা মার্চ ১৯৯৪ থেকে ১৯ জুন ১৯৯৫ পর্যন্ত বিরোধী দলের ১৪১ জন সংসদ একাদিক্রমে ৯০ দিন অনুপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতির পাঠানো রেফারেন্স সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের মতামত অনুযায়ী ১৪১ জন সংসদের ৯০ দিন অনুপস্থিতির কারণে আসন শূন্য ঘোষিত হয়। আওয়ামী লীগ সংসদ আখতারুজ্জামান বাবুকে ৭ মার্চ পর্যন্ত ৭১ দিন ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছিলো। ৮ মার্চ '৯৪ থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত ৯০ দিন অনুপস্থিত থাকায় ২৬ জুন থেকে তার আসন শূন্য ঘোষণা হয়।"[১৩১] তবে সংসদ কারা বন্দী থাকায় জাতীয় পার্টির হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও জাতীয় পার্টির মাহমুদুল হাসান, এবাদুর রহমান চৌধুরী, পরিতোষ চক্রবর্তী, হাফিজুর রহমান প্রামানিক, আব্দুল মজিদ ও শরিফ উদ্দিন খসরু সহ এ ৯ জনের একাদিক্রমে ৯০ দিন অনুপস্থিতি পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যোগ দেয়ায় তাদের আসন শূন্য ঘোষণা করেনি। বিরোধী দলের ১৪২ জন সদস্যের আসন শূন্য হওয়ার ফলে জাতীয় সংসদে সদস্য সংখ্যা দাড়ায় ১৮৮ জনে। ফলে সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে এ ১৪২ আসনে উপনির্বাচনের আবশ্যকতা দেখা দেয়।

১২) উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মেরুকরণ ঃ সমঝোতার উদ্যোগ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দলের অনুপস্থিত সদস্যদের আসন শূন্য হওয়ার প্রেক্ষাপটে উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংকটের সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়। বিরোধী দলের আসন শূন্য ঘোষিত হয় ৩০ জুলাই (১৯৯৫)। কিন্তু এর পূর্বেই উপনির্বাচনকে ঘিরে অন্তর্বর্তী সরকারের রূপ রেখা সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ২৩ জুন (১৯৯৫) সরকারি দল বিএনপির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ঘোষিত নির্বাচনের ৩০ দিন পূর্বে পদত্যাগের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে উপনির্বাচনের মাধ্যমে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রস্তাব করা হয়। উক্ত প্রস্তাবে বলা হয যে, বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোয় বিরোধী দলের যে আসন গুলো শূন্যে হবে সেখান থেকে প্রথম পর্যায়ে সরকারী ও বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে ১১টি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত ১১টি আসনে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সরকারী বা বিরোধী দলের বাইরে থেকে একটি ঐকমত্য প্যানেল নির্বাচন করবে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত উক্ত প্যানেল সদস্যগণের তত্ত্বাবধানে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালিত হবে। এ ১১ জনের মধ্যে থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান এবং অন্যান্য উপদেষ্টা নির্বাচন করা হবে। প্রস্তাবে বলা হয়, যেহেতু রাজনৈতিক দল সমূহ ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রার্থী দিবে এবং কোন রাজনৈতিক দলই ঐকমত্যের বাইরে প্রার্থী দিবে না, ফলে ঐকমত্যের নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ সহজেই জয়লাভ করবে। প্রস্তাবে বলা হয় "নির্দলীয় সদস্যগণ শপথ গ্রহণের পর রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে বর্তমান সংসদ ভেঙ্গে দিবেন। এরপর নির্বাচনের ৩০ দিন পূর্বে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান, প্রধামন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে সুপারিশ করবেন। রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৫৬(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দান করবেন"। এ ব্যবস্থার ফলে সংবিধান সংশোধনের কোন প্রয়োজন পড়বেনা। সংবিধানের ৫৬(৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়-

Dhaka University Institutional Repository

"সংসদ ভাংগিয়া যাওয়া এবং সংসদ সদস্যদের অব্যবহিত পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তী কালে এই অনুচ্ছেদের (২) বা (৩) দফার অধীনে নিয়োগ দানের প্রয়োজন দেখা দিলে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার অব্যবহিত পূর্বে যাহারা সংসদ সদস্য ছিলেন, এই দফার উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তাঁহারা সদস্যরূপে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন"।[১৩২]

সুতরাং, এ ব্যবস্থায় বা এই ফর্মুলায় সংবিধান ব্যতীত অর্থাৎ বর্তমান সংবিধানিক কাঠামো আওতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নটি মিমাংসা করা সম্ভব ছিল।

অবাধ, মুক্ত ও সুষ্ঠ নির্বাচনের উপায় শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠক ঃ

২৮ জুলাই (১৯৯৫) জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভি.আই.পি লাউঞ্জে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত এক গোল টেবিল বৈঠক উল্লেখিত বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, বিচারপতি টি. এইচ. খান, ডঃ রফিকুর রহমান, ব্যারিষ্টার মইনূল হোসেন, ব্যারিষ্টার আমীরুল ইসলাম ও ব্যারিষ্টার আশরারুল হোসেন। আলোচক বৃন্দ চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানের উপরও গুরুত্বরোপ করেছেন বিধায় প্রসঙ্গক্রমে কয়েক জনের বক্তব্য তুলে ধরা হলো ঃ

আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদ বলে, "তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সর্বশেষ ফর্মূলাটি উদ্ভট কোন প্রস্তাব নয়। বরং নির্বাচনের ৩০ দিন আগে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগের ঘোষণার সূত্র ধরেই এ ফর্মূলার সৃষ্টি হয়েছে। যে কোনো সুবিধা জনক সংখ্যক নিরপেক্ষ (উভয় পক্ষের আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে) ব্যক্তিকে উপনির্বাচনের মাধ্যমে পাস করিয়ে, এটা বর্তমান সাংবিধকিভাবে তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা যায়"। ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আরও বলেন, "দেশের জনগণের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে দু'পক্ষের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে এ সংকট সমাধান করা প্রয়োজন"। তিনি আরও

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, "বিরোধী দলের ফর্মূলা অনুযায়ী এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে বিরোধী দল বলছে, পরবর্তী সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠনকে 'রেটিফিকেশন' করে নিবেন।" এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সংবিধান রেটিফিকেশনের বিষয়টি যত সহজে বলছেন বিষয়টি এত সহজে নয়।"[১৩৩] উক্ত বৈঠকের আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যারিষ্টার মইনূল হোসেন বলেন, "সরকার গঠনের জন্য নিরপেক্ষ নির্বাচন অপরিহার্য। তবে, দেশের শাসনতন্ত্রকে মেনেই রাজনীতি করতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে শাসনতন্ত্র চর্চার কোনো বিকল্প নেই। অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে"।[১৩৪]

'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফাউন্ডেশন' আয়োজিত 'অবাধ, মুক্তও সুষ্ঠু নির্বাচনের উপায়' শীর্ষক এ গোল টেবিল বৈঠকের আলোচক বৃন্দের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে বর্তমান সংবিধানিক কাঠামোর বাইরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের কোনো অবকাশ নেই। তাছাড়া আলোচক বৃন্দ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ব্যারিষ্টার ইশতিয়াকের সমঝোতা উদ্যোগ ঃ

বিরোধ দলের জাতীয় সংসদে অনুপস্থিতির বিষয়ে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স পাঠানোর প্রাক্কালে ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদ চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জুলাই ১৯৯৫ এর প্রথম সপ্তাহে ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদের সাথে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার এক একান্ত বৈঠকে ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক বিরোধী দলীয় নেত্রীকে আলোচনার প্রস্তাব দেন। উক্ত বৈঠকে বিরোধীদলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, আলোচনার পূর্বে তিনটি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সুস্পষ্ঠ ঘোষণা ছাড়া, কোনো আলোচনায় যাবে না। এগুলো হলো ঃ[১৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

১. প্রধানমন্ত্রীকে সুনির্দিষ্ট ঘোষণা দিতে হবে যে, তিনি নির্বাচনের ৯০ দিন আগে পদত্যাগ করবেন।

২. নির্বাচনের ৯০ দিন আগে একটি দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে। এবং

৩. অবিলম্বে সংসদ ভেঙ্গে দিতে হবে।

ব্যারিষ্টার ইশতিয়াকের ফর্মূলা ঃ

ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহম্মেদ সংকট নিরসনে তার উদ্ভাবিত একটি ফর্মূলা পেশ করেন। তিনি রাজনৈতিক সংকটের সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণের পর ২৮ জুলাইন (১৯৯৫) জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনায় যে বক্তব্য রাখেন সেই বক্তব্যের পূর্ণাঙ্গ রূপ হিসেবে ১ আগষ্ট (১৯৯৫) একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবনা পেশ করেন যা ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদের 'পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবনা' যা 'ব্যারিষ্টার ইশতিয়াকের ফর্মূলা' নামে খ্যাত। ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদ তার এ প্রস্তাবনা পেশ করার পূর্বে বিরোধী দলের নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির প্রেক্ষিতে সরকারের অবস্থানও নির্বাচনের একটি নির্দিষ্ট সময় পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের ঘোষণা এবং বর্তমান সংবিধানিক কাঠামোয় আওতায় তার এ প্রস্তাব পেশ করেন।

ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবটি নিম্নরূপ ঃ১৩৬

১. কিছু সংখ্যক নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তি, ধরা যাক ১০ জন, যারা সরকার ও বিরোধী দলের কাছে গ্রহণযোগ্য যারা পরবর্তীকালে একটি ক্যাবিনেটের দায়িত্ব নেবেন। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী এদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন।

২. যেহেতু এখন সংসদে অনেক গুলো আসন খালি হয়ে গেছে। সংবিধান অনুযায় ৯০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচন করতে হবে। এটা নির্দলীয় ব্যক্তিদের নিয়ে সরকার গঠনের একটা সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এ উপনির্বাচনে সর্বম্মত প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবেন। উপনির্বাচন সবগুলো শূন্য আসনে পূরণের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

করা যায়। আবার যে ক'জন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার থাকবেন তাদের সমন্বয়ে করা যায়।

৩. যদি সবগুলো শূন্য আসনে উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয় তা হলে সবচেয়ে সম্ভব দূরবর্তী সময় নির্বাচনের জন্যে নির্ধারণ করে কাছাকাছি তারিখ মনোনয়ন পত্র দাখিল, বাছাই এবং প্রত্যাহারের জন্যে রাখা যায়। এটা যদি করা যায়, তাহলেও উপনির্বাচন এড়ানো সম্ভব। কারন সর্বসম্মত প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যাবে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের পর। এরপর আর উপনির্বাচনের প্রয়োজন হবে না। সর্বসম্মত ভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতদের ব্যাপারে নোটিফিকেশননের পর তারা তাদের আসনে বসবেন। এরপরই সংসদ ভেঙ্গে দিলে আর উপনির্বাচনের প্রয়োজন হবে না।

৪. বর্তমান সাংবধানিক সমস্যা সংবিধানের আওতায় সমাধানের জন্যে সমঝোতার জন্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্য প্রয়োজন;

ক) নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তি যারা নতুন মন্ত্রী গঠন করেন এবং তাদের মধ্যে যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তার নাম নির্ধারণ;

খ) নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার কখন থেকে কাজ শুরু করবে তার তারিখ নির্ধারণ;

গ) সংসদ বাতিলের তারিখ নির্ধারণ;

ঘ) নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ;

এ প্রস্তাবনা পেশের ১দিন পর ২ আগষ্ট (১৯৯৫) এক সংবাদ সম্মেলনে গণফোরাম সভাপতি ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. কামাল হোসেন বলেন, "ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদের দেয়া ফর্মূলা মতোই সাংবিধানিকভাবে বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের সমাধান সম্ভব।"[১৩৭] ৩ আগষ্ট ব্রিটিশ হাই কমিশনার পিটার জে. ফাউলার অভিমত ব্যক্ত করেন যে, "ইশতিয়াক ফর্মূলা বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকটের সমাধান দিতে পারে"।[১৩৮] ৫ আগষ্ট ১৯৯৫ বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির বৈঠকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করার জন্য বিরোধী দলের প্রতি আহবান জানান। কিন্তু ৬

Dhaka University Institutional Repository

আগষ্ট আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ২৮ ডিসেম্বর (১৯৯৪) ঘোষিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ রেখা অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হবে, অন্য কোন ফর্মূলা বা প্রস্তাব বিবেচনা করবে না। এছাড়াও উক্ত বৈঠকে উপনির্বাচন প্রতিহত করা হবে বলে হুমকি দেয়া হয়। এর মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদের প্রস্তাবিত ফর্মূলার ভিত্তিতে সংকটের সমাধান বিরোধী দল আগ্রহী নয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশিষ্ট কলাম লেখক ফয়েজ আহমদ আহমদ তার এক নিবন্ধে উল্লেখ করেন,"বেগম খালেদা জিয়া যখনই বলেছেন তিনি নির্বাচনের পূর্বে পদত্যাগ করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না, তখনই এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ রাজনৈতিক সংকট মিমাংসার দ্বারা রুদ্ধ হয়ে যায়নি। অপর দিকে বিরোধী দলের প্রধান নেত্রী শেখ হাসিনা মিমাংসারই কথা বলেছেন তবে তার শর্তে।"[১৩৯]

৮ সেপ্টেম্বর (১৯৯৫) আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা আজকের কাজগের সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেন, "প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তত্তাবধায়ক সরকারের দাবি না মানলে সরকারের পতন অনিবার্য।" পরবর্তী সংসদে এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বৈধতা না দেয়া হলে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হবে কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরে শেখ হাসিনা বলেন, "কেন বৈধতা দেয়া হবে না, এ ব্যাপারে ঐকমত্য হতে হবে। সকলের একমত হয়ে নির্বাচন করলে পরবর্তীতে একাদশ সংশোধনীর মতো একটা সংশোধন তেমন সমস্যা সৃষ্টি করবেনা।"[১৪০] বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার এ 'পরবর্তী সংসদে বৈধতা দেয়া' বিষয়টি একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তিনি উক্ত সাক্ষাৎকারে '৯১ এর প্রসঙ্গ এনেছেন। '৯১ এ যা হয়েছে তা '৯৬ এ নির্বাচিত সকল দলই এ বৈধতা দানে অর্থাৎ সংবিধান সংশোধনে রাজী হবেন এমন গ্যারান্টি কিভাবে দিলেন। যেখানে বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিয়ে ঐকমত্য সৃষ্টি হচেছ না সেখানে পরবর্তী সংসদে ঐকমত্য কিভাবে হবে। তাছাড়া প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি বিএনপি ব্যতীত

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য বিরোধী দলের আন্দোলনের শরীক অন্যান্য দল ভবিষ্যত সংবিধান সংশোধনে ঐকমত্য হলেও বিএনপি যদি এর সাথে একমত না হয় তখন কি হবে। একানব্বইয়ের প্রসঙ্গেও যদি আসি তাহলে দেখা যাবে ১৯৯০ সালের তিন জোটের রূপ রেখায় আন্দোলনে শরীক ৩টি জোটই ওয়াদাবদ্ধ ছিল। ক্ষমতাচ্যুত জাতীয় পার্টি বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের অবস্থায়ী সরকারকে বৈধতা দেয়ার কোন ওয়াদা করেননি। অর্থাৎ তিন জোটের রূপ রেখার সাথে তারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। ফলে পরবর্তীতে একাদশ সংশোধনীতে জাতীয় পার্ট সমর্থন দেয় নি। কাজেই ১৯৯৫ এ বিএনপির প্রতিপক্ষ অন্যান্য বিরোধীদল। বিএনপি যেহেতু বিরোধী দলের দাবী তত্ত্বাবধায়ক (Concept) মানছেনা সেক্ষেত্রে তারা শেখ হাসিনার দাবি অনুযায়ী পরবর্তীতে সংসদে বিরোধী দলের প্রস্তাবিত সরকারকে কেন বৈধতা দিবে। শেখ হাসিনা আন্দোলনে শরিক দলগুলো দায়িত্ব নিতে পারেন কিন্তু বিএনপি'র দায়িত্ব নিবেন কিভাবে। বাস্তব অবস্থা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলেও দেখা যাবে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদকে বাদ দিয়ে ৭ম জাতীয় সংসদকে যদি বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ভাষায় পরবর্তী সংসদ মনে করি, সেখানে দেখা যায় আওয়ামী লীগ তো নয়ই বিএনপি ব্যতীত অন্য সকল দল ঐক্যবদ্ধ হয়েও সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা ছিলনা। বিএনপি যদি বিতর্কিত ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ না করে বিরোধী দলের দাবী অনুযায়ী কেবল পদত্যাগ করে নির্বাচনে যেতেন তা হলে পরবর্তীতে সাংবিধানিক সংকট অনিবার্য ছিল। কারণ বিএনপি যদি '৯১ এর জাতীয় পার্টির মত তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বৈধতা দানে বিরত থাকতেন তা হলে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আরোহন কি সম্ভব ছিল? কারণ বিরোধী দলের দাবি অনুযায়ী অসাংবিধানিক ভাবে গঠিতব্য সরকার বৈধতা না পেলে নির্বাচন অবৈধ হয়ে যেত এবং সাংবিধানিক শূণ্যতা বিরাজ করতো। ব্যারিষ্টার ইসতিয়াক আহমেদ ও প্রেস ক্লাবের গোল টেবিল বৈঠকে বলেছিলেন, "সংবিধান রেটিফিকেশনের বিষয়টি যত সহজেই বলেছেন বিষয়টি এত সহজ কাজ নয়"। কাজেই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ না হলে সংবিধানিক সংকট অপরিহার্য হয়ে দেখা দিত। কাজেই বিরোধী দলের নেত্রী যে ঐকমত্যের কথা

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন, সে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে যদি রাজনৈতিক সংকটের সমাধানে রাজনৈতিক দলসমূহ আন্তরিক হতেন তা হলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করতো। রাজনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতো। এ প্রসঙ্গে ফয়েজ আহমেদ অন্য এক নিবন্ধে উল্লেখ করেন "জনগণের নিস্পৃহা বা উৎকণ্ঠা নেতৃবর্গকে তেমন কোন স্পর্শ করে না। তবুও অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, বিবদমান পক্ষ দু'টির সদিচ্ছা থাকলে এবং পরস্পরের ছাড় দেয়ার মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হলেও রাজনৈতিক কৌশলের দৃষ্টিতে এ সমস্যার সমাধান দুরূহ নয় বরং বলা যেতে পারে সংকটের মূল সূত্রটি কোথায়"।[১৪১] রাজনৈতিক সংকট সমাধানে ব্যারিষ্টার ইশতিয়াকের উদ্যোগের পর কুটনৈতিক পর্যায় থেকেও বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু কোন উদ্যোগই সফল হতে পারে নি। তবে এরপর রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে বিএনপি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেন।

রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে বিএনপি'র বিকল্প প্রস্তাব ঃ

৯ সেপ্টেম্বর (১৯৯৫) রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে বিএনপি'র পক্ষে একটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করা হয়। উক্ত প্রস্তাব মোতাবেক, নির্বাচনের ৩০ দিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী তার মন্ত্রী সভাসহ পদত্যাগ করবেন এবং রাষ্ট্রপতি ঐ ত্রিশ দিন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে সচিবদের দ্বারা দেশ চালাবেন। এ ভাবে অন্তবর্তীকালীন সরকার পরিচালনায় সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন নেই বলে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বিএনপির পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব আওয়ামী লীগ ও বাম ফ্রন্টকে দেয়া হয়। যদিও এ বছরের শুরুতে (১০ জানুয়ারী, ১৯৯৫) আওয়ামী লীগ এ ধরনের একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ এ প্রস্তাব মেনে নিতে ইচ্ছুক নয়। ১০ সেপ্টেম্বর (১৯৯৫) আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের সভায় সরকারী দলের এ প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করা হয়। তবে এ প্রস্তাব অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রী পরিষদ পদত্যাগ করলেও উত্তরাধিকারী নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ও তার

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রী পরিষদ স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। এ প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী পরিষদের কোনো উত্তরাধিকারের কথা বলা হয়নি সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের দায়িত্ব থেকে নিবৃত করা যাবে কিভাবে তা প্রস্তাবে বলা হয়নি।

পূনঃ কুটনৈতিক উদ্যোগ ঃ

৫ম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের আসন সমূহ শূণ্য ঘোষিত হওয়ার পর বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সংকট মহাসংকটে রূপ নিয়েছে। উপনির্বাচনকে সামনে রেখে সংকট সমাধানের যে উদ্যোগ ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদ নিয়েছিলেন সে উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর বিভিন্ন দেশের কুটনৈতিক বৃন্দ দেশের অভিজ্ঞ এবং রাজনীতিবিদদের সাথে আলাপ আলোচনার পর ১ অক্টোবর (১৯৯৫) একটি প্রস্তাব পেশ করেন। অবশ্য কূটনৈতিকদের এ প্রস্তাবের পূর্বে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনুস সংকট সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি মার্কিন দূতাবাস সহ কয়েকটি দেশের উর্ধ্বতন কূটনৈতিকদের সাথেও আলোচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। যদিও তার উদ্যোগ ব্যক্তি পর্যায় ছিল কোন আনুষ্ঠিক প্রস্তাব ছিলনা। ড. ইউনুসের উদ্যোগ সফল না হলেও কূটনৈতিক বৃন্দ বর্তমানে সাংবিধানিক কাঠামোর আওতায় সংকট নিরসনের যে প্রস্তাবটি পেশ করেন তা হলঃ[১৪২]

১। প্রধানমন্ত্রী আগামী সংসদ নির্বাচন একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে হবে, এরকম ঘোষণা দেবেন।

২। এরপর নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির নাম চুড়ান্ত করার জন্যে সরকারী ও বিরোধী দল আলোচনা বসবে এবং নাম চুড়ান্ত করবে।

৩। সর্ব সম্মত ঐ মনোনীত ব্যক্তি শূন্য ঘোষিত যে কোন একটি সর্বসম্মত আসনে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হবেন এবং নির্বাচিত হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪। তার নির্বাচন এবং সাংসদ হিসেবে শপথ গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি বর্তমান সংসদ ভেঙ্গে দেবেন।

৫। সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করবেন।

৬। রাষ্ট্রপতি উত্তরাধিকারের দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে দায়িত্ব পালন করে যেতে অনুরোধ করবেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবেন।

৭। রাষ্ট্রপতি তখন সর্বসম্মতিভাবে উপনির্বাচনে নির্বাচিত নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন।

৮। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কোনো মন্ত্রী পরিষদ থাকবেনা তবে সকল রাজনৈতিক দলের মনোনীত একটি উপদেষ্টা মন্ডলী থাকবে।

৯। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কোনো সময়সীমা থাকবে না, ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী মনোনয়নের পর তার দায়িত্ব পালন শেষ হবে।

১০। সরকার ও বিরোধী দল আলোচনায় সুবিধাজনক যে কোন প্রস্তাব পরিবর্তন করবে।

কুটনৈতিকদের এ প্রস্তাব ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদের প্রদত্ত ফর্মূলার মত হলেও ব্যারিষ্টার ইশতিয়াকের প্রস্তাব থেকে এ প্রস্তাবের পার্থক্য হলো, এ প্রস্তাবে কেবল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কথা বলা হয়েছে, উপদেষ্টা বা মন্ত্রী পরিষদের কথা বলা হয়নি। তবে সকল দলের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা মন্ডলীর কথা বলা হয়েছে। এছাড়া এ প্রস্তাবে অন্তর্বর্তী সরকারের কোন সময় সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর নির্বাচিত (Elected) প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলা হয়। এ প্রস্তাবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে তার দায়িত্ব থেকে কিভাবে নিবৃত করা হবে সে ব্যাপারেও বলা হয়েছে। ফলে এ প্রস্তাবটি সংকট সমাধানের একটি উপযুক্ত প্রস্তাব ছিল। কিন্তু সরকার এবং বিরোধী দলকে এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি স্থানে একত্রিত করা সম্ভব হয় নি বিধায় এ প্রস্তাবও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সংকট সমাধানে বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোগ ও ফর্মূলা ব্যর্থতা প্রসংগে আজকের কাগজ ৭ অক্টোবর (১৯৯৫) সংখ্যায় এক প্রতিবেদনে দেখা যায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধানে বিগত ১৮ মাসে ১১টি উদ্যোগ ১৫টি ফর্মূলা দেয়া হয়েছিল কিন্তু ফলাফল শূন্য।

পাঁচ বুদ্ধিজীবীর উদ্যোগ ঃ

খালেদা জিয়ার শাসনামলে চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানে ইতোপূর্বেকার যে সমস্ত উদ্যোগ নেয়া হয়েছিলো তার সবগুলোই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে দেশের প্রখ্যাত ৫জন বুদ্ধিজীবী সংকট সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সাবেক বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেনের নেতৃত্বে অন্যান্য বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী গণ হলেন, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান, ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহম্মেদ, সাবেক কুটনীতিক ফখরুদ্দিন আহমেদ এবং লেখক কলামিষ্ট ফয়েজ আহমেদ। এ পাঁচজন বুদ্ধিজীবী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সাথে কয়েক দফা বৈঠক করে সংকট সমাধানের উপায় খুঁজেন এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। উল্লেখিত বুদ্ধিজীবীগণ ৯ অক্টোবর (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে সংকট সমাধানের প্রস্তাব করেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং সংকট সমাধানের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বুদ্ধিজীবীগণ ১৪ অক্টোবর (১৯৯৫) বিরোধী দলীয় নেত্রীর সাথে এক বৈঠক করেন কিন্তু বিরোধী দলীয় নেত্রী তাদের ঘোষিত রূপ রেখা অনুযায়ী নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া নির্বাচনে যাবেন না বলে স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দেন। ১৬ অক্টোবর বুদ্ধিজীবীগণ পুনরায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী পাঁচ বুদ্ধিজীবীকে বলেন, "আমার পদত্যাগের পর বিএনপির একজন মনোনীত সংসদ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হবেন।"[১৪৩] প্রধানমন্ত্রী আরও জানান যে, যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী প্রয়োজনে একজন 'টেকনোক্র্যাট' মন্ত্রী নিযুক্ত করতে ও রাজি আছেন। এরপর বুদ্ধিজীবীগণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান হিসেবে একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি খুজেন। তাদের ধারণা একজন সর্বসম্মত নিরপেক্ষ নির্দলীয় ব্যক্তির সন্ধ্যান মিললেই সংকটের সমাধান সহজ হবে। কিন্তু সমস্যা হল বিরোধী দলের সংসদে প্রতিনিধিত্ব না থাকা। সংসদে কেবল মাত্র সরকারী দলের প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কোন দলের প্রতিনিধি ছিলো না। সেক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান যিনি হবেন, সাংবিধানিকভাবে তাকে উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রেও দেখা যাচেছ যে ব্যারিষ্টার ইশতিয়াকের ফর্মূলা অনুযায়ী এ সংকটের সমাধান নিহিত রয়েছে। ১ নভেম্বর (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সাথে তৃতীয় বৈঠকে এ আশ্বাস প্রদান করেন যে বিরোধী দল আলোচনার টেবিলে এসে যদি তত্ত্বধায়ক সরকারের কথা বলেন, তা হলেও তা বিবেচনা করবেন এবং সে অনুযায়ী আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। এ বৈঠকের ১ দিন পর ২ নভেম্বর বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সাথে বুদ্ধিজীবীদের বৈঠকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে প্রধান বিচারপতির নাম প্রস্তাব করেন। উক্ত বৈঠকে বিরোধী দলীয় নেত্রী সরকারের কাছে ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নাম আহবান করেন। উক্ত বৈঠকে বিরোধী দলীয় নেত্রী সরকায়ের কাছে ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নাম আহবান করেন। বিরোধী দলের প্রস্তাবিত প্রধান বিচারপতি বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোর সরকারের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করার অবকাশ নেই।

উল্লেখ্য যে, ২৫ অক্টোবর (১৯৯৫) ৫ জন বুদ্ধিজীবীর মধ্যে চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এ.কে.এম সাদেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নির্বাচন কমিশনকে আরও স্বাধীন ও শক্তিশালী করা যায়, যার মাধ্যমে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ করেন। সুপারিশের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনের দপ্তর থেকে সরাসরি নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের কথা ও বলা হয়েছে। এছাড়াও আরও অধিক নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ এবং সরকারী এবং বিরোধ দলের জন্য রেডিও এবং টেলিভিশনে সমান সুযোগ দেয়ার কথাও সুপারিশে বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে ৯ নভেম্বর (১৯৯৫) পাঁচজন বুদ্ধিজীবী নিজেদের মধ্যে এক বৈঠকে শেষে তাদের উদ্যোগকে স্থগিত রাখেন কারণ রাজনৈতিক সংকটের প্রতিদ্বন্দ্বী দু'পক্ষকে এ টেবিলে আনা সম্ভব না এ সংকটের সমাধান করা সম্ভব। সরকার চায় সাংবিধানিক কাঠামোর আওতায় সংকট সমাধানের; অন্যদিকে বিরোধী দল চায় সংবিধানের বাইরে তাদের প্রস্তাবিত ফর্মূলা অনুযায়ী যার ফলে সংকট যেই তিমিরে ছিলো সে তিমিরেই থেকে গেল।

রাজনৈতিক সংকট নিরসনে বেগম জিয়া- শেখ হাসিনা পত্র বিনিময় ঃ বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন যখন তুঙ্গে। সংকট সমাধানের সকল উদ্যোগ ব্যর্থ হলে বাংলাদেশের এ চরম রাজনৈতিক সংকটের মুখে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা উপলব্ধি করে গণতন্ত্র রক্ষার্থে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংকট সমাধানের লক্ষ্যে নিজেই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী সর্ব প্রথম পত্রের মাধ্যমে বিরোধী জোট নেত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনাকে পত্রের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের আহবান জানান। এ সূত্রে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রীর মধ্যে কয়েকটি পত্র বিনিময় হয়েছে। যদিও এ পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে সংকটের সমাধান হয়নি তবে এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সংকট সমাধানের সদিচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত নিম্নে আলোচিত হলো ঃ

২৮ অক্টোবর (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আলোচনায় বসার অনুরোধ জানিয়ে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে পত্র দিয়েছেন। ৩০ অক্টোবর (১৯৯৫) বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর চিঠির উত্তর দেন। চিঠিতে শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি নীতিগতভাবে মেনে নিতে ও আলোচনার বিষয়বস্তু পূর্বেই ঠিক করার আহবান জানান। এছাড়াও বিরোধী দলীয় নেত্রী এ পত্রের মাধ্যমে আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির ও আহবান জানান। শেখ হাসিনার ৩১ অক্টোবরের চিঠির জবাবে প্রধানমন্ত্রী ২ নভেম্বর (১৯৯৫) তাঁর দ্বিতীয় চিঠিতে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব পরিহার করে সংকট সমাধানের ওপর

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বারোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রীর আলোচ্য সূচি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, "আসন্ন সংসদ নির্বাচন সম্পর্কিত সমস্যাই যেহেতু এ মুহূর্তে প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা, সেহেতু এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আসন্ন সংসদ নির্বাচন সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যা সমাধান"-কে আলোচ্য হিসাবে গ্রহণ করি।"[১৪৪] এছাড়াও আলোচনার টেবিলে উভয় পক্ষের যে কোন বিষয় সম্পর্কে উন্মুক্ত আলোচনায় সুযোগ থাকবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। (সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে লেখা প্রধানমন্ত্রীর এ দ্বিতীয় চিঠিটি পরিশিষ্ট-১ এ উল্লেখ করা হল।)

প্রধানমন্ত্রীর এ দ্বিতীয় চিঠির প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সাথে আলোচনা করে এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, "প্রধানমন্ত্রী অর্থপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সংকটের সমাধান চায় না, আন্দোলনকে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যেই এ সব চিঠি লেখা হচ্ছে"[১৪৫] ৪ নভেম্বর (১৯৯৫) শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর জবাব পাঠিয়েছেন। শেখ হাসিনা তার দ্বিতীয় চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, "আমার ৩০শে অক্টোবর তারিখের পত্রে আমি নির্দলীয় তত্ত্বাবায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়টি নীতিগত ভাবে গ্রহণ করে আলোচনায় বসার পরিবেশ সৃষ্টি করার অনুরোধ জানিয়ে ছিলাম। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, আপনি এ পত্রে সে মূল বিষয়টি সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করেননি"। আলোচ্যসূচি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি সম্পর্কে পূর্ণব্যক্ত করে শেখ হাসিনা উক্ত চিঠিতে আর ও উল্লেখ করেন যে, "আলোচ্যসূচি পূর্বেই স্থির না করলে আমরা শুরুতেই অহেতুক তিক্ত বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারি। এমন একটা অনভিপ্রেত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্যেই আলোচ্য সূচি সম্পর্কে দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিরসন করেই আমাদের আলোচনায় বসতে হবে। পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার মনোভাব ব্যতীত সমঝোতা হয় না। কিন্তু প্রাথমিক পদক্ষেপ গুলোর বিষেয়ে অবশ্যই একমত হতে হবে"।[১৪৬] উক্ত চিঠিতে আওয়ামী লীগ প্রধান নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নীতিগত ভাবে মেনে নিয়ে অর্থপূর্ণ আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। বিরোধী দলীয় নেত্রীর এ চিঠি প্রথম চিঠির উত্তরেরই পুনরুক্তি। তিনি এ চিঠিতে নুতন কিছুই উল্লেখ করেননি। বিরোধী দলীয় নেত্রীর দ্বিতীয় চিঠির প্রেক্ষিতে ১২ নভেম্বর (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শেখ হাসিনার কাছে তৃতীয় চিঠি পাঠিয়েছেন। বেগম জিয়া তার তৃতীয় চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আমার ও আপনার লিখিত পত্রের মূল বিষয় ছিল আসন্ন তৃতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ নিরপেক্ষ ও শান্তি পূর্ণ করার পথে কোন অন্তরায় থাকলে তা আলোচনার মাধ্যমে দুর করে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে শহীদদের পবিত্র রক্তে অর্জিত গণতন্ত্রকে আরও সংহত করা। আমার পত্রে এ ব্যাপারে আমার সম্মতি ও আন্তরিক আগ্রহের কথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রধান মন্ত্রী পুনরায় ব্যক্ত করেন যে, "আসুন আমরা বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনায় বসি। আপনারা বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কিত যে কোন বিষয় আলোচ্যসূচি হিসেবে উত্থাপন করতে পারেন। তবে অর্থবহ আলোচনার স্বার্থে পূর্বশর্ত আরোপ করা সঠিক হবেনা"[১৪৭] প্রধানমন্ত্রীর এ চিঠির পর বিরোধী দলের কাছ থেকে আপাতত কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। প্রকৃতপক্ষে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আলোচনায় আসার কোন সদিচ্ছা ছিল না কেননা প্রধানমন্ত্রী তার চিঠিতে বিরোধী দলের মূল দাবি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী তার দ্বিতীয় চিঠিতে যেখানে স্পষ্টভাবে "আসন্ন সংসদ নির্বাচন সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যা সমাধান"-কে আলোচ্যসূচি হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন। কাজেই বিরোধী দল আসন্ন সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান অবাধ ও নিরপেক্ষ করতে আলোচনা করতে পারতেন। সরকারী তরফ থেকে এ কথা পূর্বশর্ত আরোপ করে আলোচনায় যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে রেখেছেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জয়লাভের পর পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী যখন ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করছিল তখন কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন পূর্ব শর্ত ছাড়াই ইয়াহিয়া খান ও পিপিপি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে আলোচনার টেবিলে বসেছেন। এমনকি আলোচনার কোন অগ্রগতি না হওয়া সত্ত্বেও আলোচনা চালিয়ে গেছেন। তাছাড়া সমঝোতার লক্ষ্যে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী আলোচনা ভেঙ্গে দিয়ে নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের ওপর হঠাৎ আক্রমন করে। যার পরিনতি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সে বঙ্গবন্ধুরই কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আলোচনায় অনভিপ্রেত অবস্থার সৃষ্টির আশংকায় আলোচনা থেকে বিরত থাকেন। বিএনপি একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার হওয়া সত্ত্বেও বিরোধী দলের দাবির প্রেক্ষিতে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণে প্রস্তুত ছিলো। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী ২১ নভেম্বর (১৯৯৫) জাতীয় সরকার গঠনের আহবান করেন এবং সর্বোপরি ২৪ নভেম্বর রাষ্ট্রপতিকে ৫ম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার অনুরোধ করেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৫ম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির ১ দিন পর ২৬ নভেম্বর বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর তৃতীয় চিঠি প্রেরণ করেন। উক্ত চিঠিতে বিরোধী দলীয় নেত্রী সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ায় বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত চিঠিতে তিনি রাষ্ট্রপতিকে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার গঠনের পরামর্শ দেয়ার অনুরোধ করেন।

২ ডিসেম্বর (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে সংকট নিরসনের প্রচেষ্টা হিসেবে তার চতুর্থ এবং শেষ চিঠি দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তার চতুর্থ চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে, "বিদ্যমান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মত বিনিময় করার জন্যেই আমি বারবার আপনাকে আলোচনায় বসার অনুরোধ জানিয়েছি। আলোচনায় বসে যুক্তি ও সংবিধান অনুযায়ী আমরা যে সমঝোতায় উপনীত হবো তা বাস্তবায়নের জন্যে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।" তিনি উক্ত চিঠিতে আরও উল্লেখ করেন যে, "আপনারও জানা আছে যে, শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সংবিধান অনুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হবার আগেই আমি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর প্রস্তাব করেছিলাম। আমরাই বিরোধী দলের সমান সংখ্যক

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় নির্বাচনকালীন সময়ের জন্যে অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিলাম এবং নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানিয়েছি। এর কোনোটাই আমার ক্ষমতা দীর্ঘতর করার ইচ্ছা প্রমান করে না"।[১৪৮] এছাড়া উক্ত চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী পুনরায় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যা নিরসনের আহবান জানান। কিন্তু রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্যে বিরোধী দল আলাপ আলোচনায় রাজী হলেন না। দু'নেত্রীর পত্র বিনিময় থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে দু'দলের মত পার্থক্য খুব বেশী ছিলনা। প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে সংকট সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি করে তার সদিচ্ছার প্রমান দিয়েছেন। কিন্তু বিরোধী দল তাদের দাবি থেকে একচুল পরিমানও ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রধানমন্ত্রী তার চিঠিতে বিরোধী দলীয় নেত্রীকে যে কোন বিষয়ে আলোচনার কথা বলেছিলেন। এমতাবস্থায় আলোচনার টেবিলে যদি দু'পক্ষ আসতেন তা হলে সংকটের অবশ্যই সমাধান হতো বলে আমার বিশ্বাস। কেননা তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী ছিল না। যেহেতু উভয়েরই লক্ষ্য একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। তবে দৃষ্টিভঙ্গি একটু ভিন্ন। প্রধানমন্ত্রী চেয়েছেন বর্তমান সংবিধানের আওতায় সমস্যার সমাধান করতে। কিন্তু বিরোধী দলীয় নেত্রীর দাবি বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোয় সম্ভব ছিলো না। যদি উপনির্বাচনে বিরোধী দল অংশ গ্রহণে রাজী হতো তা হলেই বিরোধী দলের দাবি অনুযায়ী সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সম্ভব ছিল।

প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব ঃ

পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির পূর্বে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২১ নভেম্বর (১৯৯৫) উপনির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। ঐ দিন প্রধানমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেন, "আমি মনে করি বর্তমান বিরাজমান সমস্যা সমাধানের এখনো পথ আছে এবং

Dhaka University Institutional Repository

সাংবিধানিকভাবে এ সমস্যার সমাধান করা যায়। আমি আবার বিরোধী দল গুলোকে আহবান জানাই যে, আসুন আমরা একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠন করি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য। বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, "কিন্তু বিরোধী দল গুলো যদি উপনির্বাচনে অংশ গ্রহণে রাজি না হয়, সমঝোতার স্বার্থেও এটা না করে তা হলে আমি রাষ্ট্রপতিকে উপযুক্ত সময়ে সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য অনুরোধ করবো। এ ক্ষেত্রে আর উপনির্বাচনের প্রয়োজন হবে না।" প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় উপনির্বাচন অত্যাসন্ন এবং জাতীয় সংসদের সময় ও এসে গেছে। এ স্বল্প সময়ের মধ্যে দু'টো নির্বাচন করা খুবই কষ্ট সাধ্য। তিনি আরও বলেন, "এছাড়াও উপনির্বাচনের মাধ্যমে যারা নির্বাচিত হবেন অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তাদের জাতীয় নির্বাচন মোকাবেলা করতে হবে। এ জটিলতা কারো প্রত্যাশিত নয়। এসব কারণে আগেই বলা হয়েছে যে, বিএনপি উপনির্বাচনে আগ্রহী নয়। কিন্তু বিরোধী দলগুলো উপনির্বাচনের সুযোগ নিতে পারে।" সর্বশেষে তিনি বিবৃতিতে বলেন, "সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব উপনির্বাচনও নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা এবং এর আয়োজন করা। কোনো সময় কমিশন উপনির্বাচন ঘোষণা করবে।"[১৪৯] প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সরকারের আহবানে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ২১ নভেম্বর রাতে সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বলেন, "জাতীয় সরকার জনগণের দাবি নয় এবং এটা সংবিধানেরও নেই। জাতীয় সরকার যদি প্রধানমন্ত্রী করতে চান তা হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আপত্তি কোথায়"।[১৫০] তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা জাতীয় সরকারের প্রধান কে হবেন সেটিই হচ্ছে বিবেচ্য বিষয়। কারণ জাতীয় সরকারের প্রধান ব্যক্তি যদি কোন দলের না হন এবং তিনি যদি সংসদ সদস্য হন তাহলে জাতীয় সরকারকেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারও বলা যায় এবং সেক্ষেত্রে ঐ সরকার সাংবিধানিক সরকার হবে। জাতীয় সরকারের ধারণা সংবিধানে নেই সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের এ ধারণ ঠিক নয়। কারণ সংবিধানে বলা হয়েছে যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তাকে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্যের সমর্থন থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রী কোন দলের হবেন কিংবা কোন দলের হতে পারবেন না এমন কথা সংবিধানে বলা নি। কাজেই অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের প্রতি যদি সকল সংসদের সমর্থন থাকেন তাহলে তাকে অ-সাংবিধানিক বলা যাবে কিভাবে। বরং বিরোধী দল সংবিধান সংশোধন ব্যতিরেকে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের কথা বলেছেন তা অসাংবিধানিক। একই দিন সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ কালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এ.কে.এম সাদেক বলেন, "এখন তিনটি বিকল্প আছে, উভয় পক্ষের সমঝোতার মাধ্যমে উপনির্বাচন করে সংকটের সমাধান; দ্বিতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন, আর তা না হলে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে আমাদের উপনির্বাচন করতেই হবে। আমি রাজনীতিকদের দিকে অধীরে আগ্রহে তাকিয়ে আছি, অপেক্ষা করছি প্রথম দু'টি বিকল্পের কিছু হয় কিনা।"[১৫১] কিন্তু রাজনীতিবিদরা কোন সমঝোতায় না পৌছাতে পারায় নির্বাচন কমিশন সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ঘ) উপনির্বাচন প্রস্তুতি ও ৫ম জাতীয় সংসদের বিলুপ্তি ঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধানের সকল উদ্যোগ ব্যর্থ হলে নির্বাচন কমিশন উপনির্বাচনের আনুষ্ঠানিক আয়োজন করেন। ২০ জুন (১৯৯৫) থেকে বিরোধী দলের আসন সমূহ শূন্য হওয়ার পর সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা আছে। সে অনুযায়ী ১৭ সেপ্টেম্বর (১৯৯৫) মধ্যে উপনির্বাচনের বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন ৯ আগষ্ট (১৯৯৫) বন্যাজনিত দৈবদুর্বিপাকের কারণে সংবিধানের ১২৩(৪) অনুচ্ছেদ মোতাবেক বিরোধী দলের শুন্য আসনগুলোর উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সময়সীমা আরও ৯০ দিন বৃদ্ধি করেন। এ বর্ধিত সময়সীমা অনুযায়ী ১৬ ডিসেম্বর (১৯৯৫) এর মধ্যে জাতীয় সংসদের শূন্য ১৪৫টি আসনের নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন নি, কারণ নির্বাচন কমিশন আশা করেছিলেন রাজনীতিবিদরা সংকটের সমাধান করলে ১৪৫টি আসনের উপনির্বাচনের প্রয়োজন হবে না। প্রধান নির্বাচন কশিনার ২১ নভেম্বর সাংবাদিকদের সাথে এক সাক্ষাৎকারও এ আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। প্রধান নির্বাচন কমিশন সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ১দিন পর ২২ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদের ১৪৫টি শূন্য আসনের তফসিল ঘোষণা

Dhaka University Institutional Repository

করেন। ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী ১৫ ডিসেম্বর (১৯৯৫) উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়। এছাড়াও নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী ২৪ নভেম্বর মনোনয়ন পত্র দাখিল, ২৫ নভেম্বর মনোনয়ন পত্র বাছাই এবং প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিন নির্ধারণ করা হয় ২৯ নভেম্বর। উপনির্বাচনের এ তফসিল ঘোষণা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের এক ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, "নির্বাচন কমিশন বন্যা জনিত দৈবদর্বিপাকের কারণে জাতীয় সংসদের শূন্য ঘোষিত আসন গুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় ৯০ দিন বর্ধিত করে। তবে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতির পরপরই দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেই নির্বাচন কমিশন শূন্য আসনগুলোতে নির্বাচনের তফসিল এ যাবত ঘোষণা করেনি। কিন্তু সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে জাতীয় সংসদের শুন্য আসনগুলোর নির্বাচন আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে বিধায় নির্বাচন কমিশন ১৪৫টি নির্বাচনী এলাকার শূন্য আসনে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচনের জন্যে এ সময়সূচি ঘোষণা করেছে।"[১৫২] সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার সময়সীমার সর্বশেষ প্রান্তে এসে নির্বাচন কমিশন এ তফসিল ঘোষণা করেছেন। নির্বাচন কমিশনের এ তফসিল ঘোষণা আনুষ্ঠানিকতা ছিল মাত্র। কেননা এমনি পরিস্থিতিতে সরকার কিংবা নির্বাচন কমিশন কেহই এভাবে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানে আগ্রহী নয়। প্রধানমন্ত্রী ২১ নভেম্বর এক বিবৃতিতে এ কথা স্পষ্ট করেছেন। এরই প্রেক্ষিতে উপনির্বাচনের মনোনয়ন পত্র দাখিলের দিনই ২৪ নভেম্বর (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংবিধানের ৫৭(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে সংসদ ভেঙ্গে দেবার পরামর্শ দেন। সংবিধানের ৫৭(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন হারাইলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন কিংবা সংসদ ভাংগিয়া দিবার জন্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান করিবেন এবং তিনি অনুরূপ পরামর্শদান করিলে রাষ্ট্রপতি, অন্যকোন সংসদ সদস্যের সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নহেন এই মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, সংসদ ভাংগিয়া দিবেন।"[১৫৩] প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশের পরপরই রাষ্ট্রপতি পঞ্চম জাতীয় সংসদের মেয়াদ পূর্তির ৫ মাস পূর্বেই ভেংগে দিলেন। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ইতিহাসে কোন সংসদই তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেনি। তবে পঞ্চম জাতীয় সংসদই বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘতম সংসদ হিসেবে কার্য-পালন করেছে। একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পঞ্চম জাতীয় সংসদ ১৯৯১ সালের ৫ এপ্রিল যাত্রা শুরু করে। বিরোধী দলের ১৪৫টি আসন শূন্য হওয়ার প্রেক্ষিতে চরম রাজনৈতিক অচলাবস্থার মুখে ৪ বছর ৭ মাস ২০ দিনের মাথায় এ পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিলুপ্ত হলো। ২২টি অধিবেশনের মাধ্যমে এ সংসদের মোট কার্য দিবস ছিল ৪০০ দিন।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির ফলে চলমান রাজনৈতিক সংকটের পাশাপাশি সাংবিধানিক সংকট যুক্ত হলো। তবে এর ফলে সংকট সমাধানের সমঝোতার লক্ষ্যে আরও কিছু দিন সময় পাওয়া গেল। ৫ম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির ফলে নির্বাচন কমিশনকে ২১ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৬) এর মধ্যে অর্থাৎ ৯০ দিনের মধ্যে নতুন জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। ২৪ নভেম্বর (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির পূর্ব মুহূর্তে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক রেডিও ও টেলিভিশন ভাষণে বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির প্রেক্ষিতে তার গৃহীত পদক্ষেপ ও পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের ও বর্ণনা দিয়েছেন। উক্ত ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন যে, "১৯৯৩ সালে তিনটি বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিনটি বিল উথাপন করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিলনা এবং তাদের মধ্যে কোন ঐকমত্য ও ছিলনা। বিরোধী দলের সংসদ বয়কট সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বিরোধী দল সমূহ যদি সংসদ বয়কট না করে জাতীয় সংসদে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতেন তাহলে সংকটের সমাধান সম্ভব হতো। প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে ১৯৯০ এবং ১৯৯৫ এর প্রেক্ষাপট এক নয় বলে উল্লেখ করেন যে, ১৯৯০ সালে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি বহাল থাকায় তিন জোটের রূপরেখার ভিত্তিতে সাংবিধানিকভাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন সম্ভব হয়েছিলো। কিন্তু ১৯৯৫ সালে সংসদীয় সরকার বজায় থাকায়

Dhaka University Institutional Repository

সাংবিধানিক কাঠামোয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের নেতিবাচক আন্দোলনের সমালোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী সংকট সমাধানের জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে বিরোধী দলীয় নেত্রী পূর্বশর্ত দিয়ে আলোচনায় যেতে অস্বীকার করেন। ফলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার পথ রুদ্ধ হলো। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে বলেন, "আমরা আন্তরিকভাবেই অর্জিত গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য অবাধ, শান্তিপূর্ণ, সন্ত্রাস মুক্ত ও কারচুপিবিহীন নির্বাচন চাই। যে কোন সরকার কিংবা সরকার বিরোধী কোন শক্তি যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সেজন্য ইতিমধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত আইনের ব্যাপক সংশোধন করে নির্বাচন কমিশনকে অনেক বেশী শক্তিশালী করা হয়েছে। নির্বাচন পদ্ধতি উন্নত করা হয়েছে। এখন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার দিন থেকেই নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী প্রশাসন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণাধীন হবেন। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন যখন যে সহযোগিতা চাইবে- তা প্রদান করা সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জালভোট নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ভোটার রেজিস্ট্রেশন সহ পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ফলে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের যথাযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যবস্থার অধীনে জনগণ নির্বিঘ্নে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।" গণতন্ত্র ও সংবিধান প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "জনগণের অধিকার ও স্বার্থের রক্ষাকবচ হলো গণতন্ত্র। আর গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হলো সংবিধান। জনগণের পক্ষের শক্তি বলেই আমরা গণতন্ত্রের প্রশ্নে আপোষহীন, সংবিধানের মর্যদা রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, এ ব্যপারে আমাদের প্রতি আপনাদের পূর্ণ সমর্থন ও আস্থা রয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতার চেয়ে আপনাদের অবস্থা, সমর্থন ও ভালবাসার মূল্য আমাদের কাছে অনেক বেশী। আর সে কারণেই অতীতেও যেমন ক্ষমতার লোভে কারও সাথে আতাঁত কিংবা আপোষ করিনি, এখনও কোন অন্যায় অসাংবিধানিক দাবির কাছে নতি স্বীকার করতে পারিনা"।[১৫৪] উক্ত ভাষণে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আলাপ

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনার মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান না হওয়ার কারনে তিনি তার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রাষ্ট্রপতিকে ৫ম জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী এ আশাবাদ দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন যে, সংবিধানের বাইরে তিনি কোন কিছু করবেন না। প্রধানমন্ত্রীর এ ভাষণের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র এবং সংবিধানের প্রতি আস্থা ও দৃঢ়চেতা মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাংবিধানিক ধারা অক্ষুন্ন রাখতে প্রধানমন্ত্রীর আর কোন বিকল্প ছিল না।

রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সর্ব শেষ প্রয়াস ঃ

পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির পর একটি অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বিভিন্ন মহল থেকে জোর প্রচেষ্টা চলে। রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রয়াস হিসেবে মার্কিন রাষ্ট্রদুত ডেভিড এন মেরিল সরকার এবং বিরোধী দলের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করেন। মার্কিন রাষ্ট্রদুত আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হয়। ২৯ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট এর এক বক্তব্যে বলা হয়, "that the U.S. Government would continue to urge both the leaders of Bangladesh to resolve their differences so that free, fair and fully contested election could be help peacefully."[১৫৫] যুক্তরাষ্ট্রের উক্ত বক্তব্যের আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, "The Government and the opposition in Bangladesh would demonstrate" creativity and flexibility to overcome a lengthly political statemate that threatened democratic process and undermined economic program"[১৫৬]

২৭ নভেম্বর (১৯৯৫) আজকের কাগজে প্রকাশিত কুটনৈতিকদের প্রচেষ্টায় সর্বশেষ সমঝোতার রূপ রেখায় বলা হয়েছে-

"প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করবেন এবং মন্ত্রী সভা ভেঙ্গে দেবেন। এরপর রাষ্ট্রপতি তাকে দায়িত্ব অব্যাহত রাখার জন্যে

Dhaka University Institutional Repository

অনুরোধ করবেন। প্রধানমন্ত্রী সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবেন। এরপর রাষ্ট্রপতি তার করণীয় নির্ধারণের জন্যে সর্বদলীয় বৈঠক আহবান করবেন। এ বৈঠকের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি একটি নির্দলীয় উপদেষ্টা মন্ডলী গঠন করবেন। এরপর বিষয়টির সাংবিধানিক বৈধতা যাচাই করার জন্যে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টে একটি রেফারেন্স পাঠাবেন। এর মধ্যে বিরোধী দলের দাবী অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হবে। সকল রাজনৈতিক দলের অনুরোধে বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম. এ. সাদেক পদত্যাগ করবেন।"[১৫৭] এ সমঝোতা প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার ১ দিন পর ১৯ নভেম্বর আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ নয় বলে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পক্ষান্তরে ১ ডিসেম্বর (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় কালে বলেন, "বিরোধীদল যদি আলোচনার টেবিলে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে রাজি হয় এবং এটা যদি সংবিধানের মধ্যে হয় তা হলে এতে আমার আপত্তি নেই।"[১৫৮] অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী সাংবিধানিক কাঠামোয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে রাজি ছিলেন। এর পূর্বে ২৬ নভেম্বর (১৯৯৫) বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে এক টেলিফোন সংলাপে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী কে পদত্যাগের অনুরোধ করেন এবং রাষ্ট্রপতিকে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সুপারিশ করতে বলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রীর এ আহবান নাকচ করে দেন এবং তিনি শেখ হাসিনাকে পুনরায় আলোচনায় বসার আহবান জানান এবং কোন পূর্বশর্ত ছাড়াই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে বলেন।

রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাবকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ ধরণের সরকার গঠনে সাংবিধানিক সমস্যা দেখা দিবে। কারণ রাষ্ট্রপতি অন্তর্বর্তীকালীন কিংবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার কেবল তাদের নিয়েই করতে পারেন যারা পূর্ববর্তী সংসদের সদস্য ছিলেন। ৫ম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির পূর্বে ঐ সংসদে দলের কোন সংসদ সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেননা। কাজেই বিরোধী দল সরকারী দলের সমন্বয়ে অন্তর্বর্তী সরকারে রাজি হবেন কেন। তাছাড়া নির্বাচন অনুষ্ঠানের যথেষ্ট সময় থাকবে কিনা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

৪ ডিসেম্বর (১৯৯৫) বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বি.বি.সি'র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে এবং রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে তিনি তখন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে পারবেন।"। তিনি উক্ত সাক্ষাৎকারে আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করার পরে বিরোধী দল আলোচনায় বসতে পারে। তখন আলোচনা করে ঠিক করতে পারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কে হবেন।"[১৫৯] কিন্তু আমাদের সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলেই তাকে দায়িত্ব থেকে অপসারন করা যায় না। তার উত্তরাধিকারী দায়িত্ব গ্রহণ করা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীকে দায়িত্ব থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না। এ কথা সংবিধানের ৫৭(৩) অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা আছে। তাছাড়া উত্তরাধিকারী নির্বাচন অবশ্যই হতে হবে সাংবিধানিকভাবে। 'দৈনিক ইত্তেফাক' ৫ ডিসেম্বর ১৯৯৫ সংখ্যার সম্পাদকীয়কে আরও বলা হয়েছে, "প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে উভয় পক্ষের সমান সংখ্যক নির্দলীয় ব্যক্তির সমন্বয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রস্তাব বিবেচনার জন্যে রাজনৈতিকদের প্রতি আহবান জানাই।" উক্ত সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয়েছে যে, "ক্ষমতার লড়াইতে সবাই মত্ত। কিন্তু বুঝতে হবে গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক ধারা বিঘ্নিত হলে এ রাজনীতিকদের আপন পূর্বসূরীদের দুর্ভাগ্য বরণ করতে হবে।"[১৬০] ৫ জানুয়ারী (১৯৯৬) গণফোরাম নেতা ড. কামাল হোসেন এক সংবাদ সম্মেলনে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদের রূপ রেখা দিয়ে রেফারেন্স পাঠাতে অনুরোধে করেন। একই দিন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠক করে তত্ত্বাবদায়ক সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক আহবান জানান। কিন্তু রাষ্ট্রপতির একক কোন ক্ষমতা নেই যার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বিরোধী দলের উক্ত দাবি পূরণ করতে পারেন। কারন দ্বাদশ সংশোধনী পাশের পর রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রপতি মধ্যস্থতা করতে পারেন মিমাংসার প্রস্তাব ও উদ্যোগ নিতে

Dhaka University Institutional Repository

পারেন কিন্তু সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তি ব্যতীত প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ কিংবা তত্ত্বাবদায়ক সরকার গঠনের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নেই। তাছাড়া রাষ্ট্রপতি সংবিধান পরিবর্তন করতে পারেন না, যা কেবল সংসদ সদস্যগণই পাবেন।

৪.১ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯৬ ও সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ঃ

দেশের সাংবিধানিক ধারা বজায় থাকার লক্ষ্যে পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির পর সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ এর মধ্যে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আবশ্যকতা দেখা দেয়। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দল সমূহকে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে সরকারি দলের তরফ থেকে উদ্যোগ নেয়া ছাড়াও কুটনৈতিক পর্যায় থেকেও উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। রাজনৈতিক সংকট সমাধানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ তিন বার পরিবর্তন করা হয়। নির্বাচন কমিশন সর্ব প্রথম ৩ ডিসেম্বর (১৯৯৫) ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী ১৮ জানুয়ারী ১৯৯৬ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেন। মনোনয়ন পত্র দাখিলের তারিখ নির্ধারণ করেন ১৭ ডিসেম্বর (১৯৯৫)। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বে নির্বাচন কমিশনের এক ঘোষণায় বলা হয়, "রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গত ২৪ নভেম্বর ১৯৯৫ দেশের জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার কারণে সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ এর মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং আগামী জানুয়ারী মাসের শেষার্ধ থেকে পবিত্র রমজান মাস শুরুর বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করেছে।"[১৬১] নির্বাচন কমিশন এ তফসিল ঘোষণা সত্ত্বেও বিরোধী দল সমূহ নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে জানান। পক্ষান্তরে তফসিল ঘোষণার পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এ.কে.এম. সাদেক এবং বিএনপি মহাসচিব ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার

Dhaka University Institutional Repository

সকল রাজনৈতিক দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বিরোধী দল এ নির্বাচনকে সামনে রেখে ৯ ডিসেম্বর থেকে ৭২ ঘন্টার হরতাল কর্মসূচি পালন করেন। ১৪ ডিসেম্বর (১৯৯৫) বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'That she was ready to open a dialogue with Begum Khaleda only after her resignation from the position of Prime Ministers"[১৬২] ১৫ ডিসেম্বর (১৯৯৫) নির্বাচন কমিশন চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধান ও ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল গুলোর বৈঠক আহবান করেন। উক্ত বৈঠকে প্রধান প্রধান বিরোধী দল সমূহ অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। বৈঠকে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াত, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও জাসদ (রব) এর অনুপস্থিতিতে বিএনপি সহ ৬০টি রাজনৈতিক দলের ৮৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে অংশ গ্রহণকারী দল সমূহের অনুরোধের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করেন। সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী ৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৬) দ্বিতীয় বারের মত নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করেন। কিন্তু বিরোধী দল তাদের দাবিতে অটল থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পরিবর্তে নির্বাচন প্রতিহত করার কথা বলেন। সে লক্ষ্যে দ্বিতীয়বার নির্ধারিত নির্বাচনের তফসিল মোতাবেক নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় ৩ ও ৪ জানুয়ারী (১৯৯৬) ৪৮ ঘন্টা হরতাল আহবান করেন। ফলে নির্বাচন কমিশন মনোয়নপত্র দাখিলের শেষ সময় নির্ধারণ করেন ৮ জানুয়ারী (১৯৯৬) কিন্তু ৮ জানুয়ারী (১৯৯৬) নির্বাচন কমিশন সর্বশেষ তৃতীয় বারের মত নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে ১৫ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৬) নির্ধারণ করেন। নির্বাচনের পরিবর্তিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়ন পত্র দাখিলের তারিখ নির্ধারণ করা হয় ১৭ জানুয়ারী (১৯৯৬)। সরকারী দলের পক্ষ থেকে এ নির্বাচনকে কেবল মাত্র সংবিধান রক্ষার জন্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়। যেহেতু সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে যে কোন কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে একদিকে যেমন সরকারের বৈধতা হারাবে অপর দিকে দেশ এক মহা সাংবিধানিক বিপর্যয়ে পতিত হবে। বিরোধী দল সমূহ নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিলের দিন (১৭ জানুয়ারী) সকাল সন্ধ্যা হরতাল

Dhaka University Institutional Repository

আহ্বান করেন। নির্বাচন কমিশন সর্বশেষ তফসিল ঘোষণা করে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, "সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে। যেহেতু ২১ ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই শহীদ দিবস, ঈদুল-ফিতর, শবেই কদর, এবং জুমাতুলবিদা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান রয়েছে। সেহেতু ১৫ ফেব্রুয়ারীর পর কোন অবস্থাতেই নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়, তাই ১৫ ফেব্রুয়ারী '৯৬ ভোট গ্রহণের চূড়ান্ত দিন ধার্য করে এ সংশোধিত সময়সূচি ঘোষণা করা হয়।"[১৬৩] কাজেই নির্বাচন কমিশনের এ বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক নির্বাচনের তারিখ আর পরিবর্তন করা সম্ভব নয় এবং ঘোষিত তারিখেই নির্বাচন হতে হবে।

নির্বাচনের তফসিলকে সামনে রেখে মনোনয়ন পত্র দাখিলের ১দিন পূর্বে ১৬ জানুয়ারী (১৯৯৬) সরকার এবং বিরোধী দলের সংকট সমাধানের সর্বশেষ প্রচষ্টা হিসেবে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড এন মেকিল, যুক্তরাজ্যের হাই কমিশনার পিটার জে ফাউলার, জাপানের ইয়শিকাজু কেনিকো, কানাডার জন ডেস্কট, অষ্ট্রেলিয়ার এম পিনাল ও ইটালির ডঃ রাফেন মিনিরো এ ৬ জন কুটনৈতিক সমঝোতার লক্ষ্যে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে বৈঠক করেন। কিন্তু এতে বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ব্যতীত নির্বাচনে যেতে অস্বীকার করেন। সরকারী দলের পক্ষ থেকে সংবিধানের আওতায় সর্বোচচ ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিলো। বিরোধী দলের দাবি পূরণ বিএনপির পক্ষে সম্ভব ছিলনা। বিরোধী দলের দাবি পূরণ করতে হবে, আনুষ্ঠানিকতা হলেও ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন করতে হবে। কারন এত অল্প সময়ের মধ্যে সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে গণফোরাম নেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেছেন, "জনগণকে আস্থায় না এনে আওয়ামী লীগের বর্তমান আন্দোলনে জনগণ ক্ষুব্ধ। সর্বস্তরের জনগণ তাদের কার্যকলাপে হতাশ। এতে রাজনৈতিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলছে। এ আস্থাহীনতা নেতৃত্ব ও গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। রাজনৈতিক দলের এ ভুলের জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ পায়"। তিনি আরও বলেন, "সরকার পতনের বক্তব্য সংসদীয় পদ্ধতির ভাষা নয়।"[১৬৪]

নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র দাখিলের দিন ১৭ জানুযায়ী (১৯৯৬) প্রধান বিরোধী দল সমূহের নির্বাচন বয়কটের মুখে সরকারী দল বিএনপিসহ ৪১টি রাজনৈতিক দল ও জোট এবং নির্দলীয় প্রার্থীর পক্ষ থেকে মোট ১৯৮৭ জন মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। এরমধ্য থেকে ১০৮ জনের মনোনয়ন পত্র বাতিল হলে বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা দাড়ায় ১৯৭৯ জন। তবে ২৩ জানুয়ারী মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে ৩৬৫ জন মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের পর চুড়ান্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর সংখ্যা দাড়ায় ১৫১৪ জন। এর মধ্যে ৪৭টি আসনে একক প্রার্থী থাকায় ৪৭ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪৭ জনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া একটি আসনসহ দলের শীর্ষ স্থানীয় অধিকাংশ নেতা হয়েছেন। বিনা প্রতিন্দন্দ্বিতায় নির্বাচিত উল্লেখযোগ্য শীর্ষ স্থানীয় বিএনপির নেতৃবৃন্দ হলেন, স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী, সংসদ উপনেতা ডাঃ এ.কিউ.এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, মির্জা গোলাম হাফিজ, এস.এম. মোস্তাফিজুর রহমান, মহাসচিব ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার, কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ, এম. শামসুল ইসলাম, আব্দুল মতিন চৌধুরী, চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, ব্যারিষ্টার আমিনুল হক, এম. এ. মান্নান, আমান উল্লাহ্ আমান, আব্দুল হাই, তানভীর আহমেদ সিদ্দিকী সহ অনেকে। নির্বাচন কমিশন ২৭ জানুয়ারী (১৯৯৬) বিএনপির মোর্শেদ খান, ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নানকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করেন। এ নিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সাংসদদের সংখ্যা দাড়ায় ৫০ জন। ফলে ২৫০টি আসনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজন দেখা দেয়।

বিএনপি ছাড়া অন্য যেসব দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দলসমূহ হল, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ফ্রীডম পার্টি, এনডিএ, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল, প্রগশ, ভাষানী ন্যাপ, সাতদলীয় ঐক্য জোট, মুসলীম লীগ, ইউপিপি, খেলাফত আন্দোলন, জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিক সংহতি, জনতা পার্টি, জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগ, জাতীয় মুক্তি ঐক্য পরিষদ, কৃষক যুক্তফ্রন্ট, ন্যাপ ও স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং বিএনপির কিছু বিদ্রোহী প্রার্থীও নির্বাচনের প্রার্থী হয়েছেন। মনোনয়ন পত্র জমা দেয়ার শেষে ১৭ জানুয়ারী বাসসকে দেয়া এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান বলেন, "সরকার একক নির্বাচনের মাধ্যমে দেশকে আরও গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা জনমত উপেক্ষা করে নীল নকশা অনুযায়ী এক দলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কাজ করছে। এ এক দলীয় নির্বাচনে অংশ নেয়ার জন্য জনগণ ভোট কেন্দ্রে যাবে না।"[১৬৫] পক্ষান্তরে ১৯ জানুয়ারী এনডিএ মহাসচিব আনোয়ার জাহিদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচনে যাবার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, নির্বাচন প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে দেশকে একটি সরকার বিহীন ভয়াবহ অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার খেলায় এনডিএ নিশ্চুপ বসে থাকতে পারে না বলেই এনপিএ আসন্ন নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[১৬৬] ২৩ জানুয়ারী (১৯৯৬) জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক রেডিও টিভি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক ধারা অক্ষুন্ন রাখার জন্যই বিএনপি এ নির্বাচনে অংশ নিচেছন। প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে, দেশবাসী ও সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি দেশ, গণতন্ত্র ও জনগণের স্বার্থে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুরোধ জানান। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন "এ নির্বাচন গণতন্ত্র রক্ষার নির্বাচন।"[১৬৭] উক্ত ভাষণে বিরোধী দলের দাবি প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "১৯৯৫ সালের ১০ জানুয়ারি বিরোধী দলের নেত্রী প্রকাশ্য জনসভায় বলেছিলেন যে, প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হলে তিনি নির্বাচনে অংশ নেবেন। কিন্তু আমরা এতে রাজি হওয়া সত্ত্বেও তিনি এবং তার সহযোগী দলগুলি নির্বাচনে অংশ নিতে রাজি হলেন না, বরং তাদের একটি দাবি মানতে রাজি হলে তারা অন্য একটি নতুন দাবি উত্থাপন করে থাকে।"[১৬৮] নির্বাচন বর্জনরত ও আন্দোলনরত তিন বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ প্রত্যাখ্যান করেন। আওয়ামী লীগ নেত্রী এক বিবৃতিতে আরও বলেন, "সকল বিরোধী দলকে বাইরে রেখে সপরিবারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বঘোষিত খুনী ও

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধান হত্যাকারীদের এবং বহু খুনের দাগি আসামীদের নিয়ে নির্বাচনের নামে প্রহসন করে প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্র হত্যায় যে ষড়যন্ত্র করেছেন তাতে দেশবাসীর নিকট তার স্বৈরাচারী চেহারা উন্মোচিত হয়েছে।"[১৬৯] আওয়ামী লীগ সহ বিরোধী দল সমূহের নির্বাচন বর্জন সহ নেতিবাচক আন্দোলন প্রসঙ্গে ২৫ জানুয়ারী (১৯৯৬) সিপিবি'র দু'দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভার এক প্রস্তাবে বলা হয়, "সংসদের ভেতরে ও বাইরে সংগ্রাম পরিচালনার সঠিক কৌশল অবলম্বন না করে আওয়ামী লীগ একাত্তরের ঘাতক জাতীয় শত্রু জামায়াত এবং গণতন্ত্রের শত্রু পতিত স্বৈরাচার জাতীয় পার্টিকে নিয়ে সংসদ সব কিছু এক পরিকল্পিত অচলাবস্থার দিকে ধাবমান হয়েছে এবং সরকারকে এক তরফা নির্বাচন সম্পন্ন করার সুযোগ করে দিয়েছে।"[১৭০] ২০ জানুয়ারী (১৯৯৬) আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি জামায়াতে ইসলামী পৃথক পৃথক চিঠিতে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন স্থগিত বা বাতিলের দাবি জানিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে যে চিঠি দিয়েছিলেন, ২৮ জানুয়ারী প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার উত্তরে বলেছেন, নির্বাচন বাতিল বা স্থগিত সম্ভব নয় বলে যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করেছেন তাহল "একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা লংঘন করতে পারে না। ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ায় সংবিধান অনুযায়ী আগামী ২১ ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ বেঁধে দেয়া সময় সীমার মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হচেছ। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন না হলে দেশের যে কোন নাগরিক কোন রাজনৈতিক দলের কর্মীও যদি কমিশনের বিরুদ্ধে সংবিধান লংঘনের দায়ে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে মামলা দায়ের করেন, তাহলে কমিশনের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন আইনী সুযোগ থাকবেনা। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে দেশে সাংবিধানিক সংকট দেখা দেবে। সুতরাং বিষয়টি বিরোধী দলের কাছে যত অনভিপ্রেতই হোক না কেন কমিশন অপরিত্যাজ্যভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধ্য। কমিশন কোনভাবেই দেশের সংবিধান এবং অন্যান্য আইন ও বিধি লংঘন করতে পারে না। যদি সব দল নির্বাচনে অংশ না নেয় সে জন্য নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করা বাঞ্ছনীয় নয়।"[১৭১] কাজেই

Dhaka University Institutional Repository

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণেই বিরোধী দল সমূহের বাধাদান সত্ত্বেও ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে হচেছ। সরকার কিংবা নির্বাচন কমিশনের এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না যা প্রধান নির্বাচন কমিশনের উপরোক্ত ব্যাখ্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রধানমন্ত্রী ২৩ জানুয়ারী তার রেডিও টিভি ভাষণে ও সে কথা বলেছেন যে, ১৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচন স্রেফ সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার নির্বাচন।

৬ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৬) বিএনপি ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় মেনিফেষ্টো ঘোষণা করেন। উক্ত মেনিফেষ্টোর দলীয় কর্মসূচী ছাড়াও ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক কারণ উল্লেখ করে বলা হয়, "নিয়মতান্ত্রিক ভাবে গঠিত গণতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী চলতে বাধ্য। যেকোন পরিস্থিতিতেই সংবিধান লংঘন করা কোন সরকার কিংবা নাগরিকের পক্ষে সম্ভব নয়, উচিত ও নয়। সাংবিধানিক শাসন ও গণতন্ত্র পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ দুইয়ের দ্বন্দ্ব উভয়কেই ধ্বংস করে। কাজেই গণতন্ত্রের স্বার্থে সাংবিধানিক শাসন অব্যাহত রাখতে হবে এবং সাংবিধানিক শাসন অব্যাহত রাখতে হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করতেই হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদই শুধু প্রয়োজনে সংবিধানের সংশোধন করতে পারে। নির্বাচন বর্জন কিংবা নির্বাচনের বিরোধীতার মাধ্যমে সমস্যাকে জিইয়ে রাখা যায় জটিলতর করা যায়। কিন্তু যে সমস্যার সমাধানের জন্য সংবিধান সংশোধন প্রয়োজন তেমন কোন সমস্যার সমাধা করা যায় না।"[১৭২] উক্ত মেনিফেষ্টো বিএনপি পরবর্তী সংবিধান সংশোধনীর পরোক্ষ ইঙ্গত দিয়েছেন। সংবিধানকে সমুন্নত ও সাংবিধানিক শাসন বজায় রাখার লক্ষ্যে ১৯ নভেম্বর ১৯৯০ সালে প্রণীত তিন জোটের রূপ রেখার ৪ ধারার (ক) উপ ধারায় বলা হয়েছে, "জনগণের সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে দেশের সাংবিধানিক শাসনের ধারা নিরঙ্কুশ ও অব্যাহত রাখা হইবে এবং অসাংবিধানিক কোন পন্থায় ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করা হইবে। নির্বাচন ব্যতীত অসাংবিধানিক বা সংবিধান বহির্ভূত কোন পন্থাই কোন অজুহাতেই নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাইবে

Dhaka University Institutional Repository

না।"[১৭৩] মজার ব্যাপার হল মাত্র ৫ বছর পর ১৯৯৬ সালে তিন জোটের রূপ রেখার ভিত্তিতে গঠিত সরকারকেই নির্বাচন ব্যতীত ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যে তিন জোটেরই শরিক জোট সমূহ নির্বাচন প্রতিহত করার দৃঢ় শপথ করেন। যেখানে তিন জোটের রূপ রেখায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, নির্বাচন ব্যতীত অসাংবিধানিক বা সংবিধান বহিঃর্ভূত কোন পন্থায়ই কোন অজুহাতেই নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না, সেখানে নিজেদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, সংবিধানকে উপেক্ষা করে কোন সমঝোতায় না পৌঁছে দেশকে এবং নির্বাচিত সরকারকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিয়ে বিরোধী দল জাতির সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির পরিপন্থি কাজে লিপ্ত রয়েছে। সাংবিধানিক ধারা অক্ষুন্ন রাখতে নিনিয়ানের ফর্মূলা কিংবা ইতিয়াকের ফর্মূলা অনুযায়ী কিংবা সর্বশেষ রাষ্ট্রপতির অধীনে জাতীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত সরকারের মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিরোধী দল এ সাংবিধানিক সংকট উত্তরণে সহায়তা করতে পারতো। জাতীয় সরকারের মাধ্যমে গঠিত সংসদে ও বিরোধী দলের দাবি অনুযায়ী প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাশ করতে পারতেন। কিন্তু বিরোধী দল সকল সমঝোতার দ্বার রুদ্ধ করে সরকারকে ঠেলে দিলেন সংঘাতের দিকে।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সরকার গৃহীত যেকোন কর্মসূচি প্রতিহত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সকল কর্মসূচি বাধাদানের লক্ষ্যে যেখানেই প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি থাকে সেখানেই বিরোধীদল হরতাল পালন করেন। এছাড়াও নির্বাচন প্রতিহত করার লক্ষ্যে বিরোধী দল ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারী লাগাতার ৪৮ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং ১৫ ফেব্রুয়ারী হরতালের পাশাপাশি গণকার্ফু জারি করে।

১৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচনের পূর্বে ১২ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৬) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতির উদ্দেশ্য রেডিও-টিভিতে দেয়া এক নির্বাচনী ভাষণে ১৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকট সমাধানে তার আগ্রহের কথা পূণর্ব্যক্ত করে বলেন, "বিরোধী দল সাংবিধানিক

Dhaka University Institutional Repository

কাঠামোর মধ্যে নির্বাচনে রাজি হয়নি। ভবিষ্যতে নির্বাচনে সব দলের অংশ গ্রহণ করার জন্য এই নির্বাচন।" তিনি উক্ত ভাষণে আরও বলেন, "সাংবিধানিক সংকট থেকে দেশকে রক্ষার জন্য এই নির্বাচন করতেই হবে। আলোচনা আগে সফল হয়নি। পরে হতে পারে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে, যাতে সবাইকে নিয়েই নির্বাচন করা যায়।" প্রধানমন্ত্রী জনগণকে আশ্বস্ত করে বলেন, আপনারা ভোট দিন ধৈর্য ধরুন দেখুন আগামী সংসদে কি করতে পারি।"[১৭৪] প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয়েছে ভবিষ্যতে সকল দলকে নিয়ে একটি অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যেই ১৫ ফেব্রুয়ারী এ নির্বাচন।

নির্বাচনের প্রক্কালে ১৪ ফেব্রুয়ারী প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এ.কে.এম. সাদেক জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া রেডিও এবং টেলিভিশনের এক ভাষণে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তার সীমাবদ্ধতার কথা পুনঃ উল্লেখ করে বলেন, "একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা লংঘন করতে পারে না। এ নির্বাচন না হলে দেশে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে এবং গণতন্ত্র স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। বর্ণিত অবস্থায় যত অনভিপ্রেতই হোক না কেন সাংবিধানিক এবং আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণেই নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অপরিত্যাজ্যভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে বাধ্য। দেশের আইন ও বিধির মধ্যে থেকে নির্বাচন কমিশন দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা উপলব্ধি করে একাধিকবার উপনির্বাচন এবং সাধারণ নির্বাচনের তফসিল পুনঃ নির্ধারণ করা সত্ত্বেও সমঝোতা হয়নি। ফলে দেশের সকল দলের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। যদিও সকল রাজনৈতিক দলের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচন সম্ভব হলে তা আরও সুন্দর হতো।"[১৭৫]

১৫ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৬) বিরোধী দলের ব্যাপক বাধাদান, হরতাল-গণকার্ফু ও সহিংসতার মধ্যে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে নির্বাচন প্রতিরোধ সহিংসতার কারণে সকল আসনে সুষ্ঠভাবে

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নি। সহিংসতার কারনে নির্বাচনের দিন ১৩ জন মারা যায়।[১৭৬] এবং আহতের সংখ্যা অনেক। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে প্রায় ২৫% ভোটার অংশ গ্রহণ করে। তবে দেশী বিদেশী পর্যবেক্ষকদের ধারণা নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি আরও কম ছিল। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হওয়ায় ১৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচন 'বিতর্কিত নির্বাচন' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচনের দিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিন বিরোধী জোট নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচন প্রত্যাখান করে কয়েকটি নির্দেশনামা ঘোষণা করে বলেন, "জনগণ নির্বাচন প্রত্যাখান করে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। এ সরকারের বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা নেই।"[১৭৭] শেখ হাসিনার মতে জনগণ নির্বাচন প্রত্যাখান করায় সরকার আইনগত ও নৈতিক ভাবে সরকার পরিচালনার অধিকার হারিয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি যে সমস্ত নির্দেশনামা প্রদান করেন তাহল ঃ[১৭৮]

- সাংবিধানিক শূন্যতা দূর করার জন্য প্রশাসন ও আইন শৃংখলা রক্ষা বাহিনীকে অবিলম্বে প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যস্ত করা হোক।
- প্রেসিডেন্টের নির্দেশে বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা করবেন সংশ্লিষ্ট সচিবরা।
- টিএনও, ডিসি, বিভাগীয় কমিশনার, এমপি, পুলিশ কমিশনাররা সংশ্লিষ্ট সবিচদের দ্বারা পরিচালিত হবেন।

উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ হাসিনা আশাবাদ করেন যে, এ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি সকল রাজনৈতিক দলকে বৈঠকে বসার আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

উল্লোখিত নির্দেশনামা ছাড়াও নির্বাচন বাতিল এবং সরকারের পদত্যাগের লক্ষ্যে বিরোধী দল ২৪, ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ অসহযোগ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। অসহযোগ কর্মসূচি পালনকালে বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের গ্রেফতারের ফলে অসহযোগ কর্মসূচির

Dhaka University Institutional Repository

মেয়াদ ২ দিন বৃদ্ধি করা হয়। ফলে ২৮ ফেব্রুয়ারী বেলা ২টা পর্যন্ত এ অসহযোগ কর্মসূচি পালিত হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারী নির্বাচনোত্তর এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "এই নির্বাচনে যে সব দল অংশ নেয়নি তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। আলোচনা যতদূর এগিয়ে ছিল সেখান থেকেই আবার শুরু করতে চাই। আলোচনায় সবাই মিলে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই যাতে ভবিষ্যতে সকল দল অংশ গ্রহণ করতে পারে। সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন প্রসঙ্গে পুনরায় বলেন, "দেশের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা ও গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য এই নির্বাচনের প্রয়োজন ছিলো।"[১৭৯]

২৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচন কমিশন ২০৮টি আসনের ফলাফল গেজেট প্রকাশ করেন। ১০টি আসনে নির্বাচন হয় নি জানা যায়। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে ৫০টি আসনে বিএনপির ৫০ জন শীর্ষস্থানীয় নেতা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। বাকী আসন সমূহে আংশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারী যে সমস্ত কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে নি সে সমস্ত আসনে পরবর্তীতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

বিরোধীদল কর্তৃক ইতোপুর্বে ঘোষিত অসহযোগ কর্মসূচীর প্রথম দিন অর্থাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারী তিন দলীয় বিরোধী জোট নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এক বিবৃতিতে বলেন, "সরকার সংবিধানের নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে পরিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়েছে।" সংবিধানের ১২৩(৩) (খ) অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন যে, "সংবিধান অনুযায়ী ২১ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সম্পূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা ছিল সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে নির্বাচন পরিপূর্ণভাবে সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছে ও সাংবিধানিক ভাবে অবৈধ ও বেআইনী হয়ে পড়েছে।"[১৮০] বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার এ বিবৃতির মাধ্যমে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে, সেগুলো হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

১. এ বিবৃতির মাধ্যমে তিনি (শেখ হাসিনা) প্রথম বারের মত ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা স্বীকার করলেন।

২. ১৫ ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করায় সরকার ও নির্বাচন কমিশন কোন ভুল করে নি।

৩. সংবিধানের বাইরে তিনি যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মুলা দিয়েছেন তা যে অবৈধ তা প্রকারান্তরে স্বীকার করলেন।

৪. এ বিবৃতির মাধ্যমে তিনি ম্যাকিয়াভেলীর 'দ্বৈত নৈতিকতা'কে অনুসরণ করেছেন। যা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থি।

৫. সরকার নির্বাচন পরিপূর্ণ ভাবে না করতে পারায় প্রকারান্তরে নিজেকেই দায়ী করলেন।

এখন প্রশ্ন হলো নির্বাচন পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন না করতে পারার জন্য কে দায়ী? বিরোধী দল নির্বাচনের পূর্বে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবৈধ আখ্যায়িত করেছিলেন। বিরোধী দল তাদের প্রচেষ্টা করাতে প্রধানমন্ত্রী, নির্বাচন কমিশন, কূটনৈতিক বৃন্দের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিরোধী দল তাদের প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য করে দেশকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়ে নির্বাচন প্রতিহত করতে ব্রতী হলেন। নির্বাচনের দিন হরতাল সহ গণকার্ফু দিয়ে নির্বাচন আংশিক প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছে। নির্বাচনে অসংখ্য লোক হতাহত হয়েছে। ৫ম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির পর ৯০ দিনের মধ্যে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে সংবিধান লংঘিত হবে এ কথা নির্বাচনের পূর্বে কখনও বুঝতে চান নি। নির্বাচনের পরে এসে তিনি বলছেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে "নির্বাচন পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে না পারায়" সংবিধান লংঘিত হয়েছে। অথচ এ বিরোধী দলীয় নেত্রীই নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য জীবন বাজি রেখেছেন। কাজেই নির্বাচন পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে না পারায় যদি সংবিধান লংঘিত হয় তবে তার দায়ভার বিরোধী দলের ওপর বর্তাবে না? নির্বাচনের পূর্বে তিনি বলেছিলেন ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবৈধ, নির্বাচনের পরে এসে বলছেন নির্বাচন করতে না পারায় সরকার অবৈধ। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার কোন বক্তব্য সঠিক। এ ধরণের বক্তব্য বিবৃতি

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাকিয়াভেলীর দ্বৈত নৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাহলে এ কথা বলা যায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার জন্য যে নির্বাচন করেছে তা যথাযথ ও সঠিক ছিল। বরং প্রধানমন্ত্রী যদি নির্বাচন না করে পদত্যাগ করতেন তাহলে তাই হতো সাংবিধানিক।

প্রধানমন্ত্রীর ৩ মার্চের ভাষণ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাসে সম্মতি ঃ

৩ মার্চ (১৯৯৬) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক রেডিও-টিভি ভাষণে বিরোধী দলের দীর্ঘ দিনের দাবি অনুযায়ী ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল উত্থাপন ও পাসের কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনের প্রেক্ষিত বর্ণনা করেন এবং ১২ ফেব্রুয়ারী তার ভাষণে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের মাধ্যমে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলেছিলেন যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে একটি অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যায়। এ ব্যাপারে তার প্রয়াস ছিল আন্তরিক বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে ইতোপূর্বে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের লক্ষ্যে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ সমূহও বর্ণনা করেন। প্রধানমন্ত্রী একটি অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ইচছা ব্যক্ত করে বলেন, "আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলতে চাই যে, দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিকে নিয়েই আমরা জাতীয় নির্বাচন করতে চেয়েছিলাম এবং আগামীতেও একসাথে নির্বাচন করতে চাই কিন্তু সংবিধানের বিধান না থাকায় এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য না থাকায় সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন সমাধানে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে আমাদের এ সমস্যা আর থাকবে না। এমতাবস্থায় আমরা এখন থেকেই বিদ্যমান সমস্যার সাংবিধানিক ও বাস্তব সমাধানের উদ্যোগ নিতে পারি। কারণ আমরা সকল সদস্যরা দ্রুত ও কার্যকর সমাধানে আন্তরিক ভাবেই আগ্রহী।" প্রধানমন্ত্রী দেশ, জাতি, জনগণ এবং গণতন্ত্রের স্বার্থে এ জটিল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার

Dhaka University Institutional Repository

গঠনের জন্য দেশবাসী ও সকল রাজনৈতিক দলের কাছে ৩টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাব গুলো হলো ঃ[১৮১]

১) দেশ ও জনগণের সামগ্রিক স্বার্থ বিবেচনা করে ভবিষ্যতে সকল জাতীয় নির্বাচনকালীন সময়ে নির্দলীয় সরকার গঠন করা হবে। প্রস্তাবিত এ সরকার দৈনন্দিন সরকারী কর্মকান্ড তত্ত্বাবধান করবেন। কোন নতুন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করার পূর্ণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রাপ্ত থাকবেন।

২) ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে আমরা এ বিষয়ে সংবিধানের প্রাসঙ্গিক সংশোধনী বিল আনবো যত শীঘ্র সম্ভব। এ সংশোধনীয় অনুযায়ী গণভোটের ব্যবস্থা করা হবে।

৩) অতঃপর নূন্যতম সময়ের মধ্যে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে উক্ত তিনটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে খোলামন নিয়ে আলোচনার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহবান জানান। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকল দল অংশগ্রহণ করবেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি মেনে নেয়ার মাধ্যমে একদিকে বিরোধী দলের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণহওয়া এবং অন্যদিকে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক ধারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে বজায় থাকার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলো। কিন্তু তিনটি বিরোধী দলই প্রধানমন্ত্রীর আলোচনায় বসার প্রস্তাব তাৎক্ষনিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ঐ দিনই বিরোধী নেত্রী এক বিবৃতিতে মন্তব্য করে বলেন যে, "বেগম জিয়া নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের কথা বলেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা উল্লেখ নেই। তিনি কখন পদত্যাগ করবেন তারও উল্লেখ নেই এবং কখন পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন হবে সে বিষয়ও সুনির্দিষ্টভাবে কোন প্রস্তাব দেননি।"[১৮২] কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ এবং তার দেয়া তিনটি প্রস্তাব পর্যালোচনা করলে

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ এবং নির্বাচনের সময়সীমা কোন সমস্যা নয়। কারণ তিনি তার ভাষণে উল্লেখ করেছেন, সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য সমাধানের ভিত্তিতে তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং অবিলম্বে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৩ মার্চ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার প্রদত্ত বিবৃতির সাথে ৩টি দাবিও পেশ করেন। তার দাবি গুলো হলো ঃ [১৮৩]

১) পনেরো ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন বাতিল করতে হবে,
২) অবিলম্বে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে, এবং
৩) নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা করতে হবে।

৬ মার্চ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে এক পত্রের মাধ্যমে ৩ মার্চ প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে প্রদত্ত তিনটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনার আহবান জানান। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেত্রী উক্ত পত্রের কোন জবাব দেননি তবে ৬ মার্চ তিনি এক বিবৃতির মাধ্যমে ৫ দফা দাবি পেশ করেন। দাবি গুলো হলো ঃ [১৮৪]

১) ৯ মার্চের মধ্যে গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুক্তিদান;
২) নির্বাচনের প্রক্রিয়া বন্ধ ঘোষণা; নির্বাচন বাতিল ও সরকারের পদত্যাগ;
৩) ১০ মার্চের মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে আন্দোলনরত সকল রাজনেতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও মে মাসের মধ্যে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান;
৪) নির্বাচনকালে হতাহতদের ক্ষতিপূরণ প্রদান; এবং
৫) দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিশ্চিত করে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী নেত্রীর এ বিবৃতির পাশাপাশি একই দিন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মানিক মিয়া এভিনিউতে বিএনপির এক বিশাল জনসভা থেকেও আলোচনার মাধ্যমে বিরাজমান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিরোধী দলকে এগিয়ে আসার আহবান পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, "হরতাল, অবরোধ ও সন্ত্রাস করে সমস্যার সমাধান হবে না। খোলা মনে আলোচনার মাধ্যমেই কেবল সমস্যার সমাধান সম্ভব।"[১৮৫]

রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে ঃ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর সমঝোতার উদ্যোগঃ

৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ৩ মার্চ (১৯৯৬) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ভাষণে নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল সমূহকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য উপায় খুঁজে বের করার যে প্রস্তাব দেন তার প্রেক্ষিতে বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ প্রত্যাখ্যান করেন। তারা রাষ্ট্রপতির উদ্যোগে সংলাপের প্রস্তাব করেন। ৪ মার্চ বিরোধী দল সমূহ যৌথ সমাবেশ শেষে এক প্রেস ব্রিফিং এ বলেন যে, এ সরকারের সাথে তারা কোন আলাপ আলোচনা করবেন না। রাষ্ট্রপতি যদি উদ্যোগ গ্রহণ করেন তবে আলাপ আলোচনায় বিরোধী দল রাজি আছেন। ৮ মার্চ সরকারী দলের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে উদ্যোগ নেয়ার ইতিবাচক সাড়া দেন। এর প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি ৯ মার্চ রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনার উদ্যোগ নেন। রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে ১০ মার্চ (১৯৯৬) আলোচনার আহবান জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও তিন জোট নেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ, জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী, জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, ওয়ার্কাস পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন ও এনডিপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে চিঠি দেয়া হয়। রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে আলোচনার উদ্যোগ নেয়ার পাশাপাশি বিরোধী দল সমূহ ৯ মার্চ থেকে সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী পালন করেন। ৯ মার্চ সন্ধ্যায় বিএনপির যুগ্ম

Dhaka University Institutional Repository

মহাসচিব সাংবাদিকদের বলেন, আলোচনার মাধ্যমেই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। তাই তিনি জনগণের কষ্ট লাঘবের জন্য অসহযোগ কর্মসূচি প্রত্যাহারের জন্য বিরোধী দলের প্রতি আহবান জানান। রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবনে ১০ ও ১১ মার্চ যথাক্রমে বিরোধী দল এবং সরকারী দলের সঙ্গে বৈঠক করেন। ১০ মার্চ বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনাকালে আওয়ামী লীগ সহ তিন দল ইতোপূর্বের পেশকৃত তিনটি দফা পুনরায় রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করেন। এগুলো হলো ঃ- ১. ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল ২. প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ, ৩. নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। এছাড়াও ঐ দিন আওয়ামী লীগ নেত্রী দলীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "সংবিধানের ৪৮ ধারায় 'রেসিডিউয়াল পাওয়ার প্রয়োগ করে ৯৩ ধারায় অর্ডিন্যান্স জারি করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করবেন এবং মে মাসের মধ্যে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার জন্য তিনি প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতিকে দেয়া বিরোধী দলের এ সাংবিধানিক পরামর্শ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ১০ মার্চ বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব বলে, "অধ্যাদেশ জারি করে সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নেই। এ জন্য সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন দরকার"।[১৮৬] প্রকৃত পক্ষে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী সংবিধানের ৪৮ অনুচেছদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে ৯৩ ধারায় যে অধ্যাদেশ জারি করতে বলেছেন সে সম্পর্কে বলা যায় যে, সংবিধানের ৪৮ অনুচেছদ অনুযায়ী '৯৩' ধারায় রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে উপেক্ষা করে এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। সংবিধানের '৯৩' ধারায় রাষ্ট্রপতিকে যে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সেখানেও কিছু শর্ত যুক্ত আছে। সংবিধানের ৯৩(১) ধারার শতাংশে বলা হয়েছে ঃ[১৮৭]

"তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন কোন অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান করা যাইবেনা,

ক) যাহা এই সংবিধানের অধীনে সংসদের আইন দ্বারা আইন সঙ্গতভাবে করা যায়;

Dhaka University Institutional Repository

খ) যাহাতে এই সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হইয়া যায়, অথবা

গ) যাহার দ্বারা পূর্বে প্রণীত কোন অধ্যাদেশের যে কোন বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায়" ।

সুতরাং রাষ্ট্রপতিকে যদি অধ্যাদেশের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হয় তবে ৯৩(১) ধারা শর্তাংশের (খ) উপধারা লংঘিত হবে। কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হলে সংবিধানের কোন কোন বিধান পরিবর্তন করতে হবে এবং কোন কোন বিধান রহিত করতে হবে। যা রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশের মাধ্যমে করতে পারেন না। কাজেই বিরোধী দলের এ দাবিটি ও অসাংবিধানিক।

১১ মার্চ বিএনপির চেয়ারপার্সন ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে জানান যে, মে মাসের মধ্যে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে তাদের কোন আপত্তি নেই। এর ফলে বিরোধী দলের তিনটি দাবির মধ্যে প্রধান দু'টি দাবি পূরণ হলো। কেবল মাত্র ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বাতিলের দাবিটি অবশিষ্ট রইলো। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠক শেষে, ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বাতিল করবেন কিনা? সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, "সংসদ বাতিল করলে নির্দলীয় অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হবে কি করে ও কিসের মাধ্যমে হবে? সংসদ থাকবেনা, তাহলে বিল পাশ করবে কে?"[১৮৮] মূলত ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করে রাজনৈতিক সংকটের সমাধান কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদই একমাত্র রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করতে পারে। কাজেই মুহূর্তে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের গুরুত্ব খুবই বেশী। যদিও এ সংসদের সৃষ্টি একটি বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে। তবুও ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদই বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধানের একমাত্র স্থান। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাশ করার পর এমনিতেই এ সংসদের বিলুপ্ত করা হবে। কেননা ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলে বিএনপি সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা পেয়েছে। আর সেজন্যই বেগম খালেদা জিয়া

Dhaka University Institutional Repository

নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিয়েছে। এত দিন বেগম জিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে সংবিধানের পরিপন্থী বলেছেন। মূলতঃ বিরোধী দল যেভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে বলেছিল তা সাংবিধানিক ছিল না। বিএনপি যদি সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ করে তবে তা সাংবিধানিক হবে। গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক ধারা নিরবিচ্ছিন্ন থাকবে।

১২ মার্চ সমঝোতার সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে বিএনপিসহ বিরোধী দল সমূহের কাছে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পদ্ধতি ও সম্ভাব্য পদক্ষেপ প্রভৃতি বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য চিঠি পাঠান। এর ১ দিন পর ১৩ মার্চ (১৯৯৬) আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াত ইসলামী, ওয়ার্কাস পার্টি, গণফোরাম ও ইসলামী ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতির চিঠির জবাব দেয়া হয়। তবে তাদের চিঠিতে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পদ্ধতি ও সম্ভাব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে কোন রূপরেখা বা মতামত দেয়া হয়নি। রাষ্ট্রপতিকে লেখা আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীর তিনটি চিঠির ভাষ্য ও বক্তব্য প্রায় একই। উক্ত তিনটি চিঠিতে রাষ্ট্রতিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, "আশা করি আপনি ১৫ ফেব্রুয়ারীর অবৈধ নির্বাচন বাতিল ও প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ নিশ্চিত করে সংকট সমাধানের দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে মে মাসের মধ্যেই ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে দেশবাসীকে সংঘাত ও সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষা করবেন।"[১৮৯] তিনটি বিরোধী দলের উক্ত চিঠিতে কিভাবে রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করবেন সে সম্পর্কে কোন সুপারিশ দেয়া হয়নি। ইতোপূর্বে বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা সংবিধানের ৪৮ ও ৯৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অধ্যাদেশের মাধ্যমে যেভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের কথা বলে ছিলেন তা কোন ক্রমেই সম্ভব নয় যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তবে গণফোরাম নেতা ড. কামাল হোসেন তার চিঠিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রশ্নে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের পরামর্শ নেয়ার প্রস্তাব করে উল্লেখ করেন, "রেফারেন্সের বিষয় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিদের পরামর্শ সমৃদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

হলে তা সুপ্রিম কোর্টের জন্য সহায়ক হতে পারে।"[১৯০] কিন্তু ড. কামাল হোসেন এর মতামতও সংকট সমাধানের সুস্পষ্ট কোন মতামত নয়। বিরোধী দলের উক্ত চিঠির প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিরোধী দলে কেবল মাত্র ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির দাবি ছাড়া অন্য সকল দাবি মেনে নিয়েছে। যেখানে বিরোধী দলের মূল দাবি ছিল অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন, এছাড়াও মে মাসের মধ্যে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান, সরকার সে দাবিও মেনে নিয়েছে এবং বিরোধী দলের ফর্মূলা অনুযায়ীই সমঝোতার ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতো না। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি দিয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিয়েই। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর আহবানে বিরোধী দলীয় নেত্রী সাড়া দেয়নি কারণ বিরোধী দলীয় নেত্রীর দাবি ছিলো আলোচনার পূর্বেই ঠিক করতে হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নেয়া হবে কিনা। তখন সাংবিধানিক ভাবে সরকারি দলের পক্ষে বিরোধী দলের দাবী পূরণ করা সম্ভব ছিলোনা। কিন্তু নির্বাচনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নেয়ার পর বিরোধী দল অন্য শর্ত দিয়ে সংকট সমাধানের সুযোগ সরকারী দলকে দিতে অস্বীকার করলো। বিরোধী দলের মনোভাব যা তাতে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে তারা আগ্রহী নয় এবং আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটাতে আগ্রহী। যা তিন জোটের রূপ রেখারও পরিপন্থী। সংকট সমাধানের রাষ্ট্রপতির উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি ১৫ মার্চ (১৯৯৬) একটি বিবৃতিতে বলেন, "সংবিধানের ব্যাপক পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন আইন বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামতে দেখা যাচেছ যে, প্রেসিডেন্টের সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিধান সংযোজনের জন্য সংবিধান সংশোধন এবং পরবর্তীতে গণভোটের প্রয়োজন রয়েছে।" রাষ্ট্রপতি উক্ত বিবৃতিতে আরও বলেন, "সংশ্লিষ্ট দল সমূহ তাদের নিজ নিজ অবস্থানে আরও নমনীয়তা না দেখালে জাতীয় ঐকমত্যে পৌছানো যাবেনা।"[১৯১] রাষ্ট্রপতির এ বিবৃতিতে তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, "প্রেসিডেন্টের বিবৃতি তারই ইঙ্গিত বহন

Dhaka University Institutional Repository

করে"।[১৯২] কার্যতঃ রাজনৈতিক দল সমূহ রাষ্ট্রপতির উদ্যোগে সাড়া না দিয়ে দেশকে সংঘাত ও সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ফলে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের রাষ্ট্রপতির সর্বশেষ উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

অসহযোগ আন্দোলন- আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিনতি ঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার জন্য রাষ্ট্রপতির উদ্যোগের পাশাপাশি আন্দোলনরত বিরোধী দল সমূহ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বাতিল, বিএনপি সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ৯ মার্চ (১৯৯৬) থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অর্থাৎ বিএনপি সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। ২৯ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৬) তিন বিরোধী দল সমূহ এ অসযোগ আন্দোলন ঘোষণা কালে জনগণকে আহবান জানান যাতে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে সকল প্রকার সরকারী বেসকারী অফিস আদালত, ব্যাংক বীমা বন্ধ রাখা সহ সড়ক, নৌ ও রেলপথে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। দেশের সকল বন্দর ও বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয়া হয়। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে কেবল মাত্র সকাল ১০টা থেকে রিক্সা চলাচলের কথা বলা হয়। ৯ মার্চ থেকে এ অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি সফল করার জন্য ব্যাপক বোমাবাজি, গাড়ী ভাঙচুর, জ্বালাও পোড়াও সহ হিংসাত্মক তৎপরতার মাধ্যমে আতংক সৃষ্টি করা হয়।

৯ মার্চ থেকে দেশের আইন শৃংখলার ব্যাপক অবনতি ঘটে। কার্যতঃ সারাদেশ অচল হয়ে পড়ে। ১৭ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে একটি তেল ভর্তি জাহাজে বোমা নিক্ষেপ করলে সরকার বন্দরের নিয়ন্ত্রণের ভার নৌবাহিনীর হাতে ছেড়ে দেয়। অসহযোগের ফলে পরিবহন ব্যবস্থা অচল থাকায় বন্দর সমূহে আমদানীকৃত পন্যের স্তুপে পরিনত হয়। ফলে ১৮ মার্চ বেনাপোল স্থল বন্দরে এক অগ্নিকান্ডে ৫০০ কোটি টাকার আমদানি পণ্য পুড়ে যায়। শুধু পণ্য সামগ্রী নয়, "যানবাহন চলাচল সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি করার ফলে গোটা দেশের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পড়েছে।"[১৯৩] ১৯ মার্চ বিরোধী দল সমূহ অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যেই সংসদ ভবন ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেন। কারণ ঐ দিন ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশন বসে। বিরোধী দলের অসহযোগ আন্দোলন আরও জঙ্গীরূপ ধারন করে। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকার এবং বিরোধী দলের সংঘর্ষে আহত ও নিহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে একদিকে বিরোধী দল সরকারের পতন ঘটাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ অন্যদিকে সরকারী দল ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাসের পর ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ইচছুক।

২৩ মার্চ থেকে বিরোধী দলের অসহযোগ আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ঐ দিন ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফের নেতৃত্বে প্রেসক্লাবের সম্মুখে স্থাপন করা হয় 'জনতার মঞ্চ'। সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত জনতার মঞ্চে বিরোধী দল অবস্থান ধর্মঘট করে। মেয়র হানিফ 'জনতার মঞ্চ' অবস্থান ধর্মঘট ঘোষণা করেন খালেদা জিয়া সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত। দিবা রাত্র 'জনতার মঞ্চ' অবস্থান ধর্মঘট চলবে। মেয়র হানিফ নিজেকে ঢাকার একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে দাবি করে ঘোষণা করেন, "We donot obey the illegal Prime Minister Begum Khaleda."[১৯৪] সিরাজুদ্দিন আহম্মেদ মেয়র হানিফের উদ্বৃতি দিয়ে আরও উল্লেখ করেন, "He urged the army, Bangladesh Rifles and the Police to join them and the people instead of protecting the illegal Government of Begum Khaleda".[১৯৫] ২৪ মার্চ বাংলাদেশ সচিবালয় অফিসার কর্মচারী এক সমাবেশে মিলিত হন। উক্ত সমাবেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব ও প্লানিং কমিশনের সদস্য ডঃ মহিউদ্দীন খান আলমগীর সচিবদের পক্ষে বিরোধী দলের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও সমাবেশে যোগদান করেন ও বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তারা (সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী) অবৈধ সরকারের অধীনে কোন কাজ করবেনা এবং বিএনপির মন্ত্রী সভার পদত্যাগ দাবি করেন। ২৭ মার্চের মধ্যে উক্ত দাবি

Dhaka University Institutional Repository

মানা না হলে তারা সরাসরি জনগণের সাথে আন্দোলনে মিলিত হবে। ২৫ মার্চ ২৮ জন সচিব ও উর্ধ্বতন আমলা এক যৌথ বিবৃতিতে বিএনপি সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি করেন। ইত্যেমধ্যে ২৬ মার্চ প্রত্যুষে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে বহু প্রতিক্ষীত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ করা হয়।

নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাসের পর এমনিতেই সরকারের সময়সীমা যখন সীমিত হয়ে আসছে তখন সুযোগ বুঝে আমলারা তাদের চিরাচরিত নীতি অনুসরণ করে বিদায়ী সরকারের ওপর থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। ২৭ মার্চ কেবিনেট সচিব আম্বুবুর রহমানের নেতৃত্বে ৩৫ জন সচিব রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করে খালেদা জিয়া সরকারের অধীনে তারা কাজ করতে অস্বীকৃতি জানান। একই দিন সচিবালয়ের কর্মচারীবৃন্দ রাষ্ট্রপতিকে একটি স্বারক লিপি প্রদান করে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা ও খালেদা জিয়ার পদত্যাগ দাবি করেন। ইতোমধ্যে দেশের সকল জিলা সদরে জনতার মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হয়। অহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশ কার্যতঃ অচল। সচিবালয় মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়। সচিবালয়ে সভা সমাবেশষ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ২৮ মার্চ সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্ধ খালেদা জিয়ার পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি জানিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সচিবালয় ভিআইপি গেটে সমাবেশ করেন। সমাবেশ শেষে সচিব ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরের নেতৃত্বে কর্মকর্তাদের একটি অংশ 'জনতার মঞ্চে' গিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করেন। সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্ধ একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠিত মঞ্চে আরোহন করে তাদের নিরপেক্ষতা ক্ষুন্ন করেছেন এবং চাকুরীবিধি অনুযায়ী সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ লংঘণ করেছেন। ২৯ মার্চ বিএনপি তাদের সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করতে নয়া পল্টনে বিএনপি কার্যালয়ের সম্মুখে "গণতন্ত্র মঞ্চ" প্রতিষ্ঠা করেন। এ 'গণতন্ত্র মঞ্চ" বিএনপির দলীয় নেতাকর্মীদের মনোবল দৃঢ় রাখতে সহায়তা করেছে। ৩০ মার্চ খালেদা জিয়ার পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে ৯ মার্চ থেকে লাগাতার অসহযোগ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ ঃ

বিরোধী দলের অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি রাজনৈতিক সংকট সমাধানের উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। প্রধানমন্ত্রীর ৩ মার্চের ভাষণের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির নেয়া উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর বিএনপি একক ভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাসের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯ মার্চ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ ভবন ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১৪ মার্চ নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসসদের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তফসিল ঘোষণা করেন। ১৬ মার্চ বিএনপি দলীয় ৩০ জন মহিলা সংসদ সদস্য প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশের ব্যপারে বিরোধী দল সরকারকে কোনরূপ সহযোগিতা না করার ফলে এবং অসহযোগ কর্মসূচি অব্যাহত থাকায় সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলের আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করতে চাচ্ছে। ১৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সাংবাদিকদের সঙ্গে বলেছেন "নির্দলীয় সরকারের বিল পাশ করার পর আমি পদত্যাগ করবো।"[১৯৬] ১৮ মার্চের মধ্যে জাতীয় সংসদের ৩০২ জন সংসদ সদস্য শপথ গ্রহণ করেন। ১৯ মার্চ (১৯৯৬) রাষ্ট্রপতি বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করে ২৭ সদস্যের মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরুর পূর্বের নবগঠিত মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরুর পূর্বেই নবগঠিত মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করেন। নতুন মন্ত্রীসভায় প্রধানমন্ত্রী ছাড়া ১৩ জন কেবিনেট মন্ত্রী ও ১৩ জন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করেন।

১৯ মার্চ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশন সর্বপ্রথমে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন সম্পন্ন হয়। সর্বসম্মতিক্রমে স্পীকার নির্বাচিত হন সাবেক স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী এবং ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত

Dhaka University Institutional Repository

হন এল. কে. সিদ্দিকী। এরপর সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। রাষ্ট্রপতি তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, "সাংবিধানিক ধারাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে গত ১৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচন ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নির্দলীয় অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধনে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রত্যাশা নিয়ে ৬ষ্ঠ সংসদ তার কার্যক্রম শুরু করতে যাচেছ।" বর্তমান সংসদ নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দলগুলি অংশগ্রহণ না করাকে তিনি পরিতাপের বিষয় হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, "এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নানা প্রতিকূলতার ও সৃষ্টি হয়েছে। তিনি সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব অপরিসীম বলে উল্লেখ করেন এবং দায়িত্ব পালনে সফলতা কামনা করেন।"[১৯৭]

২০ মার্চ নবগঠিত মন্ত্রী সভা জাতীয় সংসদের সকল সাধারন জাতীয় নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের লক্ষ্যে সংবিধানের কতিপয় সংশোধনীর প্রস্তাব সম্বলিত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিলের খসড়া অনুমোদন করেছে। ২১ মার্চ (১৯৯৬) বিতর্কিত ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ভবিষ্যতের সকল জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান করার জন্য সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন ১৯৯৬ নামে একটি বিল উত্থাপন করা হয়। জাতীয় সংসদে এ বিল উত্থাপিত হলে ঐ দিনই আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর লিয়াজো কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে ব্রিফিং কালে আওয়ামী লীগ নেতা মোঃ নাসিম বলেন, "অবৈধ সংসদের কোন আইন বা বিধান দেশের জনগণ মানবে না এবং এর দ্বারা বিরাজমান রাজনৈতিক সংকটকে আরও জটিল ও ঘনীভূত করা হবে।"[১৯৮]

২৬ মার্চ (১৯৯৬) প্রত্যুষে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের দীর্ঘ দিনের দাবিকৃত নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সম্পর্কিত বিল সর্ব সম্মতিক্রমে পাশ করা হয়। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন আইন ১৯৯৬ নামে এ বিলে সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

বিচারপতি কিংবা আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কোন বিচারপতি কিংবা সকল দলের কাছে গ্রহণ যোগ্য কোন নির্দলীয় ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করবে। যদি ঐরূপ কোন ব্যক্তি খুঁজে না পাওয়া যায় তবে রাষ্ট্রপতি নিজে ঐ দায়িত্ব পালন করবে। প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে ১১ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়েছে। সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার বা বিলুপ্তি হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবেন। ইতোপূর্বে বলা হয়েছিলো সংবিধান সংশোধনের পর গণভোটের আয়োজন করা হবে। কিন্তু সংবিধানের ত্রয়োদশতম সংশোধনী পাশ করা হয়েছে গণভোটকে পরিহার করে। অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানাবলী সংবিধানের ৫৮(ক) এর পর ২ক এ নতুন পরিচ্ছেদ যুক্ত করে এ বিধান করা হয়েছে। যার ফলে গণভোটের আর প্রয়োজন হবে না। কেননা সংবিধানের বর্তমান স্বরূপ অনুযায়ী ধারা ৮, ৪৫, ৫৬ এবং ১৪২ ধারা সমূহ পরিবর্তন করতে হলে গণভোটের প্রয়োজন হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংযোজন করতে গিয়ে উক্ত ৪টি ধারায় কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। ফলে রাষ্ট্রপতি ২৮ মার্চই উক্ত বিলে সম্মতি দানের সাথে সাথে বিলটি আইনে পরিনত হয়। এ বিল পাশের ফলে বিরোধী দলের দীর্ঘ দিনের দাবী পূরণ হলো, তেমনি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তার প্রতিশ্রুত সংবিধান সম্মতভাবেই বিরোধী দলের এ দাবি পূরণ করলেন।

ছ) খালেদা জিয়ার পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ঃ

৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিল অনুমোদন লাভের পর বিএনপি সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার সঠন সময়ের ব্যপার হয়ে দাড়ায়। এ বিলপাসের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সকল বাধা অপসারিত হয়েছে। তা সত্বেও ৩০ মার্চ (১৯৯৬) 'জনতার মঞ্চ' থেকে সরকারকে পদত্যাগের চূড়ান্ত আলটিমেটাম দেয়া হয়। অপরদিকে একই দিন 'গণতন্ত্র মঞ্চ' থেকে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বিএনপিকে একমাত্র

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তাবাদী শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বেগম জিয়া উক্ত সমাবেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের সাংবিধানিক সমাধান করতে পারায় দেশ বাসীকে অভিনন্দন জানান এবং উক্ত সমাবেশ থেকে তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দেন। অবশ্য ইতোপূর্বে ২৯ মার্চ রাতে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের সাথে সাক্ষাৎ করে যথাশীঘ্র সম্ভব নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধক্রমে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বভার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। বিচারপতি হাবিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এর ফলে ৩০ মার্চ (১৯৯৬) রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নয়া পল্টনে 'গণতন্ত্র মঞ্চের' জনসভা থেকে বঙ্গভবনে এসে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। বেগম খালেদা জিয়ার পদত্যাগ পত্র গৃহীত হওয়ার পরপরই রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সাবেক প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানকে শপথ পড়ান। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের সাথে সাথে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম বারের মত সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হল। এর ফলে বিরোধী দল সমূহের দীর্ঘ দুই বছরেরও বেশী সময় ধরে বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সংকটের অবসান ঘটে এবং জাতি একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বপ্ন দেখে যেখানে সকল দলের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত হবে। পক্ষান্তরে একই সাথে একটি স্বৈরাচারী সরকারের অবসানের পর ১৯৯১ সালে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ৫ম জাতীয় সংসদে বিজয়ী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার ৫ বছরের ঘটনা বহুল গণতান্ত্রিক সরকারের অবসান ঘটে। খালেদা জিয়ার পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন প্রসঙ্গে জনতার মঞ্চের রূপকারও ঢাকার মেয়র মোঃ হানিফ প্রতিক্রিয়া

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্ত করে বলেন, "This victory is not a victory of any Party, nor of any individual, this victory is the victory of the people, this victory is the victory of democracy."[১৯৯] আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "এ বিজয় জনতার বিজয়"[২০০]। এ প্রসঙ্গে পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, "আন্দোলনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় এসেছিলাম এখন জনতার দাবি মেনে নিয়েছি। গণতন্ত্র অব্যাহত রাখার স্বার্থে সরে দাড়িয়েছি।"[২০১] প্রকৃত পক্ষে খালেদা জিয়ার এ পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ক্ষমতা পরিবর্তনে গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক ধারা বজায় থাকায় রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

৩০ মার্চ বিচারপতি হাবিবুর রহমান প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিপূর্ণতা লাভ করে ৩ এপ্রিল (১৯৯৬)। ঐ দিন প্রধান উপদেষ্টার সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি সংবিধান অনুযায়ী ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সম্পন্ন করেন। উপদেষ্টাগণ হলেন, ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদ, গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনুস, মোহাম্মদ শামসুল হক, সৈয়দ মঞ্জুরে এলাহী, প্রাক্তণ সচিব এ.জেড.এম. নাসিরুদ্দীন, অধ্যাপক ড. নাজমা চৌধুরী এবং ইঞ্জিনিয়ার ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ উপদেষ্টা পরিষদের ওপর বাংলাদেশের পরবর্তী ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব অর্পিত হয়। উপদেষ্টাগণ তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা এবং নিরপেক্ষতা দ্বারা তাদের উপর অর্পিত এ সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

পাদ টীকা

১। L.W Pye, Aspects of Political Development, PP-33-45.

২। এম.এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯৩ ইং, পৃঃ ৩৮৬।

৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সংশোধিত) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা ঃ ১৯৯৪ ইং পৃঃ-২৭।

৪। এম.এ ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮৬।

৫। প্রাগুক্ত।

৬। প্রাগুক্ত।

৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮৮।

৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮৮ ও ৩৮৯।

৯। প্রাগুক্ত, প্রঃ ৩৯০।

১০। আবদুল মতিন, খালেদা জিয়ার শাসনকাল ঃ একটি পর্যালোচনা, ঢাকা ঃ র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেসন্স ১৯৯৭ ইং পৃঃ ৬০।

১১। 'আজকের কাগজ', ঢাকা ঃ ২ আগষ্ট ১৯৯২ ইং।

১২। শাহরিয়ার কবির, গণআদালতের পটভূমি, ঢাকা ঃ দিব্য প্রকাশ, ১৯৯৩ ইং পৃঃ ১৩০।

১৩। দৈনিক খবর, ঢাকা ঃ ৮ মার্চ ১৯৯২ ইং।

১৪। প্রাগুক্ত, ১৯ মার্চ ১৯৯২ ইং।

১৫। গণআদালতের অন্যান্য সদস্যরা হলেন, ১) এ্যাডভোকেট গাজীউল হক, ২) ডঃ আহমেদ শরীফ ৩) স্থপতি মাযহারুল ইসলাম খান, ৪) ব্যারিষ্টার শফিক আহম্মেদ, ৫) ফয়েজ আহমেদ, ৬) অধ্যাপক কবির চৌধুরী ৭) ফলিম শরাফী ৮) ব্যারিষ্টার শওকত আলী, [সূত্র ঃ দৈনিক সংবাদ, ঢাকা ঃ ২৭ মার্চ ১৯৯২ ইং]

১৬। 'গণআদালতের স্বাক্ষীগণ হলেন, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ডঃ মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, সৈয়দ শামসুল আলী যাকের, ডঃ মুশতাক হোসেন এবং তিনজন বীরঙ্গনা মহিলা।

১৭। দৈনিক সংবাদ, ঢাকা ঃ ২৭ মার্চ ১৯৯২ ইং।

১৮। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯। প্রাগুক্ত।

২০। প্রাগুক্ত, ২৪ মার্চ ১৯৯২ ইং।

২১। 'দৈনিক খবর', ঢাকা ঃ ২৫ মার্চ ১৯৯২ ইং।

২২। '১২ জন বিচারক, ৪ জন কৌশলী, ৭ জন স্বাক্ষী এবং সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব সহ মোট ২৪ জন।

২৩। এম.এ ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০২।

২৪। আমান-উদ-দৌলা, একাত্তরের ঘাতকদের কেন বিচার চাই, ঢাকা ঃ অন্য কথা, ১৯৯৩ ইং পৃঃ ৩১।

২৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

২৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।

২৭। আব্দুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১।

২৮। দৈনিক সংবাদ, ঢাকা ঃ ২৭ মার্চ ১৯৯২ ইং।

২৯। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।

৩০। প্রাগুক্ত।

৩১। আমান-উদ-দৌলা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।

৩২। শাহরিয়ার কবির, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১।

৩৩। দৈনিক সংবাদ, ঢাকা ঃ ২৭ মার্চ ১৯৯২ ইং।

৩৪। প্রাগুক্ত।

৩৫। প্রাগুক্ত।

৩৬। আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬ ও ৬৭। [মুল সূত্রঃ দৈনিক 'জনতা', ঢাকা ঃ ২৬ মার্চ ১৯৯২ ইং]

৩৭। আব্দুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮। [মুল সূত্র- দৈনিক সংবাদ ঢাকা ঃ ২৩ জুন ১৯৯৪ ইং।

৩৮। এম. এ ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৫।

৩৯। প্রাগুক্ত।

৪০। 'আজকের কাগজ', ঢাকা ঃ ২৩ জুন ১৯৯৪ ইং।

৪১। প্রাগুক্ত।

৪২। প্রাগুক্ত।

৪৩। প্রাগুক্ত ৬ আগষ্ট ১৯৯২ ইং।

৪৪। প্রাগুক্ত ১০ আগষ্ট, ১৯৯২ ইং।

৪৫। আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০।

৪৬। প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৭৫, ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

৪৭। দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ঃ ১৩ আগষ্ট ১৯৯২ ইং।

৪৮। প্রাগুক্ত।

৪৯। আজকের কাগজ, ঢাকা ঃ ২ মার্চ ১৯৯৪ ইং।

৫০। প্রাগুক্ত।

৫১। প্রাগুক্ত।

৫২। প্রাগুক্ত।

৫৩। প্রাগুক্ত।

৫৪। প্রাগুক্ত, ৭ মার্চ ১৯৯৪ ইং।

৫৫। দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ঃ ২১ মার্চ ১৯৯৪ ইং।

৫৬। প্রাগুক্ত, ২২ মার্চ ১৯৯৪ ইং।

৫৭। আব্দুল মতিন, প্রাগুক্ত।

৫৮। আজকের কাগজ, ঢাকা ঃ ২১ মার্চ ১৯৯৪ ইং।

৫৯। প্রাগুক্ত ২০ মার্চ ১৯৯৪ ইং।

৬০। দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ঃ ২২ মার্চ ১৯৯৪ ইং।

৬১। প্রাগুক্ত, ২৮ মার্চ ১৯৯৪ ইং।

৬২। আজকের কাগজ, ঢাকা ঃ ২৯ মার্চ ১৯৯৪ ইং।

৬৩। প্রাগুক্ত, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ ইং।

৬৪। প্রাগুক্ত, ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ ইং।

৬৫। প্রাগুক্ত, ৮ এপ্রিল ১৯৯৪ ইং।

৬৬। প্রাগুক্ত, ৫ মে ১৯৯৪ ইং।

৬৭। 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা', ঢাকা ঃ ২৩ বর্ষ ৬ সংখ্যা, ১ জুলাই ১৯৯৪ ইং পৃঃ।

৬৮। *M. Nazrul Islam. Parliamentary Democracy in Bangladesh : An Assessment, Perspectives in Social Science, a compilation volume of seminar paper. Center for Advanced in Social Sciences [Sayed Gias Uddin Ahmed Edited] Volume-5, October 1998, P-64.*

৬৯। আজকের কাগজ, ঢাকা ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ ইং।

৭০। প্রাগুক্ত, ২৮ জুন ১৯৯৪ ইং।

৭১। প্রাগুক্ত, ২১ জুন ১৯৯৪ ইং।

৭২। আহমেদ নূরে আলম, বামফ্রন্ট ও বর্তমান রাজনীতি, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৩ বর্ষ-১৯ সংখ্যা, ৩ সেপ্টেম্বর '৯৪ ইং- পৃঃ ৩৫।

৭৩। প্রাগুক্ত।

৭৪। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৭৫। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা ঃ ২৩ বর্ষ ১০, সংখ্যা, ২৯ জুলাই '৯৪ ইং- পৃঃ ৩৫।

৭৬। আজকের কাগজ, ঢাকা ঃ ১২ মে ১৯৯৪ ইং।

৭৭। প্রাগুক্ত, ১৪ মে ১৯৯৪ ইং।

৭৮। প্রাগুক্ত, ১৯ মে ১৯৯৪ ইং।

৭৯। প্রাগুক্ত, ২৯ এপ্রিল ১৯৯৪ ইং।

৮০। প্রাগুক্ত, ৮ এপ্রিল ১৯৯৪ ইং।

৮১। প্রাগুক্ত, ১৬ মে ১৯৯৪ ইং।

৮২। প্রাগুক্ত, ১২ এপ্রিল ১৯৯৪ ইং।

৮৩। প্রাগুক্ত, ২৯ এপ্রিল ১৯৯৪ ইং।

৮৪। আহমেদ নূরে আলম, 'তত্ত্বাবধায়ক না অন্তর্বর্তী- সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ২৩ বর্ষ-২৬ সংখ্যা, ১৮ নভেম্বর ১৯৯৪ ইং পৃঃ ২১।

৮৫। আজকের কাগজ, ঢাকা ঃ ১৬ মে ১৯৯৪ ইং।

৮৬। *M. Nazrul Islam, Ibid, P-64, 65.*

৮৭। দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ঃ ১ মে ১৯৯৪ ইং।

৮৮। আজকের কাগজ, ঢাকা ঃ ৩ অক্টোবর ১৯৯৪ ইং।

৮৯। প্রাগুক্ত, ২৬ অক্টোবর ১৯৯৪ ইং।

৯০। প্রাগুক্ত।

৯১। দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ঃ ৪ নভেম্বর ১৯৯৪ ইং।

৯২। আজকের কাগজ, ঢাকা ঃ ৫ নভেম্বর ১৯৯৪ ইং।

৯৩। প্রাগুক্ত, নভেম্বর ১৯৯৪ ইং।

৯৪। প্রাগুক্ত, ১০ নভেম্বর ১৯৯৪ ইং।

৯৫। প্রাগুক্ত, ১৩ নভেম্বর ১৯৯৪ ইং।

৯৬। প্রাগুক্ত, ১৮ নভেম্বর ১৯৯৪ ইং।

৯৭। প্রাগুক্ত।

৯৮। দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ঃ ২১ নভেম্বর ১৯৯৪ ইং।

৯৯। আহমেদ নূরে আলম, সংলাপ ঃ সরকার চায় ঃ বিরোধী দল চায় না ঃ জনগণ কি চায়? সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা ২৩ বর্ষ ২৮ সংখ্যা, ২ ডিসেম্বর ১৯৯৪ ইং পৃঃ ২১।

১০০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।

১০১। আজকের কাগজ ঢাকা ঃ ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৪ ইং।

১০২। প্রাগুক্ত, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৪ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

১০৩। প্রাগুক্ত, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৪ ইং।

১০৪। প্রাগুক্ত, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৪ ইং।

১০৫। মোস্তফা কামাল, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট ঃ খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা ঃ শিব্বির প্রকাশনী, ১৯৯৬ ইং পৃঃ ৯৪।

১০৬। দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৪ ইং।

১০৭। Enayetullah Khan. Bluff all around : situation becoming increasingly unpredictable Government's authority eroding. The weekly "Holiday", Dhaka: February 3, 1995.

১০৮। আজকের কাগজ, ঢাকা ঃ ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ ইং।

১০৯। প্রাগুক্ত।

১১০। প্রাগুক্ত।

১১১। Shamim Ahmed. A unique form of 'Protest, The weekly 'Holiday' April 28, 1995.

১১২। Shamim Ahmed. BNP & AL launch Polls like campaign. The weekly "Holiday," May 9, 1995.

১১৩। সংসদ বিতর্ক. বাংলাদেশ ৫ম জাতীয় সংসদের ২০তম অধিবেশনের সরকারী প্রতিবেদন, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সোমবার, ১৯ জুন, ১৯৯৫ ইং, দ/১।

১১৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান [১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সংশোধিত] প্রাগুক্ত ভাগ, ১ম পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ ৪৮ (৩), পৃঃ ৩৫।

১১৫। আজকের কাগজ, ঢাকা ঃ ২৫ জুলাই ১৯৯৫ ইং।

১১৬। প্রাগুক্ত, ৭ জুলাই ১৯৯৫ ইং।

১১৭। প্রাগুক্ত, ১৭ ও ১৮ জুলাই ১৯৯৫ ইং।

১১৮। প্রাগুক্ত।

১১৯। প্রাগুক্ত, ১৭ ও ১৮ জুলাই ১৯৯৫ ইং।

১২০। প্রাগুক্ত, ১৭ ও ১৯ জুলাই ১৯৯৫ ইং।

১২১। প্রাগুক্ত, ১৮ ও ১৯ জুলাই ১৯৯৫ ইং।

১২২। প্রাগুক্ত, ২০ ও ২১ জুলাই ১৯৯৫ ইং।

১২৩। প্রাগুক্ত, ২১ ও ২৪ জুলাই ১৯৯৫ ইং।

১২৪। প্রাগুক্ত, ১৮ ১৯ ও ২১ জুলাই ১৯৯৫ ইং।

১২৫। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১২৬। প্রাগুক্ত, ১৮ জুলাই ১৯৯৫ ইং।

১২৭। প্রাগুক্ত।

১২৮। প্রাগুক্ত, ২৪ জুলাই ১৯৯৫ ইং।

১২৯। প্রাগুক্ত।

১৩০। প্রাগুক্ত, ২৮ জুলাই ১৯৯৫ ইং।

১৩১। আজকের কাগজ, ঢাকা ২৯ জুলাই ১৯৯৫ ইং।

১৩২। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক, সরকারী প্রতিবেদন, বুধবার, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, খন্ড-২১, সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৯/৫০।

১৩৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ৫৬ (৪) পৃঃ ৪১।

১৩৪। আজকের কাগজ, ঢাকা ঃ ৭ জুলাই ১৯৯৫ ইং।

১৩৫। প্রাগুক্ত।

১৩৬। আজকের কাগজ, ঢাকা ঃ ৭ জুলাই ১৯৯৫ ইং।

১৩৭। দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ঃ ২ আগষ্ট ১৯৯৫ ইং।

১৩৮। আজকের কাগজ, ঢাকা ঃ ৩ আগষ্ট ১৯৯৫ ইং।

১৩৯। প্রাগুক্ত, ৪ আগষ্ট ১৯৯৫ ইং।

১৪০। ফয়েজ আহমদ, পরস্পরের দাবি প্রত্যাখ্যানের মধ্যেই নির্বাচনী প্রস্তুতিঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা ঃ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৪১। আজকের কাগজ, ঢাকা ঃ ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৪২। ফয়েজ আহম্মদ, রাজনীতি- ৯৫ (দ্বিতীয় খন্ড) ঢাকা ঃ মুক্তধারা ১৯৯৬ ইং পৃঃ ৪৫।

১৪৩। আজকের কাগজ, ঢাকা ঃ ২ অক্টোবর ১৯৯৫ ইং।

১৪৪। প্রাগুক্ত, ঢাকা ঃ ১৭ অক্টোবর ১৯৯৫ ইং।

১৪৫। ২ নভেম্বর (১৯৯৫) তারিখে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা কাছে লেখা প্রধান মন্ত্রীর পত্র থেকে উদ্বৃত।

১৪৬। আজকের কাগজ, ঢাকা ঃ ৪ নভেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৪৭। প্রাগুক্ত, ৫ নভেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৪৮। প্রাগুক্ত, ১৩ নভেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৪৯। প্রাগুক্ত, ৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৫০। প্রাগুক্ত, ২২ নভেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৫১। প্রাগুক্ত।

১৫২। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৫৩। প্রাগুক্ত, ২৩ নভেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৫৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ৫৭(২), পৃঃ ৪১।

১৫৫। ২৪ নভেম্বর ১৯৯৫ তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। সূত্রঃ আজকের কাগজ, ঢাকা ঃ ২৫ নভেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৫৬। *Sirajuddin Ahmed, Sheikh Hsina, Prime Minister of Bangladesh, Hakkani Publishers Dhaka : 1998, P-156.*

১৫৭। *Shamim Ahmed, Curcial Day's Ahead. The weekly Holiday, December 1, 1995.*

১৫৮। আজকের কাগজ, ঢাকা ২৮ নভেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৫৯। প্রাগুক্ত, ২ ডিসেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৬০। প্রাগুক্ত, ৫ ডিসেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৬১। দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ঃ ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৬২। আজকের কাগজ, ঢাকা ৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৬৩। *Sirajuddin Ahmed, Ibid, P-156.*

১৬৪। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা ঃ ২৪ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ১২ জানুয়ারী ১৯৯৬ ইং পৃঃ ৭।

১৬৫। মাহমুদ শফিক, নির্বাচনের পক্ষ বিপক্ষ, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা ২৪ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা ২৬ জানুয়ারী ১৯৯৬ ইং, পৃঃ ২৯।

১৬৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০।

১৬৭। প্রাগুক্ত।

১৬৮। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা ঃ ২৪ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা, ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ইং, পৃঃ ১১।

১৬৯। প্রাগুক্ত।

১৭০। প্রাগুক্ত।

১৭১। মাহমুদ শফিক, নির্বাচন '৯৬, দেয়ালে পিঠ নয়..... সাপ্তাহিক বিচিত্রা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।

১৭২। প্রাগুক্ত।

১৭৩। মাহমুদ শফিক, নির্বাচন ১৯৯৬, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৪ বর্ষ ৪০ সংখ্যা, ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ইং পৃঃ ১১।

১৭৪। দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ঃ ২০ নভেম্বর ১৯৯০ ইং।

১৭৫। মাহমুদ শফিক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৬। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা ঃ ২৪ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা ১ মার্চ ১৯৯৬ ইং পৃঃ ১৭।

১৭৭। Sirajuddin Ahmed, Ibid, P-160.

১৭৮। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, প্রাগুক্ত।

১৭৯। দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ইং।

১৮০। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, প্রাগুক্ত, ১৫।

১৮১। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, প্রাগুক্ত।

১৮২। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৩ মার্চ (১৯৯৬) এর রেডিও টিভি ভাষণ, সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক; ঢাকা ঃ ৪ মার্চ ১৯৯৬ ইং।

১৮৩। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা ঃ ২৪ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ৮ মার্চ (১৯৯৬) ইং, পৃঃ ১৩।

১৮৪। প্রাগুক্ত।

১৮৫। আহমেদ নূরে আলম, রাষ্ট্রপতির উদ্যোগ কি সফল হবে? সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা ঃ ২৪ বষয় ৪৪ সংখ্যা, ১৫ মার্চ ১৯৯৬ ইং, পৃ-১৪।

১৮৬। প্রাগুক্ত।

১৮৭। প্রাগুক্ত।

১৮৮। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ৯৩ (১) এর শর্তাশ, পৃঃ ৯৭।

১৮৯। আহমেদ নূরে আলম, প্রাগুক্ত পৃ ১৫।

১৯০। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা ঃ ২৪ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ২২ মার্চ ১৯৯৬ ইং, পৃঃ ১৫।

১৯১। প্রাগুক্ত।

১৯২। প্রাগুক্ত।

১৯৩। প্রাগুক্ত।

১৯৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

১৯৫। Sirajudd Ahmed, Ibid, Page-168.

১৯৬। Ibid.

১৯৭। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

১৯৮। প্রাগুক্ত, ২৪ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ২৯ মার্চ ১৯৯৬ ইং পৃঃ ৮।

১৯৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

২০০। Sirajuddin Ahmed, Ibid, Page-172.

২০১। আজকের কাগজ, ঢাকা ঃ ৩১ মার্চ ১৯৯৬ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সপ্তম জাতীয় সংসদে প্রধান চার দলের ফলাফল

সারণী ৫.১

বিষয়	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	জামায়াত
ভোট প্রাপ্তি	১৫৮৮২৭৯০ (৩৭.৪৪%)	১৪২৫৫৯৮২ (৩৩.৬১%)	৬৯৫৫১৬৩ (১৬.৪০%)	৩৬৫৩০১৩ (৮.৬১%)
আসন বিজয়	১৪৬	১১৬	৩২	০৩
দ্বিতীয় স্থান	১৩৩	১১৩	৩৭	১৪
তৃতীয় স্থান	১৮	৪৫	১৩৩	৮৪
অন্যান্য স্থান	০৩	২৬	৯১	১৯৯
জামানত বাজেয়াপ্ত	০২	৩৬	১৩৬	২২৫

এক নজরে বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদ (১৯৯৬)

সারণী ৫.২

বিষয়	সপ্তম জাতীয় সংসদ
নির্বাচনের তারিখ	১২/০৬/৯৬ইং
রাজনৈতিক দল	৮১
মোট প্রার্থী	২৫৭৪
দলীয়/ স্বতন্ত্র	২২৮৯/২৮৫
মোট ভোটার	৫১৭০৩০২২
প্রদত্ত ভোট	৪২৮৮০৫৬৪
শতাংশ (%)	৭৪.৯৬%
প্রদত্ত বৈধ ভোট	৪২৪১৮২৬২
বাতিল ভোট	৪৬২৩০২

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়	সপ্তম জাতীয় সংসদ
নির্বাচন কেন্দ্র	২৫৯৫৭
মহিলা আসন	৩০
ফলাফল	আওয়ামী লীগ ১৪৬ বিএনপি ১১৬ জাপা ৩২ অন্যান্য ০৬

সংসদ অধিবেশন

সারণী ৫.৩

সংসদ শুরু / বিলুপ্তি	১৪/০৭/৯৬
মেয়াদ কাল	৫ বছর পূর্ণ
মোট অধিবেশন	২৩
মোট কার্য দিবস	৩৮৩
গৃহীত আইন	১৯৩

প্রধান ৪ দলের নির্বাচনী পারফরমেন্স ১৯৯৬

সারণী ৫.৪

দল	প্রাপ্ত ভোট/ আসন	সপ্তম সংসদ/১৯৯৬
আওয়ামী লীগ	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ) বিজয়ী আসন	১৫৮৮২৭৯০ (৩৭.৪৪%) ১৪৬ (৩০০)
বিএনপি	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ) বিজয়ী আসন	১৪২৫৫৯৮২ (৩৩.৬১%) ১১৬ (৩০০)
জাপা	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ) বিজয়ী আসন	৬৯৫৫১৬৩ (১৬.৪০%) ৩২ (৩০০)
জামায়াত	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ) বিজয়ী আসন	৩৬৫৩০১৩ (৮.৬১%) ০৩ (৩০০)

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৯৬ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ৪৮টি আসন

সারণী ৫.৫

ক্রঃনং	আসন	বিজয়ীপ্রার্থী	বিজয়ী দল	ব্যবধান	২য় স্থান
১	পটুয়াখালী-২	আ স ম ফিরোজ	আ'লীগ	২৪	বিএনপি
২	পিরোজপুর-১	দেলওয়ার হোঃ সাঈদী	জামায়াত	২৮০	আ'লীগ
৩	সাতক্ষারী-২	কাজী শামসুর রহমান	জামায়াত	৩০৯	জাপা
৪	কুমিল্লা-৬	অধ্যাপক আলী আশরাফ	আ'লীগ	৩৫৬	বিএনপি
৫	কুষ্টিয়া-৪	মেহেদী আহমেদ রুমি	বিএনপি	৩৬১	আ'লীগ
৬	চাঁদপুর-৫	রফিকুল ইসলাম	আ'লীগ	৪১৪	বিএনপি
৭	নীলফামারী-২	আহসান আহমেদ	জাপা	৪৩৯	আ'লীগ
৮	সিলেট-৩	আবদুল মুকিত খান	জাপা	৪৯১	আ'লীগ
৯	সুনামগঞ্জ-২	নাছির উদ্দিন চৌধুরী	জাপা	৫০৪	আ'লীগ
১০	ফরিদপুর-২	কে.এম ওবায়দুর রহমান	বিএনপি	৫৪৬	আ'লীগ
১১	নারায়গঞ্জ-২	এনদাদুল হক ভূইয়া	আ'লীগ	৫৫৯	বিএনপি
১২	বি- বাড়িয়া-৪	আলহাজ্ব শাহ আলম	আ'লীগ	৬২৬	জাপা
১৩	সিলেট-১	হুমায়ন রশীদ চৌধুরী	আ'লীগ	৭২০	বিএনপি
১৪	সিরাজগঞ্জ-৭	হাসিবুর রহমান স্বপন	বিএনপি	৯৫১	আ'লীগ
১৫	চুয়াডাঙ্গা-২	মোঃ মোজাম্মেল হক	বিএনপি	১০২৩	আ'লীগ
১৬	নরসিংদী-৪	নুরউদ্দিন খান	আ'লীগ	১১০৩	জাপা
১৭	ময়মনসিংহ-৮	আবদুছ ছাত্তার	আ'লীগ	১১২১	জাপা
১৮	সিলেট-৪	এম সাইফুর রহমান	বিএনপি	১২২১	আ'লীগ
১৯	বরগুনা-২	গোলাম সাওয়ার হিরু	ইঐজো	১৩৪৩	বিএনপি
২০	সিলেট-৫	হাফিজ উদ্দিন আহমেদ	আ'লীগ	১৩৬৩	জামায়াত
২১	নাটোর-৩	কাজী গোম মোর্শেদ	বিএনপি	১৪৪৪	আ'লীগ
২২	সুনামগঞ্জ-১	সৈয়দ রফিকুল হক	আ'লীগ	১৪৭৫	বিএনপি
২৩	পাবনা-২	আহমেদ তফিজ উদ্দিন	আ'লীগ	১৫০৫	বিএনপি
২৪	খুলনা-২	শেখ রাজ্জাক আলী	বিএনপি	১৫২৮	আ'লীগ

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃনং	আসন	বিজয়ীপ্রার্থী	বিজয়ী দল	ব্যবধান	২য় স্থান
২৫	খুলনা-৩	কাজী সেকান্দর আলী	আ'লীগ	১৫৫২	আ'লীগ
২৬	সুন্দানগঞ্জ-৫	মহিবুর রহমান মানিক	আ'লীগ	১৬০০	আ'লীগ
২৭	বরিশাল-২	গোলাম ফারুক অভি	জাপা	১৭১৬	জাপা
২৮	পঞ্চগড়-২	মোজাহার হোসেন	বিএনপি	১৭৯১	বিএনপি
২৯	ঝালকাঠি	আনোয়ার হোসেন	জাপা	১৭৯৫	জাপা
৩০	সুনামগঞ্জ-৪	ফজলুল হক(আসপিয়া)	বিএনপি	১৭৯৫	বিএনপি
৩১	কিশোরগঞ্জ-৫	ডঃ মিজানুল হক	আ'লীগ	১৮২৭	আ'লীগ
৩২	দিনাজপুর-৩	খুরশীদ জাহান হক	বিএনপি	১৯৪৫	বিএনপি
৩৩	টাঙ্গাইল-	গৌতম চক্রবর্তী	বিএনপি	১৯৫০	বিএনপি
৩৪	কিশোরগঞ্জ	এডঃ আবদুল হামিদ	আ'লীগ	২০৪৯	আ'লীগ
৩৫	লক্ষীপুর-৪	আ স ম আবদুল রব	জাসদ	২২৫১	বিএনপি
৩৬	বরিশাল-১	আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ	আ'লীগ	২২৯৩	বিএনপি
৩৭	ঢাকা-৭	সাদেক হোসেন	বিএনপি	২৩১৫	আ'লীগ
৩৮	ভোলা-১	তোফায়েল আহমেদ	আ'লীগ	২৩৪০	বিএনপি
৩৯	খুলন-৪	মোস্তফা রশিদী সুজা	আ'লীগ	২৩৪৫	বিএনপি
৪০	চট্টগ্রাম-২	আবুল কাশেম	আ'লীগ	২৩৫৭	বিএনপি
৪১	সাতক্ষীরা-৪	মোঃ শাহাদাৎ হোসেন	জাপা	২৪৫৮	আ'লীগ
৪২	নীলফামারী-৩	মিজানুর রহমান চৌধুরী	জামায়াত	২৫১৬	জাপা
৪৩	ময়মনসিংহ-৫	মোশারফ হোসেন	বিএনপি	২৬২৪	আ'লীগ
৪৪	সিরাজগঞ্জ-৬	মোঃ শাহজাহান	আ'লীগ	২৭৩৭	বিএনপি
৪৫	নোয়াখালী-৬	ফজলুল আজিম	বিএনপি	২৭৯০	আ'লীগ
৪৬	কুমিল্লা-১০	তাজুল ইসলাম	আ'লীগ	২৮১৯	বিএনপি
৪৭	লালমনিরহাট-৩	জিএম কাদের	জাপা	২৮৭৪	বিএনপি
৪৮	কিশোর গঞ্জ-৬	মজিবুর রহমান মঞ্জু	বিএনপি	২৯১৫	আ'লীগ

Dhaka University Institutional Repository

পাদ টীকা

১। দৈনিক 'ইত্তেফাক'।

২। দৈনিক 'ইনকিলাব'।

৩। দৈনিক 'জনকণ্ঠ'।

৪। 'আজকের কাগজ'।

৫। দৈনিক বর্তমান 'দিনকাল'।

৬। Daliy Observer.

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশ সমূহ ঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সনের সংবিধান রচনার সাথে সাথে সংসদীয় গণতন্ত্রের সূচনা হয়। তারপর ১৯৭৫ সনের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারের অবসান ঘটে। বস্তুতঃ ১৯৭২-৭৫ পর্যন্ত সংসদীয় সরকারের আদৌও কোন কার্যকরী ভূমিকা প্রশ্নাতীত ছিলনা। সংসদে সরকারী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার দরুন এবং বিরোধী দল দূর্বল থাকায় বিরোধী দলের কোন ভূমিকা ছিলনা। দীর্ঘ ১৫ বছর পর, ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদের পতন ঘটিয়ে জনগণের ব্যাপক সমর্থনে পুনরায় সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তন হয় ১৯৯১ সনে। কিন্তু এই সংসদও পুরোপুরি কার্যকরী ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। বিরোধী দল ৫ম জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশতম অধিবেশন থেকে বয়কট করে। তারপর বিরোধী দল চতুর্থদশ অধিবেশনে যোগ দেয়নি ফলে বিরোধী দল ছাড়া সংসদের কার্যক্রম দূর্বল হয়ে পড়ে। তাই কার্যতঃ প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ, সংসদ বয়কট করার সাথে সাথে আবার বাংলাদেশের পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার সংকট দেখা দেয়।

সংসদীয় গণতন্ত্র একটি উত্তম শাসন ব্যবস্থা। কিন্তু এর বাস্তবায়ন খুব কঠিন। কারণ এর পূর্বশর্ত অনেক ও জটিল। এ পূর্বশর্তগুলো পূরণ না হলে সংসদীয় পদ্ধতির কার্যকারিতার পথে সমস্যা সৃষ্টি হবে এবং এ পদ্ধতি সুফল আনতে পারবেনা। সংসদীয় গণতন্ত্রের শর্তসমূহ এবং বাংলাদেশে উহার সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

(ক) রাজনৈতিক অঙ্গীকার ঃ যে কোন শাসন ব্যবস্থার সাফল্য ও স্থিতিশীতার নির্ভর করে সেই ব্যবস্থার প্রতি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার (Commitment) উপর। সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি আপাতঃ দৃষ্টিতে সমঝোতায় পৌছালেও তারা

Dhaka University Institutional Repository

সকলে গভীরভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ বলে মনে হয় না। জাতীয় পার্টি জন্মলগ্ন হতেই রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিল। ১৯৯১ সালে সংসদে জাতীয় পার্টি দ্বাদশ সংশোধনীর পক্ষে ভোট দিলেও গণভোটে তার বিরোধিতা করে। বিএনপিও জন্মলগ্ন হতে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল। এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের সময় তা ৮ ও ৫ দলীয় জোট এবং পেশাজীবি সংগঠনসমূহের চাপের মুখে "জবাবদিহিমূলক" সরকার প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ১৯৯১-এর নির্বাচনী ইশতেহারে বিএনপি সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে নীরব থাকে এবং নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিদ্যমান রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির অধীনেই তাদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানায়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তাতে রাজি না হওয়ায় এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রতিকুল দেখে বিএনপি সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু তার গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির প্রতি অঙ্গীকার থেকে যায়। জামায়াতে ইসলাম মুখে সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা বললেও তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা। জামায়াত পরিকল্পিত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সংসদীয় গণতন্ত্র কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ সে সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। অনুরূপভাবে কিছু বামপন্থী দল সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলেও তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্র। আওয়ামী লীগ জন্মলগ্ন হতেই সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে থাকলেও তার প্রতি আওয়ামী লীগের অঙ্গীকার নিঃশর্ত বা নিরঙ্কুশ ছিলনা। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর গণপরিষদে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র সে গণতন্ত্র যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ করে থাকে। আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র এবং সেজন্য আমাদের গণতন্ত্রের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য আছে।" তাই তিনি বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালে একদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তবে ১৯৭৭-৯৮ সাল হতে আওয়ামী লীগ সংসদীয় পদ্ধতির প্রতি পুনরায় তার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। বর্তমান আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন।

খ) সংসদের প্রাধান্য ঃ সংসদীয় গণতন্ত্রে সাংসদের প্রাধান্য অনস্বীকার্য। সংসদকে উপক্ষো বা অসম্মান করে সংসদীয় পদ্ধতি কায়েম

Dhaka University Institutional Repository

করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশের প্রধান দলগুলির মধ্যে সংসদকে উপক্ষো করার প্রবণতা লক্ষণীয়। বিএনপি ক্ষমতাসীন থাকাকালে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সংসদে আলোচনা না করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া খুব কম সময়ই সংসদে উপস্থিত থাকতেন। কার্য-উপদেষ্টা কমিটির মতো গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সভায় তিনি একদিনও যাননি। সংসদে নীতি নির্ধারণী বক্তব্য তিনি খুব কমই রাখেন। সংসদ নেত্রীর এ অবহেলার কারণে সংসদ তার গুরুত্ব ও মর্যাদা হারায়। তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী সংসদকে গুরুত্ব দিলেও সংসদে তার উপস্থিতি আশানুরূপ ছিলনা। সংসদ নেত্রী যেতেন না বলে তিনিও কার্য-উপদেষ্টা কমিটির সভায় কদাচিত যেতেন।

তাছাড়া, বিরোধী দলসমূহ নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ১৯৯৪ সালে সংসদ বর্জন শুরু করে এবং এক পর্যায়ে বিরোধী সদস্যগণ পদত্যাগ করেন। ফলে সংসদ একদলীয় সংস্থায় পরিণত হয় ও তার সত্যিকার কার্যকারিতা হারায়। সংসদে থেকেও বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারত। তেমনি ক্ষমতাসীন বিএনপির পক্ষে একদলীয় সংসদ চালানো গণতন্ত্র সম্মত ছিল না।

গ) **রাষ্ট্রপতি ও স্পীকারের নিরপেক্ষতা ঃ** সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি ও স্পীকারের পদ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। এগুলিকে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সরকারী দল বিরোধী দলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সকল পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি ও স্পীকার পদে মনোনয়ন দিবে তা গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য। কিন্তু বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের পর পঞ্চম জাতীয় সংসদে স্পীকার ও রাষ্ট্রপতি অত্যন্ত তিক্ততাপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচিত হন। ক্ষমতাসীন বিএনপি এ ব্যপারে বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) বিরোধী দলের প্রতি দমননীতি পরিহার করতে হবে ঃ আমরা বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থায় দেখি সাধারণত বিরোধী দলকে কথা বলার সুযোগ কম দেয়া হয়। কিন্তু বিরোধী দল ছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্রে সাফল্য আসতে পারে না। বিরোধী দলকে দমননীতি পরিহার করে সংসদে আলোচনা সুযোগের মাধ্যমে সংসদীয় সরকার আরও কার্যকর হতে পারে।

ঙ) গণতান্ত্রিক দলব্যবস্থা ঃ সংসদীয় সরকার সাধারণত দলীয় সরকার। দলের মধ্যে গতন্ত্রের চর্চা না থাকলে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা বিরল। বিএনপির গঠণতন্ত্র অনুসারে দলের চেয়ারম্যানের হাতে সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত। তিনি দলের ব্যপারে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ও নেন। জাতীয় পার্টিতেও একই অবস্থা। পার্টির সভাপতি জেনারেল এরশাদ মহাসচিব সহ দলের উচচ পদস্থ কর্মকর্তাকে খেয়ালখুশী মত নিয়োগ দান বা অপসারণ করে থাকে। আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে বিধি ব্যবস্থা আছে। দলীয় সভাপতি যা খুশী তা করতে পারেন না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ দলের প্রেসিডিয়াম, ওয়ার্কিং কমিটি বা পার্লামেন্টারী কমিটিতে আলোচিত হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে "দলের নেত্রী যা বলেন তা হয়ে থাকে" তার সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত।

চ) যৌথ নেতৃত্ব ঃ সংসদীয় সরকার যৌথ নেতৃত্বের সরকার। এখানে ব্যক্তি অপেক্ষা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বড়। কিন্তু বাংলাদেশে কেবল দলের মধ্যেই ক্ষমতার "ব্যক্তিগতকরণ" (Privatisation) করা হয় না, গোটা রাজনৈতিক পদ্ধতিটাই ব্যক্তি কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর যেসব দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা চালু আছে কোথাও রাষ্ট্রপতির পদটি এত ক্ষমতাহীন বা মর্যাদাহীন নয়। এসব দেশে রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রের নির্বাহী। তার কর্তৃত্বে মন্ত্রিসভা নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে সম্ভবতঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সামনে রেখে নির্বাহী ক্ষমতা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করা হয়। ফলে সংসদীয় পদ্ধতির ভারসাম্য অনেকটা ক্ষুন্ন হয়। ১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

সালের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ক্ষমতায় আরো ব্যক্তিগতকরণ করা হয়। তাছাড়া, সংসদ-সদস্যদের উপর দলীয় নেতা তথা প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রন আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে তুষ্ট করার জন্য এসব করা হয় বলে অনুমিত। এক ব্যক্তির শাসনের এ মন-মানসিকতা দূর না হলে সংসদীয় গণতন্ত্র বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনা।

ছ) সুষ্ঠ নির্বাচন ব্যবস্থা ঃ সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল নির্বাচন। বাংলাদেশে এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠার সুষ্ঠ পরিবেশ পায়নি। সকল শাসনামলে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অনিয়ম, কারচুপি ও সন্ত্রাসের অভিযোগ উত্থিত হয়। বিশেষ করে এরশাদ আমলে "ভোট ডাকাতি" ও "মিডিয়া ক্যু" নির্বাচন প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংস করে দেয়। জনগণ নির্বাচনের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। ১৯৯১ সালে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে নির্দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচন ছিল বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। সে নির্বাচন প্রমাণ করে যে, সরকার সৎ ও আন্তরিক হলে সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। কিন্তু ১৯৯১ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনসমূহ, বিশেষভাবে ১৯৯৪ সালের মাগুরা উপ-নির্বাচনে সন্ত্রাস ও কারচুপির ব্যাপকতা বিরোধী দলগুলির মধ্যে বিশ্বাস জন্মায় যে, দলীয় সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনই অবাধ ও সুষ্ঠ হবে না। সুতরাং প্রধান বিরোধী দলসমূহ ভবিষ্যতে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উত্থাপন করে।

একটি দীর্ঘ ও সহিংস আন্দোলনের পরিণতিতে ১৯৯৬ সালের ২৬শে মার্চ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদের সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান গৃহীত হয়। এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে।

Dhaka University Institutional Repository

জ) খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব ঃ নির্বাচনে জয়-পরাজয় আসবে। তা মুক্ত চিত্তে মেনে নেয়ার মানসিকতা সব দলেরই থাকতে হবে। ১৯৯১ সালে নির্বাচন দেশে বিদেশে নিরপেক্ষতার স্বীকৃতি লাভ করলেও শেখ হাসিনা তাৎক্ষনিকভাবে নির্বাচনে "সুক্ষ্ম কারচুপি" হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। সে জন্য দলের ভিতরে ও বাহিরে তাকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় এবং তিনি দলের সভাপতির পদ হতে ইস্তফা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ কিছুটা গণতান্ত্রিক মন-মানসিকতার পরিচয় দেন। অবশ্য সে পদত্যাগ গৃহীত হয়নি এবং আওয়ামী লীগ নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেয়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের মত ১৯৯৬ সালের জুন নির্বাচনও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় বলে দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রসংশিত হইয়াছে। কিন্তু প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এ নির্বাচনের ফলাফল মেনে না নিয়ে সংসদকে অকার্যকর ও সরকারকে অচল করার কৌশল গ্রহণ করে।

বিএনপি সাংসদগণ কর্তৃক সপ্তম সংসদের প্রথম বৈঠক হতেই সরকারকে অসহযোগিতা প্রদর্শনের মনোভাব লক্ষ্যনীয়। তদুপরি ৩০শে নভেম্বর, ১৯৯৬ বিএনপি ১০-দফা অভিযোগের ভিত্তিতে আকস্মিকভাবে সংসদ বর্জন শুরু করে। এসব অভিযোগের মধ্যে ছিল ঃ বিরোধী দলীয় সদস্যদের সংসদে কথা বলার পর্যাপ্ত সুযোগ না দেয়া, রেডিও-টেলিভিশনে তাদের বক্তব্য আংশিক অথবা বিকৃতভাবে প্রচার করা, সংসদীয় কমিটিগুলিতে তাদের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব না দেয়া এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সংসদে আলোচনার সুযোগ না দেয়া।

বিএনপিকে সংসদে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের উচচ পর্যায় হতে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সকল বিষয় মীমাংসায় আহবান জানানো হয়। কিন্তু বিএনপি আলাপ-আলোচনার পূর্বশর্ত হিসাবে দলীয় নেতা কর্মীদের ফায়ামুক্তি ও তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানায়। এমনকি, দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলে দেশ অচল করে দেয়া হবে বলে হুমকি দেয়া হয়। এসব দাবি বা হুমকি সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য অশনি সংকেত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৭ সালের ১৪ই জানুয়ারী সম্পাদিত এক সমঝোতার পর বিএনপি তৃতীয় অধিবেশনে যোগদান করে। কিন্তু ৩০শে আগষ্ট ১৯৯৭ ৬ষ্ঠ অধিবেশনের প্রথমদিনে বিএনপি সাংসদগণ আবার সংসদ বর্জন শুরু করে। বিএনপি অষ্টম অধিবেশনের প্রথমে সংসদে যোগদান করলেও শেষের দিকে আবার সংসদ হতে বের হয়ে আসে। অষ্টম ও নবম অধিবেশনে টানা ১৬ কার্যদিবস অনুপস্থিতির পর ১৯৯৮ সালের ২৫শে জুন (নবম অধিবেশনের শেষের দিকে) বিরোধী দলীয় সদস্যরা সংসদে ফিরে আসেন। উল্লেখ্য যে, সপ্তম সংসদের এ ৯টি অধিবেশনে বেগম খালেদা জিয়া সম্ভবতঃ ৯ দিনও উপস্থিত ছিলেন না। কার্য-উপদেষ্টা কমিটির প্রায় প্রতিটি বৈঠকে শেখ হাসিনা উপস্থিত থাকলেও বেগম খালেদা জিয়া একদিনও উপস্থিত হননি; তবে এ কমিটির কোন কোন বৈঠকে তার প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন।

ঝ) ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের মধ্যে সম্পর্ক ঃ সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত হল, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার মনোভাব। সংসদ নেত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে ১৯৯১ সালে এক সাপ্তাহিকীতে বলা হয় ঃ দুজন "দুজনকে বৈরী মনে করেন। সংসদ অধিবেশনে এক নেত্রী থাকলে আর এক নেত্রী থাকেন না। এক নেত্রী বক্তৃতা দিলে আর এক নেত্রী মুখ ঘুরিয়া রাখেন। সংসদে দুজন সামনাসামনি বসেন, কিন্তু কোন দিন চোখাচোখি হতে দেখা যায় না। দুজন তাকিয়ে থাকে দুদিকে।"

এরইমধ্যে ৭ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। দুই নেত্রীর আসন বদল হয়েছে কিন্তু তাদের সম্পর্কের তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। ঐতিহাসিক কারণে প্রধান দুই দল ও নেত্রীর মধ্যে অবিশ্বাসের প্রাচীর গড়ে উঠেছে। দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে এ প্রাচীর তাদেরকে ভাঙ্গতে হবে।

ঞ) ক্ষমতাসীন দলের ভূমিকা ঃ সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ক্ষমতাসীন দলের দায়িত্ব সর্বাধিক। ক্ষমতাসীন থাকাকালে

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে তেমন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি । আশার কথা, আওয়ামী লীগ অতীতের ভুল ভ্রান্তি স্বীকার করে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করেছে এবং সংসদ নেত্রী শেখ হাসিনা কিছু গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি সংসদকে সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা করেন এবং নিজে সংসদ ও কমিটির বৈঠকে যথাসম্ভব উপস্থিত থাকেন। সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সংসদীয় কমিটি সমূহের গোপন বৈঠকের বিধান বাতিল করা হয়েছে। সংসদীয় কমিটির সভাপতি হিসাবে মন্ত্রীর পরিবর্তে একজন সিনিয়র সংসদ সদস্যদের মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকল বিল সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সংসদে আলোচনা করার নীতি গৃহীত হয়েছে। সংসদীয় কমিটিগুলিতে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিধান করা না হলেও বিরোধী দলের প্রতিটি সদস্য যাতে অন্ততঃ একটি কমিটিতে সদস্য থাকেন তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অধিবেশন চলাকালে সপ্তাহে একদিন আধঘন্টা স্থায়ী "প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর" পর্ব চালু করে সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে প্রধান বিরোধী দল বিএনপির অনুপস্থিতিতে এসব আলোচনা তেমন অর্থবহ ও প্রাণবন্ত হয়নি।

ট) জাতীয় ঐকমত্য ঃ যে কোন দেশে গণতান্ত্রিক বিকাশ ও স্থিতিশীলতার জন্য জাতীয় ঐতমত্য আবশ্যক। কিন্তু বাংলাদেশে মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে ঐকমত্যের বড় অভাব। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আদর্শগত ও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের ফলে জাতীয় একাত্মতার তীব্র সংকট বিদ্যমান। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ ও বিপক্ষ এ দুই শিবিরে দেশ বিভক্ত। দুই শিবিরের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও হানাহানি দেশে রাজনৈতিক বিশৃংখলা ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে। এছাড়া রয়েছে ব্যাপক দারিদ্র ও বেকারত্বের সমস্যা। রাজনৈতিক দলগুলি পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গড়তে ব্যর্থ হলে গণতন্ত্র বিপন্ন হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

ঠ) **প্রেসের স্বাধীনতা ঃ**

সংসদীয় গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে হলে মিডিয়াকে অবশ্যই নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। প্রচার মাধ্যমগুলি জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতু বন্ধন রচনা করে। রেডিও টেলিভিশন ও সংবাদপত্র সহ প্রচার মাধ্যমের মাধ্যমে জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে। ফলে তা অনুসরন করে সরকার জনগণের চাহিদা অনুযায়ী তার শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারে। সেক্ষেত্রে সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে প্রেসকে অবশ্যই নিরপেক্ষ ও স্বাধীন ভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

এছাড়া আরও অনেক পদক্ষেপ নেয়া দরকার গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকিকরণের জন্য। বিশেষ করে বিরোধী দলকে বিরোধী দল হিসেবে না দেখে-বিরোধী দলের গঠনমূলক বক্তব্যগুলোকে যথাযথভাবে মূল্যায়নের মাধ্যমে সরকারের নীতির সাথে সম্পৃক্ত করার মধ্যেই গণতন্ত্র তথা সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া সম্ভব। অন্যথায় সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হবে গণতান্ত্রিক শাসন হবেনা।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলাঃ

আজাদ আবদুর রহিম ও শাহ আহমদ রেজা, বাংলাদেশের রাজনীতিঃ প্রকৃতি ও প্রবনতাঃ২১ দফা থেকে ৫ দফা। ঢাকাঃ সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৭ইং।

আজাদ, লেনিন, ঊনিন, ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান রাষ্ট্র সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯৭ইং।

আহ্‌মদ, ড. এমাজ উদ্দিন, তুলনামূলক রাজনীতিঃ রাজনৈতিক বিষেশ্লষণ ঢাকাঃ গোল্ডেন বুক হাউস, [দ্বিতীয় সংস্করণ] ১৯৮১ইং।

আহমদ, প্রফেসর সালাউদ্দিন ও অন্যান্য [সম্পাদিত] বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১ইং ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭ইং।

আহমদ, ফয়েজ, রাজনীতি-৯৫ঃ দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৯৬ইং।

আহমদ, মওদুদ, বাংলাদেশঃ শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, ঢাকা ঃ ইউপিএল, ১৯৮৭ইং।

আহমদ, মওদুদ,বাংলাদেশঃ স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা, ঢাকা ঃ ইউপিএল, ১৯৯২ইং।

আহমেদ (অবঃ), ব্রিগেডিয়ার শামসুদ্দীন, বাংলাদেশ সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকা ঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৬ইং।

আহমেদ, আবুল মনসুর, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫ইং।

ইসলাম, মেজর (অবঃ) রফিকুল [পিএসসি], বাংলাদেশঃ সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট, ঢাকা ঃ ইউপিএল, ১৯৮৯ইং।

ইসলাম, মেজর [অবঃ] রফিকুল [পিএসসি], স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০ ঢাকা ঃ ইউপিএল, ১৯৮৩ইং।

ইসলাম, সিরাজুল, [সম্পাদিত], বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ ঃ প্রথম খন্ড, [রাজনৈতিক] ঢাকা ঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩ইং।

কামাল, মোস্তফা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা, ঢাকা ঃ কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭ইং।

কামাল, মোস্তফা, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট ঃ খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা এবং অন্যান্য প্রসংগ, ঢাকা ঃ শিক্ষির প্রকাশনী, ১৯৯৬ইং।

কবির, শাহরিয়ার, গণআদালতের পটভূমি, ঢাকা ঃ দিব্য প্রকাশ, ১৯৯৩ইং।

Dhaka University Institutional Repository

খান (অবঃ) মেজর জেনারেল মনজুর রশীদ, এরশাদের পতন ও সাহাবুদ্দিনের অস্থায়ী শাসন কাছ থেকে দেখা, ঢাকা ঃ অঙ্কুর প্রকাশনী, ১৯৯৬ইং।

খান, আতাউর রহমান, প্রধান মন্ত্রীত্বের নয় মাস, ঢাকা ঃ মোহনা প্রকাশনী, [দ্বিতীয় প্রকাশ] ১৯৯১ইং।

খান আতাউর রহমান, স্বৈরাচারের দশ বছর, ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০ ইং।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, গণতন্ত্রের পক্ষে, বিপুল প্রকাশ, ঢাকা, [দ্বিতীয় প্রকাশ] -১৯৯১ইং।

জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ [সম্পাদিত] গণতন্ত্র, ঢাকা ঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৫ইং।

জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ [পরিকল্পিত ও সংকলিত] এরশাদের পতন বিবিসি সহ বিদেশী গণমাধ্যমের দৃষ্টিতে, ঢাকা ঃ মাওলা ব্রাসার্স, ১৯৯২ইং।

জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দিন খান, বাংলাদেশ আন্দোলন ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ঢাকা ডানা পাবলিশার্স, ১৯৯৯ইং।

তালুকদার, এস.এম. শাহজাহান, শহীদ জিয়া বিএনপির অতীত-বর্তমান, অতঃপর, ঢাকা ঃ এশিয়া পাবলিকেশনস, ১৯৯০ইং।

ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ [সম্পাদিত] বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ ঃ আসনিক দলিল পত্র, ঢাকা জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯৯৮ইং।

দৌলা, আমান-উদ, একাত্তরের ঘাতকদের কেন বিচার চাই, ঢাকা ঃ অল্পকথা ১৯৯৩ইং।

দাস, দীনেশ, [সম্পাদিত] বেগম জিয়ার ৫ বছর ঢাকা ঃ উত্তরা প্রকাশনী, ১৯৯৫ইং।

বদিউজ্জামান, রাজপথের রাজনীতি, ঢাকা ঃ [কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৮ইং।

বেগম, নাজমির নূর, সামাজিক গবেষণা পরিচিতি, ঢাকা ঃ নলেজ ভিউ, [দ্বিতীয় সংস্করণ] ১৯৮৪ইং।

ভূইয়া, ড. মোহাম্মদ আব্দুল ওদুদ, বাংলাদেশের দলীয় ব্যবস্থা ঃ একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, ঢাকা ঃ গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, [দ্বিতীয় সংস্করণ], ১৯৯৩ইং।

ভূইয়া, ড. মোঃ আব্দুল ওদুদ, সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা, ঢাকা ঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, [দ্বিতীয় প্রকাশ] ১৯৯৮ইং।

ভূইয়া, ড. মোঃ আব্দুল ওদুদ, বাংলাদেশের অর্থনীতি, ঢাকা ঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, [দ্বিতীয় সংস্করণ] ১৯৯৮ইং।

Dhaka University Institutional Repository

মকসুদ, সৈয়দ আবুল, [সম্পাদিত] গণআন্দোলন ১৯৮২-৯০, ঢাকা ঃ মুক্তধারা, ১৯৯১ ইং।

মতিন, আব্দুল, খালেদা জিয়ার শাসন কালঃ একটি পর্যালোচনা, ঢাকাঃ র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবিলেকসন্স, ১৯৯৭ইং।

মান্নান, মোঃ আব্দুল, তুলনামূলক রাজনীতি ও রাজনীতি বিশ্লেষণ পদ্ধতি, ঢাকাঃ করতোয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬ইং।

মামুন, মুনতাসীর ও জয়ন্তকুমার রায়, বাংলাদেশ সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, ঢাকা ঃ অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৫ইং।

মিয়া, এম, এ, ওয়াজেদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯৩ইং।

মিয়া, এম, এ, ওয়াজেদ, বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র, ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯৫ইং।

মুকুল, এম, আর, আখতার, আমি বিজয় দেখেছি, ঢাকাঃ সাগর পাবলিশার্স, [চতুর্থ মুদ্রন] ১৩৯১বাং।

মুহিত, আবুল মাল আব্দুল, বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও জাতীয় ঐকমত্য, ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯১ইং।

রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর, বাংলাদেশের তারিখ, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদ্রার্স ১৯৯৮ইং।

রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পাদিত) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্রঃ [প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় খন্ড ও তৃতীয় খন্ড], ঢাকা ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২ইং।

রায়, অজয়, গণ আন্দোলনে নয় বছর ১৯৮২-৯০ ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৯১ইং।
রায়, স্বদেশ, গণ অভ্যুত্থান ৯০, ঢাকাঃ পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৯১ইং।

হাননান, মোহাম্মদ, ঘটনাপঞ্জি ১৯৯৬, ঢাকাঃ পরমা প্রকাশনী, ১৯৯৩ইং।

হাননান, মোহাম্মদ, বাংলাদেশ ৯৩, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩ইং।

হাফিম, এস, আব্দুল, আন্দোলন ও দেশ পরিচালনায় বেগম খালেদা জিয়া, ঢাকাঃ একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯৪ইং।

হাবিব, খালেদা, বাংলাদেশ, নির্বাচন, জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রী সভা ১৯৭০-৯১, ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯১ইং।

হাসানউজ্জামান, নব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা, ঢাকাঃ অক্ষর, ১৯৯২ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

হাসান উজ্জামান, বাংলাদেশ বাংলাদেশ ঃ রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরণ, ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯১ইং।

হাসেন, আমজাদ, বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল, ঢাকা ঃ পড়ুয়া, ১৯৯১ইং।

হোসেন, ডঃ আনোয়ার, বাংলাদেশ সংলাপের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৫ইং।

হোসেন, ফেরদৌস, বাংলাদেশে রাজনীতি ও অর্থনীতি, ঢাকাঃ নির্ঝর পাবলিকেশনস্, ১৯৯৪ইং।

সাঈদ, আবু আল, আওয়ামী লীগের ইতিহাস ১৯৪৯-৭১, ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩ইং।

জার্নাল (বাংলা)

জাহাঙ্গীর বোরহান উদ্দীন খান (সম্পাদিত) সমাজ নিরীক্ষণ, ঢাকাঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র ঢঃ বিঃ নং ৬৬ নভেম্বর ১৯৯৭ইং।

প্রতিবেদন

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১, নির্বাচনী কার্যক্রম প্রতিবেদন, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, (জি পি পি ডি শাখা-২-১৪৭২/৯৩-৯৪/(নিঃ)-২২-০৯-৯৪-২০০০ইং।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, অর্থনৈতিক সংস্কারের অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যালোচনা, ১৯৯৫, ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯৫ ইং।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জরিপ ১৯৯১/৯২, ঢাকাঃ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-১৯৯৬, ঢাকাঃ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন, ১৯৯৬ইং।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০০, ঢাকাঃ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জুন, ২০০০ইং।

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষাঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নভেম্বর, ১৯৯৭ইং।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ [শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর প্রকল্প, বাস্তবায়ন ইউনিট, কর্তৃক প্রনীত ও প্রকাশিত] ১৯৯৬ইং।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী মূল্যায়ন, চূড়ান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। প্রণয়নে, ডিপিসি গ্রযপ অব কনসাল্ট্যান্ট রিসার্স, বাংলাদেশ (সি ডি আর বি) ঢাকাঃ এপ্রিল ২০০০ইং।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনী ঘোষণা (নির্বাচনঃ ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি, এন, পি) ১৯৯১ ইং।

নির্বাচী ঘোষণা, ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯৬, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি,এন,পি) ১৯৯৬ইং।

বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদের [প্রথম থেকে বাইশতম] অধিবেশনের (১৯৯১-১৯৯৫) কার্যবিবরণীর সারাংশ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান [১৯৯৪ সালের ৩০ শে জুন পর্যন্ত সংশোধিত] গণ প্রজাতিন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯৪ইং।

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান [১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত] গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯৯ইং।

দৈনিক পত্রিকা সমূহঃ

১। দৈনিক 'ইত্তেফাক', ১৯৯০, ১৯৯১ এবং ২০০০।
২। দৈনিক 'ইনকিলাব', ১৯৯২, ১৯৯৩ এবং ১৯৯৪।
৩। আজকের কাগজ, ১৯৯১, ১৯৯২, ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৫ এবং ১৯৯৬।
৪। দৈনিক 'বাংলার বাণী', ১৯৯১ এবং ১৯৯২।
৫। দৈনিক 'খবর' ১৯৯২।
৬। দৈনিক 'সংবাদ'-১৯৯১, ১৯৯২।
৭। 'প্রথম আলো', ১৯৯৯ এবং ২০০০।

সাপ্তাহিকী

১। সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা' ১৯৯১, ১৯৯৪, ১৯৯৬, ১৯৯৭।
২। সাপ্তাহিক 'পূর্ণিমা' ১৯৯১।
৩। 'রোববার' ১৯৯১, ১৯৯৮।

English:

Ahmed, Sharif Uddin, Edt, Dhaka Past Present Future, Dhaka: The Asiatic Society of Bangladesh, 1991.

Ahmed, Moudud, Democracy and the Challenge of Development [A study of politics and military intervention in Bangladesh] Dhaka: UPL 1995.

Almond, Gabriel A. Political development in heuristic theory, Boston: Little, Brown 1990.

Ahmed, Sirajuddin, 'Sheikh Hasina', Prime Minister of Bangladesh, Dhaka:

Almond, Gabriel A &, James S Coleman, The Politics of the Developing Areas, New Jersey: Princeton University Press, [Second Printing] 1971.

Almond, Gabriel & G. Bingham, Powell. Comparative politics: A Development Approach, Boston: Little, Brown, 1966.

Dhaka University Institutional Repository

Apter, David E, The politics of Modernization, Chicago: University of Chieago Press, 1965.

Binder, Leonard, Iran: Political Development in a Changing Society, Berkeley: University of California Press, 1962.

Coleman, James S. [Edited] Education and political Development, New, Jersey Princeton University Press, 1965.

Cutright, Philips, National Political Development in Nelson W. Polsbyets politics and social life, Boston: Honghton Mifin, 1963.

Hamim, Muhammad A, Bangladesh Politics: The Shahabuddin Interregnum, Dhaka : UPL, 1993.

Huda, A. K.M. Shamsul, The Constitution of Bangladesh. [Volume-2], Chittagong: Rita court, 1997.

Huntington, Samuel P, Political Order in changing Societies, Newhaven: Yale University Press, 1968.

Islam, M. Nazrul, Pakistan and Malaysia: A comparative Study in National Integration, New Delhi: Sterling Publishers, 1989.

Islam, M. Nazrul, Problems of Nation Building in Developing Countries.: The case of Malaysia, Dhaka: Sterling Publishers, 1988.

Jahan, Rounaq, Pakistan: failure in national integration, Dhaka: [First Bangladesh Edition]: UPL, 1994.

La Palombara, Joseph and Myron wiener, eds, Political Parties and Political Development, Princeton: Princeton University Press, 1966.

Maniruzzaman, Talukder, The Bangladesh Revolution and Its Aftermath. Dhaka: UPL [second edition] 1988.

Pye, Lucian W, Aspects of Political Development, Boston: Little, Brown and Company, 1966.

Pye, Lucian, W & Sidney Verba, Political Culture and Political Development, New Jersey: Princeton, University Press, USA, [Second Printing] 1967.

Rostow, Walt W. Politics and the stages of Growth, Cambridge: Cambridge University Press, 1971.

Rahim, Aminur, Politics and National Formation in Bangladesh, Dhaka: UPL, 1997.

Dhaka University Institutional Repository

Sobhan, Rehman, Bangladesh Problems of Governance, Dhaka: Dhaka University press, 1993.

Ziring, Lawrence, Bangladesh from Mujib to Ershad an interpretive study, Dhaka: University Press Ltd. 1992.

Report:
The fifth five yea plan; 1997-2002, planning commission, Ministry of Planning, Government of The Peoples Republic of Bangladesh,1998.

Trade and Development Reports 1997, Report by the Secretariat of the United Nation's Conference on Trade and Development, United Nations, New York and Geneva, 1997.

Journal:
Chowdhury, Mahfuzul Hoque, Elite and Political Development in Bangladesh: An overview [Seminar proceeding of the third National Conference of the Bangladesh, Political Science Association] Dhaka: Political Science Association, 1995.

Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities) Dhaka: Vol. 35, No. 2, December 1990.

Perspectives in Social Science: a Compilation Volume of Seminar Paper, [Center for advance in Social Sciences, Editor: Sayed Giasuddin Ahmed, Volume 5, October, 1998.]

Social Science Review, Vol. XV, No. 2(1998).

Weekly Paper:
The weekly 'Holiday', 1995.